নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার

সূচীপত্র

প্রসঙ্গ … পত্রাঙ্ক

দুই-একটি কথা

অধ্যাপকরা ছাত্রদের পড়ান—এ কথা যত সত্য, ততখানিই সত্য এই কথাটি যে—ছাত্ররাও অনেক সময় অধ্যাপকদের পড়াইয়া থাকে—মানে, পড়িবার প্রেরণা যোগায়, এক কথায়, পড়িতে বাধ্যই করে। তবে এ কথাও সব সময়ে সত্য যে, অধ্যাপকমাত্রেই ছাত্রদের পড়ান না; ছাত্রমাত্রই অধ্যাপককে পড়িতে বাধ্য করে না। আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না—এমন কয়েকটি ছাত্রের সহিত আমার অধ্যাপনা-সম্পর্ক ঘটিয়াছিল, যাহারা কেবল ভক্তিযোগী হইয়া সমালোচকদের মন্তব্যে 'অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই চলে নাই—যাহারা জ্ঞানযোগীর মত পরিপ্রশ্নের মধ্য দিয়া জ্ঞানকে যাচাই করিয়া লইয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিল। এই সকল ছাত্রের পরিপ্রশ্নই আমাকে, পূর্ব্বাচার্য্যদের একাধিক মন্তব্যকে প্রশ্ন করিতে সচেষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। সেই চেষ্টাই সংহত হইয়া 'নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক-বিচার' গ্রন্থ-রূপে (প্রকাশিত বৈশাখ ১৩৫৫) পরিণত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থখানি, পাণ্ডুলিপি-অবস্থায়, অনেকেরই (ডাঃ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব রামতনু-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ মহাশয়গণের) প্রশংসা-বাণী শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল ; এবং প্রকাশিত অবস্থায়ও অনেকেরই মৌখিক এবং লিখিত প্রশংসা-বাণী শুনিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা-বিভাগের প্রধান, রামতনু-অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া, গ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যে কয়টি কথা লিখিয়াছেন, গ্রন্থকার

হিসাবে তাহা হইতে শুধু যে উৎসাহই পাইয়াছি তাহা নহে, তাহার মধ্যেই পরিশ্রমের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্লভ প্রশংসা পাওয়া আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়—এ কথা বলাই বাহুল্য। তারপর বিখ্যাত সাহিত্যশিল্পী এবং সুরশিল্পী কলাবিদ শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের প্রশংসা-বাণীও (পণ্ডিচেরী আশ্রম হইতে লিখিত) বহুগুণে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছে। অন্যান্য সমালোচকের এবং নানা কলেজের অধ্যাপকদিগের মৌখিক প্রশংসাও কম উৎসাহজনক হয় নাই। তবে এই কথাটিও এখানে বলা উচিত—সত্যের খাতিরেই অবশ্য—দুই একজন বিখ্যাতনামা ব্যক্তি—'বাংলা সাহিত্যে নাটক! আর তার আবার বিচার!' দেখিয়া অস্বস্তি বোধ এবং নাসিকা-কুঞ্চন করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। এই বিখ্যাতনামাদের ধারণা—বাংলা সাহিত্যে নাটক এখনও লেখা হয় নাই, সুতরাং.........। এই ধরণের দিগ্‌নাগদের, দূর হইতে গড় করা ছাড়া আর উপায় নাই এবং তাহাই করিয়াছি। ইঁহাদের মন্তব্য শুনিয়া বিস্ময় বোধ করিয়াছি বটে, কিন্তু নাটক-বিচার হইতে বিরত হইতে চেষ্টা করি নাই। এই দ্বিতীয় গ্রন্থখানিই বড় প্রমাণ।

এই গ্রন্থখানিতে আমি নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপ-আদিত্য' এবং 'আলমগীর' এবং 'ভীষ্ম', নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' 'শঙ্করাচার্য্য' এবং সার্ব্বভৌম কবি রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' এবং 'রক্তকরবী' নাটকের বিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তিন জন নাট্যকারের মাত্র সাতখানি নাটকের বিচার একগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করায় গ্রন্থখানির অভঙ্গ-কৌলীন্য বেশ খানিকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু ফলিত সমালোচনা (practical criticism) হিসাবে গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই একটু স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দাবী করিতে পারে। ইহাতে যে শুধু নাটকগুলির

তন্ন তন্ন বিচার আছে তাহাই নহে, নাট্যকার-ত্রয়ের ব্যক্তি-মানসের প্রকৃতি, পারস্পরিক পার্থক্য এবং সৃষ্টি-প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা প্রভৃতিও রহিয়াছে। বিশেষতঃ, নাটকের শ্রেণী-নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে, নাটকের লক্ষণাদি সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থাদি-অবলম্বনে পর্য্যাপ্ত আলোচনা করিয়াছি। সহৃদয় পাঠকগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিবেন যে, আমি নাট্যকারদের ব্যক্তি-মানসের পরিমণ্ডল নিরূপণ করিবার উপর খুবই গুরুত্বারোপ করিয়াছি এবং ইহাই স্পষ্টভাবে দেখাইতে চাহিয়াছি যে, কোন-প্রতিভাই 'আকাশ-হইতে-পড়া' নহে এবং 'স্বর্গ-হইতে-গড়া' নহে—অর্থাৎ সৃষ্টি-বৈশিষ্ট্য স্রষ্টার ব্যক্তি-মানসের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত এবং ঐ ব্যক্তি-মানস সামাজিক নিয়ন্ত্রণেরই ফল।

আমি দেখাইতে চাহিয়াছি যে, ব্যক্তি-মানসের প্রকৃতির এবং পরিবেষ্টনীর চাহিদার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই সৃষ্টির "কি ও কেন" নিহিত থাকে। প্রতিভাকে অলৌকিক লোকের প্রেরণা বলিয়া মনে করা, অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই বিচারক্ষেত্রে প্রবেশ করা। মোটকথা, সাহিত্য-সৃষ্টিতে দৈব-প্রেরণা স্বীকার না করিলে, যুক্তি-যুক্তভাবে যাহা যাহা স্বীকার করা দরকার, সেই দিকেই আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সাহিত্য-সৃষ্টিকে আমি অনির্দ্দেশ্যবাদীর দৃষ্টিতে নহে— সম্পূর্ণ নির্দ্দেশ্যবাদীর (deterministic) দৃষ্টিতেই দেখি, এবং সাহিত্য-বিচারে আমি Stimulus-Response Theory-তেই আস্থা রাখি।

আর একটি বিষয়েও আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি—লক্ষণ সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া না লওয়াতেই সাহিত্য-বিচার-ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়া থাকে। নাটকের শ্রেণী-নির্ণয়-ক্ষেত্রে এই কারণেই যত বাদ-বিসংবাদ। এক ট্র্যাজেডির লক্ষণ লইয়াই

কত মতভেদ। কেহ বলেন—ট্র্যাজেডি যে feeling উদ্রিক্ত করিবে তাহা fear and pity, কেহ বলেন—তাহা fear and pily'র কোনটিই না, ট্র্যাজেডি উদ্রিক্ত করিবে—feeling of awe and grandeur। তারপর, ট্র্যাজেডির এবং মেলোড্রামার পার্থক্য লইয়াও কম মতভেদ দেখা যায় না। ঘটনা-বিন্যাস 'মেলোড্রামাটিক' অর্থাৎ রোমাঞ্চকর হইলেই নাটক 'মেলোড্রামা' হইবে এমন কোন কথা নাই—এই কথাটি বিস্মৃত হইয়া যাওয়াতেই অনেক সমালোচক ভুল সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। এই বিষয়টিই তুলিয়া ধরিতে যাইয়া, প্রফুল্ল নাটকের শ্রেণী-পরিচয় নিরূপণ-প্রসঙ্গে, আমি বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার শেক্‌সপিয়রের নাম অনেক বার উল্লেখ করিয়াছি। পাঠকগণ যেন মনে না করেন যে, আমি শেক্‌সপিয়রের সহিত বাংলা নাট্যকারের সমকক্ষতা স্থাপন করিতে চাহিয়াছি। শেক্‌সপিয়রের নাট্য-প্রতিভা অসামান্য—বলা চলে, শেক্‌সপিয়রই শেক্‌সপিয়রের তুলনা। শেক্‌সপিয়রের নাটক দৃষ্টান্তস্থল করিয়া আমি শুধু ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ঘটনা-সংস্থাপনে মেলোড্রামার লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও আত্মিক মহিমার গুণে নাটক মেলোড্রামার সীমা অতিক্রম করিয়া ট্র্যাজেডির পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে। আমার এই উদ্দেশ্যটুকু না ধরিতে পারিলে ভুল বোঝার সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে। পাঠকগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিবেন—আমি প্রচলিত লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে প্রয়োগ করিয়া সুসঙ্গত ভাবে নাটকের শ্রেণী নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ বিষয়েও পূর্ব্ববর্ত্তী সমালোচকদিগের সহিত আমার মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে যথেষ্ট। তবে আমার পক্ষে সৌভাগ্যেরই কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু অধ্যাপক, সুবিখ্যাত সমালোচক ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেকক্ষেত্রেই এবং অনেক বিষয়েই আমার সহিত একমত

হইয়াছেন। এই গ্রন্থেরই ভূমিকা অংশে তিনি 'প্রফুল্ল' নাটকের শ্রেণী-পরিচয়ের উপর যে আলোকপাত করিয়াছেন, তাহা বহু-বিসংবাদিত একটি জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছে—'প্রফুল্ল' নাটকের ট্র্যাজেডিত্ব ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

তারপর, সমালোচিত নাটকগুলির প্রচলিত সমালোচনার সহিত অনেক বিষয়েই আমি একমত হইতে পারি নাই। তবে উক্ত সমালোচনার দ্বারা আমি নানাভাবে উপকৃত হইয়াছি। বিশেষতঃ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায় এবং বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ প্রমুখ মহাশয়গণের গ্রন্থ হইতে আমি যথেষ্ট সাহায্যই পাইয়াছি। তথ্য-সংগ্রহে ডাঃ সেন, শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের গ্রন্থই বিশেষভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছে। ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহে ৺সতীশচন্দ্র মিত্রের এবং সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের গ্রন্থই আমার প্রধান সহায় হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় "স্টোরিয়া-ডো-মোগর" নামক একখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ দিয়া আমাকে খুবই অনুগৃহীত করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের কাছেই আমি কম-বেশী কৃতজ্ঞ।

এই সকল সাহায্য ছাড়াও অনেকে অনেক কিছু দিয়া গ্রন্থ রচনায় আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন তাহার জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

গ্রন্থখানিকে ত্রুটিশূন্য করিতে পারিয়াছি—এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না; তবে যাঁহাদের উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি লিখিত তাঁহারা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইলে, নিশ্চয়ই আমি নিজের শ্রমকে সার্থক মনে করিব। সমালোচকদিগের বিচার-বুদ্ধির অগ্নিতে আমার এই সমালোচনা পরীক্ষিত হউক—ইহাই আমার একান্ত কামনা।

বঙ্গবাসী মহাবিদ্যালয়,
কলিকাতা
বৈশাখ, ১৩৫৭

শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য্য

ভূমিকা

অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য্যের 'নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক-বিচার' গ্রন্থের সগ্যপ্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড পড়িয়া প্রীত হইলাম। এই দ্বিতীয় খণ্ডে লেখক ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপ-আদিত্য', 'আলমগীর,' 'ভীষ্ম' এবং গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' ও 'শঙ্করাচার্য্য,' এবং রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' ও 'রক্তকরবী' নাটকের আলোচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে সমালোচনা পুস্তকের স্বল্পতার জন্য শিক্ষার্থীগণ প্রকৃত রসাস্বাদন ও মূল্যবিচার সম্বন্ধে বিশেষ কোন নির্ভরযোগ্য নির্দ্দেশ পায় না। তা ছাড়া লেখক সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্যের ও সুবিধাজনক সংগ্রহ হাতের কাছে না থাকায় তাহাদের অভিমত-গঠনের আরও অসুবিধা হয়। সাধনকুমার তাঁহার গ্রন্থটিতে জ্ঞাতব্য তথ্যের নিপুণ সমাবেশে ও বিচার ও বিশ্লেষণ-রীতির সুষ্ঠু নির্দ্দেশে শিক্ষার্থীদের এই গুরুতর অভাব মোচন করিয়া তাহাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

সাধারণতঃ নাট্যসাহিত্য বিষয়ে যে কয়েকটি সমালোচনাগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেক লেখক বা নাটক সম্বন্ধে কিছু সাধারণ, ভাসা-ভাসা রকমের উক্তিতেই সীমাবদ্ধ। তাহাদের মধ্যে যুক্তিশৃঙ্খলার রীতিটি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পারম্পর্য্য-সূত্রটি সব সময় সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে না। সাধনকুমার এইরূপ অর্দ্ধস্ফুট, সাধারণ মন্তব্যে সন্তুষ্ট নহেন; তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের প্রত্যেকটি যুক্তি যাচাই করিয়া লইয়াছেন, প্রতিটি সিদ্ধান্তের পিছনে যে স্বতঃস্বীকৃতি স্পষ্ট উল্লিখিত না হইয়াও লেখকের যুক্তিধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা দ্বারা তাহার স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করিতে চাহিয়াছেন। ইহাতে ছাত্রেরা যে স্বাধীন চিন্তার একটা প্রশংসনীয় আদর্শ পাইবে

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্লথ-শিথিল পূর্ব্বসংস্কার, প্রচলিত মতবাদের নির্ব্বিচার অনুসরণ, মধ্যপথে চিন্তাবিরতির উপভোগ্য আরাম তাঁহার তীক্ষ্ণ খোঁচায় বিব্রত হইয়া অর্দ্ধ-সুষুপ্তির আবেশ হইতে রূঢ়ভাবে জাগরিত হইয়াছে—রসাস্বাদনের বদ্ধ জলাশয়ে তরঙ্গ সঞ্চার হইয়াছে। অবশ্য সর্ব্বত্রই যে তাঁহার চিমটি-কাটা যুক্তিযুক্ত বা সার্থক হইয়াছে এ কথা বলি না; তথাপি এই চিমটি কাটার যে প্রয়োজন আছে, ইহাতে আমাদের আত্মপ্রসাদ যে নিজ ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিবে, অসতর্ক বাক্-বিন্যাস যে দুর্ব্বল যুক্তির রন্ধ্রপথগুলি বন্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিবে তাহা সুনিশ্চিত।

বাংলা নাটক আলোচনা সম্বন্ধে দুই একটি মূল সূত্র নির্দ্দেশের প্রয়োজন আছে। ইংরেজী ও গ্রীক নাট্যসাহিত্য বিচারের মানদণ্ডে বাংলা নাটকের বিচার হইয়া থাকে। প্রধানতঃ শেকসপিয়ারের আদর্শই বাংলা নাটকের উৎকর্ষ অপকর্ষ অবধারণে আমাদের অভিমতকে নিয়ন্ত্রিত করে। কাজেই 'সাজাহান' বা 'প্রফুল্ল' নাটকের ট্রাজিক রস বিচারে আমরা 'কিং লিয়ারের' দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া থাকি। ট্রাজেডির আদর্শ কি, ট্রাজেডির রসস্ফুরণের কিরূপ বিবিধ উপায়, উহার নায়কের কি বিশিষ্ট গুণ-সমন্বিত হওয়ার প্রয়োজন, ট্রাজেডিতে অতিনাটকীয় উপাদানের (melodrama) কতটা স্থান আছে ইত্যাদি প্রশ্নের আলোচনায় শেকসপিয়ারের সমালোচকগণ যে মূলনীতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আমরা তাহারই ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রয়াস পাই। এই রীতি মোটের উপর প্রশংসনীয় হইলেও একেবারে নিরাপদ নহে। এই আদর্শের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের রন্ধ্রপথ দিয়া আমাদের বিচার-বুদ্ধিতে কতকটা বিভ্রান্তির শনি প্রবেশ করে। মনে রাখিতে হইবে যে শেকসপিয়ার একটা অসাধারণ ব্যতিক্রম। নাটক-সমৃদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যেও

তিনি তুলনা-রহিত। তাঁহার সমসাময়িক নাট্যকার-গোষ্ঠীকে বহু নিম্নে ফেলিয়া তিনি গৌরীশঙ্করের তুঙ্গ শৃঙ্গের ন্যায় নিঃসঙ্গ মহিমায় বিরাজিত। তিনি মোটেই অনুকরণের উপযোগী পাত্র নহেন। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল, ভগবানের সৃষ্টিরহস্যের নিগূঢ় প্রেরণা প্রতিভাশালী মানব-স্রষ্টার পক্ষেও অননুকরণীয়। শেকসপিয়ারের নাটকে নানা অসম্ভব ঘটনা, নানা অবিশ্বাস্য খেয়াল, রোমান্সের বিচিত্র রঙ্গীন কল্পনা, ইতিহাসের স্থূল বস্তুতন্ত্রতা, মূঢ় কুসংস্কার-প্রবণতা, পরিচিত বিশ্ববিধানের অস্বীকৃতি, আকস্মিক দুর্দ্দৈবের অতি-প্রাচুর্য্য পুঞ্জীভূত হইয়াছে। কিন্তু সমুদ্র-পর্ব্বত-অরণ্যানী প্রভৃতি সৃষ্টি-প্রহেলিকার দৃষ্টান্তের মধ্যেও যেমন আমরা স্রষ্টার অমোঘ নীতির প্রচ্ছন্ন প্রভাব অনুভব করি, শেক্‌সপিয়ারের নাটকেও সেইরূপ সমস্ত খামখেয়ালী ও উৎকট অস্বাভাবিকতার মর্ম্মস্থলে এক অতন্দ্র নিয়মানুবর্ত্তিতার, এক অপ্রমত্ত নিয়ন্ত্রণ-শক্তির সক্রিয়তা সম্বন্ধে সচেতন হই। তাঁহার Ariel, Titania, Oberon প্রভৃতি পরী-রাজ্যের অধিবাসী, তাঁহার ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী, তাঁহার অর্দ্ধ-দেব Prospero ও অর্দ্ধ-পশু Caliban, তাঁহার উদ্ভট, উদ্দাম কল্পনার প্রতিচ্ছবিগুলিও এক সাধারণ মানবিক ধর্ম্মের বন্ধনে আমাদের সহিত সমযোগসূত্রে বিধৃত আছে। ইহাদের অনুভবশক্তি ও ভাষা এক নিগূঢ় আত্মীয়তার সূত্রে মানবের মনে প্রতিধ্বনি জাগায়। তাঁহার ট্রাজেডির নায়ক-নায়িকারা স্বাভাবিকতার নিয়ম উৎকটভাবে উল্লঙ্ঘন করিয়াও জীবনের বৈদ্যুতী শক্তিতে পরিপূর্ণ। হ্যামলেটের চলচ্চিত্ততা, লিয়রের ছেলেমানুষি পাগলামি, ওথেলোতে একটি তুচ্ছ বুঝিবার ভুল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ট্রাজেডির উপকরণে পরিণত হইয়াছে। ট্রাজেডির মূল সূত্র নির্দ্ধারণে আমরা ইহাদের চরিত্র ও আচরণের বৈশিষ্ট্য হইতে নায়কের সাধারণ ধর্ম্ম-লক্ষণ ঠিক করি, ঘটনা-

সংস্থানের ধারা হইতে সমস্ত ট্রাজেডির উপযোগী ঘটনা সম্বন্ধে অভিমত গঠন করি। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে শেকসপিয়রের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রতিভা না থাকিলে তাহার বহিরঙ্গের অনুকৃতিতে উচ্চাঙ্গের নাটক গড়িয়া উঠিবে না। সাধারণ কামারশালায় স্বল্পায়তন ধাতুপিণ্ডকে গলাইয়া ইচ্ছামত রূপ দেওয়া যায়; কিন্তু বিরাট মহাকায় বস্তুপর্ব্বতকে স্বীয় সূক্ষ্মতর উদ্দেশ্যের অনুযায়ী রূপ দিতে গেলে দ্রবকারী অগ্নিশিখার যে কেন্দ্রীভূত দাহিকাশক্তির প্রয়োজন তাহা সাধারণ কামারশালায় মেলে না। বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশালা না হইলে বজ্র নির্ম্মাণ সম্ভব নয়। হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, কিং লিয়র প্রভৃতির মধ্যে উচ্চতম ট্র্যাজিক রসের স্ফুরণ করিতে নাট্যকারের যে অপরিমেয় কল্পনার ঐশ্বর্য্যের, যে মর্ম্মোদঘাটনকারী দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছিল তাহার তুলনাস্থল বিশ্বসাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই।

সুতরাং যখন দেখি যে আমাদের বিয়োগান্ত নাটকের ঘটনা-সংস্থিতি ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য শেকসপিয়ারের অনুরূপ উপাদানের সহিত উপমিত হইতেছে, তখন এই তুলনায় অনৌচিত্য সম্বন্ধে সংশয় থাকে। হ্যামলেট বা কিং লিয়ার হেঁয়ালী ও বিপদের অভিঘাতে নিষ্ক্রিয় ছিলেন বলিয়া যে-কোন নায়ক যে দুর্ব্বলচেতা ও নিষ্ক্রিয় থাকিয়া নায়কোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবেন ইহা ঠিক সমর্থনযোগ্য নহে। সেইরূপ ট্রাজেডি ঘটার কারণ—নিয়তি প্রেরিত দুর্দ্দৈব, বা নায়কের চারিত্রিক দুর্ব্বলতা বা ঘটনানিয়ন্ত্রণের অক্ষমতা—সমস্ত সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে না। জাগতিক বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আরও অনেক অভিনব হেতু আবিষ্কৃত হইতে পারে। সুতরাং কারণের দিকে খুব বেশী ঝোঁক না দিয়া নায়কের আচরণের উপর তাহাদের প্রতিক্রিয়াটি বিবেচনা করিলে প্রশ্নের মীমাংসা সহজ হইতে পারে। আমাদের দেখিতে

হইবে যে যে-দিক দিয়াই নায়কের জীবনে দুর্দ্দৈবের অভিঘাত প্রবেশ করুক না কেন, তাহার আচরণে উপযুক্ত মর্য্যাদা-বোধ, ভাব-গভীরতা ও চরিত্রের মহনীয়তার নিদর্শন স্ফুরিত হইয়াছে কি না। যোগেশের নিষ্ক্রিয়তা রাজা লিয়রের আদর্শে বিচার্য্য নহে; কিন্তু তাহাদের সমস্ত দুর্ব্বিপাকের মধ্যে তাহার চরিত্রে একটা গৌরবের লুপ্তাবশেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না তাহাই বিবেচ্য বিষয়। পাঠকের মনে সর্ব্বশুদ্ধ যে ধারণাটি স্থায়ী হয়, তাহাতে যোগেশ-চরিত্রে এই মহনীয়তার লক্ষণ স্থান পায়। মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া সাধারণ লোকের ধর্ম্ম; কিন্তু পাতালের অন্ধতম স্তরে, অতল গভীরতায় অবতরণ অভিজাত-চরিত্র ছাড়া সম্ভব হয় না। প্রতিরোধ না করিয়া চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ, স্ত্রীর মৃত্যুতে ঔদাসীন্য, ছেলের হাত হইতে তাহার শেষ সম্বল একটি সিকি কাড়িয়া লওয়া, ভস্মীভূত সমস্ত জীবন হইতে উত্থিত একটি শ্বাসরোধকারী ধূম্রোচ্ছ্বাস ও বহ্নিগর্ভ খেদোক্তি—'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' ইহাই যোগেশের ট্রাজিক নাটকের উপযোগিতার, তাহার চরিত্রের কৌলীন্য-মর্য্যাদার নিদর্শন, লিয়ারের অনুকরণে নহে। নিষ্ক্রিয়তা যখন আসে অসংবরণীয় ভাবাবেগ হইতে, সমস্ত সত্ত্বার উল্লিখিত ভাব-বিপর্য্যয় হইতে তখনি ইহা প্রকৃতির একটা রাজকীয় মর্য্যাদা বহির্লক্ষণ রূপে প্রতিভাত হয়; অন্যথা নহে। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে আমরা সত্যের কাছাকাছি পৌছিতে পারিব।

আমার মনে হয় বাংলা বিয়োগান্ত নাটক বিচার-উপযোগী পটভূমিকা শেক্‌সপিয়ার নহে, এলিজাবেথীর যুগের অন্যান্য নাট্যকার —ওয়েবষ্টার, ম্যাসিঞ্জার, বোমণ্ট ও ফ্লেচার ও ফোর্ড। তাঁহাদের নাটকে প্রধানতঃ পারিবারিক দুর্ব্বিপাকই আলোচ্য বিষয়; ও মহত্ত্বের সঙ্গে দুর্ব্বলতা, অতিনাটকীয় প্রবণতার সঙ্গে প্রকৃত ট্রাজিক

গৌরবের একটা অদ্ভুত রকমের সংমিশ্রণ আছে। পাশ্চাত্য সমালোচনা ইঁহাদের গৌরব ও বিচ্যুতিকে, ইঁহাদের বিকৃত, অথচ অবিসংবাদিত প্রতিভাকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়াছে। ইঁহাদের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের বাংলা নাটকের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণের সুবিধা হইবে। আশা করি আমাদের নাট্যসাহিত্যের সমালোচকগোষ্ঠী ভবিষ্যতে কেবল শেক্‌সপিয়ারের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ না রাখিয়া সমস্ত এলিজাবেথীয় ও আধুনিক যুগের নাটকের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের বাংলা সাহিত্যের বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন। তাহা হইলে বর্ত্তমান বিচারে মাঝে-মধ্যে যে একদেশদর্শিতা দেখা যায় তাহার নিরাকরণ সম্ভব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বৈশাখ, ১৩৫৭

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ

কোন স্রষ্টার সৃষ্টি-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, প্রথমেই স্থির করিয়া লওয়া উচিত—বিচার-দর্শনের প্রকৃতি—বিচার-পদ্ধতি, এক কথায় দৃষ্টিভঙ্গী। যিনি যেরূপ দার্শনিক ভূমিকে ভিত্তি করেন, তিনি সেইরূপ বিশেষ ভঙ্গী লইয়াই সৃষ্টির 'কি ও কেন' নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। এই দার্শনিক ভিত্তিভূমি বা দৃষ্টিকোণ প্রধানতঃ দুই প্রকার; এক অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিকোণ, দুই বিবর্ত্তনবাদী বা বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিকোণ। অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা বা স্বরূপ আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইলে আমাদের প্রতিজ্ঞা দৈব প্রেরণার মূলসূত্র দিয়াই আরম্ভ করিতে হয়—দৈব প্রেরণার রহস্য দিয়া কাব্য-প্রতিভার বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করিতে হয়; আর বিবর্ত্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অগ্রসর হইলে দৈব প্রেরণাদি অলৌকিক প্রেরণা অস্বীকার করিতে হয় এবং কাব্যলোকেও কার্য্য-কারণ-তত্ত্বের সূত্রাবলী প্রয়োগ করিয়া প্রত্যেকটি ধারণাপ্রেরণার 'কি ও কেন' নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

বিবর্ত্তনবাদ—বিজ্ঞানবাদ, আজ এত সুপ্রতিষ্ঠিত যে উহাকে অস্বীকার করা আর চক্ষু বুজিয়া থাকা প্রায় একই কথা। পৃথিবীর ব্যাখ্যা, প্রাণের ব্যাখ্যা, এক কথায় জড় ও জীব জগতের ব্যাখ্যা, সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যা—সর্ব্বক্ষেত্রেই আজ বিবর্ত্তনবাদী দর্শনের প্রয়োজন। সুতরাং সাহিত্যক্ষেত্রেও, সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে, বিজ্ঞানবাদী বিচার-পদ্ধতি অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক; অন্যথা সাহিত্য-সৃষ্টির প্রকৃত পরিচয় রহস্যাবৃত থাকিতে বাধ্য, কারণ

স্রষ্টা তখন অলৌকিক প্রেরণারই মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নহেন।

বিবর্ত্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

অতএব, আমাদের বিবর্ত্তনবাদী দৃষ্টি লইয়াই অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতে হইবে—স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হইবে যে, সাহিত্য-সৃষ্টিতে দৈব প্রেরণার অংশ থাকিতে পারে না এবং নাই, অর্থাৎ স্রষ্টা দৈব শক্তির প্রেরণায় সাহিত্য-সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হন না। এই সিদ্ধান্তের অপর দিক এই যে, সৃষ্টির প্রেরণায় যদি দৈব শক্তির অংশ না থাকে তাহা হইলে প্রেরণার সমগ্রটুকুই লৌকিক অর্থাৎ সামাজিক অর্থাৎ স্রষ্টারূপী সামাজিক ব্যক্তিরই আত্মপ্রকাশের কামনা,—এবং স্রষ্টার বিশেষ ব্যক্তিমানসের, তাঁহার পরিবেষ্টনীর বা সামাজিক সংস্থার সহিত বুঝাপড়ারই অর্থাৎ উহার আবেদনে সাড়া দেওয়ার ইচ্ছারই একটা রূপ। মোটকথা এই যে, স্রষ্টার মানস প্রকৃতির এবং সামাজিক আবেষ্টনীর প্রকৃতির মধ্যেই সৃষ্টির শিল্পগত বিষয়গত বৈশিষ্ট্য—এক কথায় সৃষ্টির আত্মিক ও দৈহিক বিশেষত্ব নিহিত থাকে। শিল্পরচনা আপাতদৃষ্টিতে যত অসাধারণ ও রহস্যময় বলিয়াই মনে হউক, উহার মধ্যে যত কল্পনা-বৈচিত্র্য আর ভাব-বৈভবই থাকুক—উহা যত আত্মকেন্দ্রিক বা আত্মনিবিষ্ট (Subjective) হউক অথবা যত বস্তুনিবিষ্টই (Objective) হউক, উহা বস্তুতঃ শিল্পী নামক কোন এক সামাজিক ব্যক্তির আধিমানসিক আচরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই আচরণের মধ্যে সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান (এমন কি নির্জ্ঞান স্তরেরও) ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যত সূক্ষ্ম এবং যত জটিল রূপই আত্মপ্রকাশ করুক, উহার আন্তর প্রেরণা ব্যক্তির মানস-প্রবণতা এবং বাহ্য প্রেরণা পরিবেষ্টনীর বিশেষ অবস্থা ও আকর্ষণ, অর্থাৎ অন্যান্য

মানসিক আচরণের মতই উহা ব্যক্তির আন্তর প্রবণতা এবং পরিবেষ্টনীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই বিশেষ রূপ। এই আধিমানসিক আচরণ অসাধারণ হইতে পারে কিন্তু অলৌকিক বা অকারণ নহে—কার্য্যকারণের নিয়মের বাহিরে নহে।

অতএব, সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের 'কেন ও কি' সম্যক অবগত হইতে হইলে প্রথম কাজ—স্রষ্টার ব্যক্তিমানসের ও পরিবেষ্টনীর বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করা বা নির্দ্ধারণ করা। কেন এক কবির মধ্যে কল্পনা-প্রবণতা বেশী, কেন একের মধ্যে অন্যাপেক্ষা ভাব-ধারণার ও অনুভাব সঞ্চারের ক্ষমতা-পার্থক্য, কেন একজন কল্পলোকে থাকিয়া আরাম পান, আর একজন বাস্তবের মধ্যে নামিয়া না দাঁড়াইতে পারিলে অস্বস্তি বোধ করেন—এইরূপ নানাবিধ "কেন"র যথার্থ মীমাংসা করিতে হইলে ব্যক্তিমানসের ও আবেষ্টনীর স্বরূপ নির্দ্ধারণ, বলা চলে অত্যাবশ্যক—এমন কি অপরিহার্য্যও।

ব্যক্তি-পরিচয় প্রসঙ্গ

আমরা দেখি, প্রত্যেকটি "ব্যক্তি-সত্তা" বিশেষ স্থানিক এবং কালিক আবেষ্টনী দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। প্রত্যেকটি "ব্যক্তি-সত্তা" মনুষ্য জাতির মৌলিক সংস্কার লইয়া জন্ম গ্রহণ করে বটে, কিন্তু বংশানুলব্ধ বিশেষ সংস্কার বা প্রবণতা, পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং সামাজিক সংস্থা, মৌলিক প্রবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তি-সত্তাকে বিশিষ্টতা দান করে। কোন এক ব্যক্তির সহিত অন্য কোন ব্যক্তির ধারণা-প্রেরণার যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহার মূলে বংশানুলব্ধ প্রবণতার বৈশিষ্ট্যটুকু ছাড়াও প্রধানতঃ থাকে ব্যক্তির স্থানিক (পরিবারগত, সমাজগত ও শ্রেণীগত) ও কালিক পরিবেশের প্রভাব। এই পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের উপরেই প্রধানতঃ ব্যক্তিমানসের স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করে। দৃষ্টান্ত দিতে বলা

যায়—বৈদিক যুগের ব্যক্তি-মানসের যে সাধারণ প্রকৃতি অর্থাৎ ধারণা-প্রেরণা, তাহা অপেক্ষা পৌরাণিক যুগের প্রকৃতি অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র ও বিচিত্র; আবার পৌরাণিক যুগের প্রকৃতি অপেক্ষা তৎপরবর্তী কালের প্রকৃতি নানারূপে বিচিত্র ও স্বতন্ত্র। এইরূপ প্রত্যেক যুগ প্রত্যেক কালিক সংস্থা, নিজস্ব ধারণা-প্রেরণার বৈশিষ্ট্যে তদধীন ব্যক্তি-মানসকে বিশিষ্ট করিয়া রাখে। অবশ্য তাহা করে বলিয়াই যে কোন এক বিশেষ যুগের প্রত্যেকটি ব্যক্তির ধারণা-প্রেরণা একরূপ হইয়া দাঁড়ায় তাহা নহে। যুগের সাধারণ ধারণা-প্রেরণার আয়তনের মধ্যে থাকিলেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নানা পার্থক্য। এই নানাত্বের কারণ—ব্যক্তির নিজের নিজের বিশেষ স্থানিক সংস্থা—ব্যক্তির পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব—শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ-সুবিধার মাত্রাগত তারতম্য। স্পষ্টই তো এইরূপ দেখা যায় যে, পরিবারের বিশেষ ধরণের শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব সংস্কারের মত ব্যক্তি-মানসে স্থায়ী হইয়া ব্যক্তির ভাবী কার্য্যকলাপ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে; দেখা যায় যে, বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তথা নানারূপ সুযোগ সুবিধার সদ্ভাব বা অভাব থাকায় ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ব্যাপকতর অথবা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে—সুযোগ সুবিধা পাওয়ায় ব্যক্তি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা ও ধারণা-প্রেরণা লাভ করে; ফলে ভাবগ্রাহিতায় আসে তাঁহার নবতর সংবেদন-শীলতা, ভাবপ্রকাশে দেখা দেয় নতুন নতুন কল্পনাবৈচিত্র্য—জীবন-দর্শনে আসে ব্যাপকতর ও গভীরতর দৃষ্টিশক্তি। কিন্তু এখানেও সেই আগেরই কথা—একই পরিবারে বা একই সামাজিক সংস্থার মধ্যে থাকিলেই প্রত্যেকটি ব্যক্তি এক ধরণের হইয়া উঠে না। এক পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও একের সহিত অন্যের পার্থক্য দেখা যায় এবং এমন কি একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যেও একে অন্যের অনুরূপ হয় না।

এই পার্থক্যের কারণ হিসাবে জন্মান্তরীয় সংস্কারকে স্বীকার করিয়া লইলে উত্তর একটা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু এই উত্তর প্রকৃত বিবর্ত্তনবাদের সমর্থন পায় না। বিবর্ত্তনবাদ বংশগত সংস্কারের অনুলব্ধি স্বীকার করে সত্য কথা, কিন্তু এই স্বীকৃতির সহিত জন্মান্তরবাদ স্বীকারের কোন সম্বন্ধ নাই।

জন্মগত ও সামাজিক সংস্কার

মোটকথা, বিবর্ত্তনবাদ আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে না এবং বংশানুলব্ধ সংস্কার বলিতে সাধারণতঃ স্নায়ুপ্রবণতার অনুবৃত্তিই ধরিয়া থাকে। তবে ব্যক্তিমানসের মৌলিক প্রবণতার কতটুকু সহজাত সংস্কারের দান আর কতখানিই বা পরিবেষ্টনীর দান এ বিষয়ে সত্য নির্দ্ধারণ করা খুবই দুঃসাধ্য—অসাধ্য বলিলেও বর্ত্তমানে কেহ কিছু আপত্তি করিতে পারেন না। আমেরিকার দার্শনিক Dewey মহাশয়ের *Reconstruction in Philosophy* গ্রন্থের পরিচয় প্রসঙ্গে Will Durant মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে স্মরণ করিলে বক্তব্য বিষয় অনেক পরিমাণে স্পষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তিনি লিখিয়াছেন: The individual is as much a product of society as society is a product of the individual—a vast networks of customs, manners, conventions, language and traditional ideas, lies ready to pounch upon every new born child to mould it into the image of the people among whom it has appeared. So rapid and thorough is the operation of this social heredity that it is often mistaken for physical or biological heredity. (*The Story of Philosophy*).

দার্শনিক ডিউইও বলিতে চাহেন যে কতটুকু জন্মগত সংস্কার আর কতটা সামাজিক সংস্কার বুঝা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার; এই কারণেই অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কারানুলব্ধকে জন্মগত অনুলব্ধি বলিয়া ভুল হইয়া থাকে।

বাস্তবিক, ব্যক্তির বংশানুলব্ধ সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনযাত্রার প্রতিক্ষণের ধারণা-প্রেরণার আগম-নিগমের হিসাব রক্ষা করিতে না পারিলে, ব্যক্তির আধিমানসিক আচরণের গতিবিধির যথার্থ পরিচয় সংগ্রহ করা অসম্ভব। অথচ এই যথার্থ পরিচয় উদ্ধার করিতে না পারাতেই ব্যক্তির আচরণ অদ্ভুত ও অকারণ বলিয়া মনে হয়; যে শক্তি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত নানা সঞ্চিত শক্তিরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল, তাহাকেই অলৌকিক বলিয়া ভ্রম জন্মে এবং যে-প্রেরণা বাহ্য পরিবেশের চাহিদার ফলে অন্তরে উদ্ভূত হয় তাহাকে "মুক্ত প্রেরণা" (free inspiration) বলিয়া রহস্যময় করিয়া তোলা হয়।

তবে এ কথা যদিও সত্য যে, প্রত্যেকটি ক্ষণের হরণ-পূরণের সংবাদ জানা না থাকিলে ব্যক্তির ধারণা-প্রেরণার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয় না, তথাপি সৃষ্টির যথার্থ পরিচয় দিতে হইলে স্রষ্টার ব্যক্তিমানসের সাধারণ প্রবণতাগুলির এবং তাঁহার পরিবেশের মোটামুটি প্রেরণার বিবরণ সংগ্রহ করিতেই হইবে।

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ব্যক্তিমানস নির্দ্ধারণ করিতে অগ্রসর হইবার মুখেই আমরা মূলসূত্রটিকে আবার স্মরণ করিয়া লইব। আমাদের শেষ পর্য্যন্ত ইহাই দেখাইতে হইবে যে, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার সমসাময়িক বৃদ্ধ গিরিশচন্দ্র, অথবা সমসাময়িক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল কিংবা কবি-নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ হন নাই তাহার কারণ নিহিত আছে ক্ষীরোদ-

প্রসাদের ব্যক্তিমানসের এবং পরিবেষ্টনীর প্রকৃতির মধ্যেই—Heavenly Muse-এর পক্ষপাতের মধ্যে নহে। একই সময়ে জন্মগ্রহণ ও জীবনধারণ করা সত্ত্বেও কেন রবীন্দ্রনাথ কবিত্বময় হইয়া উঠিয়াছিলেন, কেন দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকার হিসাবে অধিকতর প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন আর ক্ষীরোদপ্রসাদ নিজেই বা কেন ঐরূপ হইলেন —এই সকল রহস্যের সন্ধান উল্লিখিত উপায়েই বাহির করিতে হইবে। নান্য পন্থা বিদ্যতে…

পারিবারিক প্রভাব

ক্ষীরোদপ্রসাদের ব্যক্তিমানসের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, সে তাঁহার অলৌকিক রহস্য প্রবণতা। আমরা জানি যে ক্ষীরোদপ্রসাদ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তান্ত্রিক সাধকের বংশ এবং সে বংশ—গুরুবংশ। তাঁহার পিতা কেবল নামেই তান্ত্রিক বংশের বংশধর ছিলেন না কার্য্যতও বংশের ধারাটি ধারণ করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় অনুমেয়—ক্ষীরোদপ্রসাদের শৈশব-কৈশোর ও যৌবন তন্ত্রমন্ত্রের ঘন আবহাওয়ার মধ্যেই, অলৌকিক কাহিনীতে ও অস্বাভাবিক ঘটনায় বিশ্বাসের মধ্যেই অতিবাহিত হইয়াছিল—ইহার স্বাভাবিক পরিণতি যাহা হইবার তাহাই হইয়াছিল—অলৌকিক ও রহস্যময় কোন-কিছুতে বিশ্বাস ক্ষীরোদপ্রসাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল।

'অলৌকিক রহস্য' প্রবণতার ফলে সাহিত্যস্রষ্টা ক্ষীরোদপ্রসাদের অলৌকিক, আকস্মিক এবং রোমাঞ্চকর অহেতুক ঘটনা সৃষ্টির ঝোঁক আর দার্শনিক ক্ষীরোদপ্রসাদ তদানীন্তন 'অলৌকিক রহস্য' পত্রিকার সম্পাদক এবং থিওসফিক্যাল সোসাইটির সদস্য। বাস্তবিক এই প্রবণতার প্রাধান্য

এত বেশী ছিল যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদীক্ষার নিয়ন্ত্রণে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন তাহাতে ঘটে নাই। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদকে সমীক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহার চিত্তে উক্ত প্রবণতা উৎকল্পনার (fancy) এবং রোমাঞ্চকর ঘটনা সৃষ্টির মধ্য দিয়া বার বার সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তব অপেক্ষা অবাস্তব পরিবেশের প্রতি ক্ষীরোদপ্রসাদের আসক্তিও এই একই প্রবণতা হইতে জন্মিয়াছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের জীবনে 'পারিবারিক প্রভাব' বিশেষভাবে প্রবল ও সক্রিয়।

শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব

এই পারিবারিক পরিবেশ-প্রভাবের পরে ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যে নূতন একটি ক্ষেত্র হইতে প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রটি —শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্র—বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ক্ষেত্র। তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা কেবলমাত্র দেবভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। তখন ইংরেজের শাসন, ইংরেজীর আধিপত্য, ইংরেজী শিক্ষার তীব্র চাহিদা। ক্ষীরোদপ্রসাদের সৌভাগ্য—তিনি এমন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বা ছিলেন যেখান হইতে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ লওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। আর শুধু তাহাই নহে, তিনি বিজ্ঞানেই—বিশেষতঃ রসায়নশাস্ত্রেই বিশেষজ্ঞ হইতে মনোযোগী হইয়াছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ শুধু বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়া পর্য্যন্তই গেলেন না, রসায়নশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হইয়া "জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশান"-এ (বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) বিজ্ঞানের অধ্যাপনা কার্য্যেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিজ্ঞানের ছাত্র এবং অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও, ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকের সংস্কার খুব বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। বৈজ্ঞানিকের সহজ সংস্কার বলিতে বুঝায়—

কার্য্যকারণ তত্ত্বে অবিচলিত নিষ্ঠা, সহজ পরিমিতি-বোধ, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-পরায়ণতা এবং বিশ্লেষণ-প্রবণতা। ক্ষীরোদপ্রসাদের সাহিত্য-সৃষ্টি বিশ্লেষণ করিয়া ঐ কথা বলা যায় যে, তাঁহার রচনায় উল্লিখিত সংস্কারের কার্য্যকর প্রভাব খুব কমই পাওয়া যায়। কল্পনা-প্রবণতার সহিত পরিমিতি-বোধের সহজ সংযোগ না ঘটায় ক্ষীরোদপ্রসাদের অধিকাংশ নাটকে কাহিনী-কল্পনায় ও ঘটনা-সংস্থাপনে সঙ্গতির মাত্রা বহুবার ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে। ফলে নাটকগুলি রোমাঞ্চকর নাটকের স্তরেই রহিয়া গিয়াছে। আর, বিশ্লেষণী বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কম থাকায় সাধারণতঃ চরিত্রচিত্রণ গভীর ও দ্বন্দ্বজটিল হইতে পারে নাই। চরিত্র বিষয়ক ধারণা খুব সুস্পষ্ট ও যথেষ্ট থাকিলে চরিত্রের কাঠামো ও রূপ অত সরল ও অত অগভীর হইতে পারে না।

সহৃদয়তা (Sympathy)

অবশ্য কেবলমাত্র ধারণার সুস্পষ্টতাই চরিত্র সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নহে; চরিত্র সৃষ্টির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন—গভীর ও ব্যাপক সহৃদয়তা—সমবেদনশীলতা। চরিত্রকে জ্ঞান-যোগে পাওয়া এক কথা আর অনুভব-যোগে পাওয়া আর এক কথা; যে স্রষ্টা চরিত্রকে শুধু জ্ঞানের মধ্যেই ধারণ করেন, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রে আর সবই থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা থাকে না, তাহাকে বলা চলে 'চরিত্রের প্রাণ'। কিন্তু অনুভব-যোগে যাঁহারা চরিত্রকে উপলব্ধি করেন তাঁহারাই চরিত্রে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারেন—চরিত্রকে যথাযথরূপে হৃদয়বান্ করিয়া তুলিতে পারেন। প্রত্যেক বিখ্যাত স্রষ্টা, এই হিসাবে, অনুভব-যোগী—অতিমাত্র সহৃদয়। এই সহৃদয়তা (sympathy) যথেষ্টমাত্রায় থাকিলেই স্রষ্টার সত্তার একাংশ উপস্থাপ্য চরিত্রের সহিত একাত্মক হইয়া যায় এবং সেই একাত্মকতার সুযোগেই, স্রষ্টা চরিত্রটিকে নিখুঁত

রূপে,—সমগ্ররূপে দর্শন করিতে পারেন—চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন ভাব-বিক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিতে পারেন। স্রষ্টার মধ্যে এই সহৃদয়তা বস্তুটির দৈন্য থাকিলে সৃষ্ট চরিত্রে অনুভাব-দৌর্ব্বল্য অবশ্যম্ভাবী। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যে এই বস্তুটির দৈন্য আছে এবং আছে বলিয়াই নাট্যকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিস্থিতির স্বাভাবিক ও সম্ভাব্য আবেগানুভূতিকে রসময় রূপে উপস্থাপিত করিতে সক্ষম হন নাই; ফলে কয়েকটি চরিত্র বাদে, আলমগীর নাটক ব্যতিক্রম, অধিকাংশ চরিত্রই অনুভাব-দুর্ব্বল এবং অগভীর হইয়া পড়িয়াছে।

অধিকাংশ সমালোচকই ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের "কাহিনী-রসের" বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর কোন শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য দেখিতে পান নাই; এবং একজন ছাড়া (শ্রীমন্মথমোহন বসু) আর কেহই তাঁহার মধ্যে "অসামান্য নাট্য প্রতিভা" বা ভাবার উপর "অনন্য সাধারণ অধিকার" খুঁজিয়া পান নাই। যাহাই হউক, ক্ষীরোদপ্রসাদের ব্যক্তিমানসে সহৃদয়তার দৈন্য ছিল এই বিষয়টিই এ ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষণীয় প্রতিপাদ্য। সমসাময়িক নাট্যকারদিগের সৃষ্ট চরিত্রের অনুভাব-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলেই বিষয়টি স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল

আমরা পূর্ব্বেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে সহৃদয়তার দৈন্য থাকিলে চরিত্রে অনুভাব-দৌর্ব্বল্য অনিবার্য্য। এই সিদ্ধান্তের সূত্র দ্বারা বাঙলা সাহিত্যের তিনজন খ্যাতনামা নাট্যকারের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, গিরিশচন্দ্রে ও দ্বিজেন্দ্রলালে সহৃদয়তা যে পরিমাণে আছে, ক্ষীরোদপ্রসাদের সে পরিমাণে তাহা নাই। গিরিশচন্দ্র ছিলেন প্রথম শ্রেণীর

অভিনেতা, প্রথম শ্রেণীর অভিনয়-শিক্ষক ও পরিচালক। প্রথম্ শ্রেণীর অভিনেতা হইতে গেলে, প্রথম ও অপরিহার্য্য প্রয়োজন—আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অবস্থার অনুকরণে অসাধারণ সুদক্ষতা। গিরিশচন্দ্রের ইহা পূর্ণ মাত্রায় ছিল এবং ছিল বলিয়াই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রে কখনও অনুভাব-দৌর্ব্বল্য দেখা দেয় নাই। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালও গিরিশচন্দ্রের মতই প্রথম শ্রেণীর 'সহৃদয়' এবং এই সহৃয়তার মাত্রা উভয়ের মধ্যে প্রায় একই বলা যাইতে পারে। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যে ইহা যে একেবারে নাই তাহা নহে, তবে যে পরিমাণে থাকিলে চরিত্রগুলি অনুভাব-দৌর্ব্বল্যের মাত্রা অতিক্রম করে সে পরিমাণে উহা নাই।

প্রশ্ন আসিবে—তবে কি গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল চরিত্র চিত্রণে একই পর্য্যায়ের নাট্যকার? প্রশ্নের উত্তর এই যে—না, তাহা নহে, উভয়ের মধ্যে সহৃদয়তা বিষয়ে সাধর্ম্ম্য থাকিলেও চরিত্রের ধারণায় (design) এবং প্রকাশ-শক্তিতে (expression) উভয়ের মধ্যে লক্ষ্যণীয় পার্থক্য আছে। গিরিশচন্দ্রের চরিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্র অপেক্ষা ভাবের দিক দিয়া অনেক সরল এবং ভাব প্রকাশের দিক দিয়া অনেক পরিমাণে সহজ বা আভিধানিক (literal)।

দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রে ভাববন্ধের জটিলতা ও সূক্ষ্মগতি এবং ভাষায় লাক্ষণিক ও ব্যঞ্জনাশক্তির প্রাচুর্য্য, আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি অনেক পরিমাণে বেশী। অধিকন্তু অভিজ্ঞতা বা ভাবের ব্যাপ্তিতে এবং ভাব-বিশ্লেষণেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্যের কারণ দুই ব্যক্তির পরিবেশের বৈশিষ্ট্য—শিক্ষা-দীক্ষার, সংস্কারের বৈশিষ্ট্য। রঙ্গমঞ্চের তাগিদ, দর্শকগণের চাহিদা, ব্যক্তিগত শিক্ষা-দীক্ষা, ধারণা-প্রেরণা, রামকৃষ্ণের সংস্পর্শ ও প্রভাব, সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ের আলোকে গিরিশচন্দ্রকে সমীক্ষণ করিতে

চেষ্টা করিলে স্রষ্টা গিরিশচন্দ্রের স্বরূপ সহজেই বোধগম্য হইবে; তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের আলোকে দ্বিজেন্দ্রলালও স্বরূপতঃ প্রতিভাত হইবেন। তাঁহার বচন-বিন্যাসের রীতির, ভাব-বিশ্লেষণের ও ভাবপ্রকাশের শক্তির যে বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, চরিত্রসৃষ্টিতে যে মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা ও দার্শনিক পরিব্যাপ্তি দেখা যায়, তাহার কারণ কেবল মাত্র শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব নহে, তাহার কারণ এই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজী সাহিত্যের ভাব ও রসের মধ্যে আকণ্ঠ নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়া-ছিলেন, ইংরেজের দেশে প্রবাসী জীবন যাপন করায় ইংরেজী পরিমণ্ডলের অধিবাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন—ইংরেজী ভাষার প্রকাশভঙ্গী এবং ইংরেজী সাহিত্যের প্রকাশ-শক্তি তাঁহার ব্যক্তি-মানসে ওতঃপ্রোতভাবে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল। সহৃদয়তার সহিত এই বৈশিষ্ট্যের অন্তরঙ্গ সংযোগের ফলেই দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে ভাব সমগ্র বর্ণচ্ছটা লইয়াই আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছে। সহৃদয়তার জন্য যেমন ভাবাবেগের অভাব ঘটে নাই, তেমনি প্রকাশ-বৈভবের জন্য কোন ভাবই—যত সূক্ষ্ম যত জটিলই তাহা হউক—অপ্রকাশিত থাকে নাই। গিরিশচন্দ্রের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের পার্থক্য—প্রকাশ-ভঙ্গিমার এবং প্রকাশ-সূক্ষ্মতার পার্থক্য—ভাবানু-ভূতির সূক্ষ্মগ্রাহিতার পার্থক্য—চরিত্র-কল্পনায় মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার এবং বিশ্লেষণধর্ম্মী বুদ্ধির পার্থক্য। ক্ষীরোদপ্রসাদের সহিতও দ্বিজেন্দ্র-লালের বড় পার্থক্য এইখানেই।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল

ক্ষীরোদপ্রসাদ ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার আওতায় মানুষ; ১৮৬৩ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করিলেও, ইংরেজীর পূর্ণ প্রভাবের মধ্যে বর্দ্ধিত; কিন্তু

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের প্রকাশ ভঙ্গিমা ও সূক্ষ্মতা ভালভাবে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হন নাই। ইংরেজী সাহিত্যের ভাব-বিস্তার ও প্রকাশ-বৈচিত্র্যের চাহিদা মিটাইবার পূর্ণ শক্তি তাঁহার ছিল না। অবশ্য দুই একটি ক্ষেত্রে যে তাঁহার মধ্যে ভাব-বিস্তার ও প্রকাশ-বৈচিত্র্য সন্তোষজনক চমৎকারিতার মাত্রায় না পৌঁছিয়াছে এমন নহে। বিশেষতঃ শেষ বয়সের দুই একটি রচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয়ই দিয়াছেন; কিন্তু উহা, সমগ্র রচনার তুলনায়, ব্যতিক্রমের নিদর্শনই হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রকাশ ব্যাপারে গতানুগতিকতার গণ্ডীর বাহিরে গিয়াছেন এবং দুই একটি ক্ষেত্রে শক্তিরও পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তবু যেন তিনি আড়ষ্টতা এড়াইতে পারেন নাই—সে সব ক্ষেত্রেও সাবলীলতার অভাব বোধ না করিয়া পারা যায় না। এই কারণেই অধ্যাপক ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"কয়েকটি নাটকে দ্বিজেন্দ্র-লালের প্রভাবে পড়িয়া ক্ষীরোদচন্দ্র সংলাপের ঔচিত্যের ব্যতিক্রম করিয়াছেন। তবে ক্ষীরোদচন্দ্রের ভাষা কুত্রাপি বিজাতীয় হয় নাই"। মনে হয় আলমগীর নাটকের ভাষার বাঁধুনি ও বৈচিত্র্য দেখিয়াই ডাঃ সেন উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। এ কথা সত্য যে, আলমগীর নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রকাশভঙ্গিমার এবং প্রকাশশক্তির আনন্দদায়ক ও সন্তোষজনক পরিচয় দিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর ভাব ও ভাষার উপর অধিকারের উল্লেখযোগ্য পরিচয় এই নাটকখানিতেই পাওয়া যায়। উক্ত রূপ ভাব ও ভাষা বিজাতীয়তার লক্ষণ নহে,—নূতন মানসিক গঠনের লক্ষণ—ভাব ও প্রকাশের রাজ্যে নবজাতীয়তার লক্ষণ। যাহা হউক, ক্ষীরোদপ্রসাদের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের পার্থক্য

—এক কথায় সহৃদয়তার পার্থক্য, বিশ্লেষণ-শক্তির পার্থক্য—ভাব-বিস্তারের এবং ভাব-প্রকাশের পার্থক্য। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য যেখানে "কাহিনী-রস" (শ্রীসুকুমার সেন), দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের বৈশিষ্ট্য সেখানে চরিত্র-সৃষ্টি—ভাব-বিন্যাসের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য, বিশ্লেষণের এবং প্রকাশের চমৎকারিত্ব।

ক্ষীরোদপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য

এতক্ষণের আলোচনার পর, ক্ষীরোদপ্রসাদের ব্যক্তি-মানসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই ভাবে দেখানো যাইতে পারে :—

(১) অলৌকিক রহস্যে বা ঘটনায় বিশ্বাসপ্রবণতা—

ফলেঃ (ক) রোমাঞ্চকর বা আকস্মিক ঘটনার প্রতি ঝোঁক,
(খ) কৌতূহল-প্রধান কাহিনী-কল্পনার দিকে মনোযোগ, (আরব্য-পারস্যের উপকথা নির্ব্বাচনের মূলে এই প্রবণতা),
(গ) দৈবী লীলার মাহাত্ম্যকে প্রাধান্য দেওয়ার ঝোঁক,
(ঘ) সঙ্গতি ও পরিমিতি বোধের দৈন্য।

(২) সহৃদয়তা বা সমবেদনশীলতার দৈন্য—

ফলেঃ (ক) চরিত্রে প্রায় ক্ষেত্রে অনুভাব-দৈন্য,
(খ) চরিত্রে জড়তা ও কৃত্রিমতা।

(৩) বিশ্লেষণী শক্তির দৈন্য—

ফলে : (ক) চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব, অস্পষ্টতা ও অগভীরতা,
(খ) চরিত্রে জটিলতার অভাব,
(গ) ভাব-বিস্তারের অভাব।

(৪) ভাব-ধারণায় এবং প্রকাশ-রীতিতে প্রায় গতানুগতিক—

ফলে : "নিওক্লাসিক" (Nec-Classic).

ক্ষীরোদপ্রসাদের সাহিত্যিক পরিবেশ

এখন এইরূপ 'ব্যক্তি-মানস'-সম্পন্ন ক্ষীরোদপ্রসাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পরিচয় লওয়া যাক। ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্য-সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। বাঙলা সাহিত্য-ক্ষেত্রের নানা অংশ তখন শস্য-শ্যামল। বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন, দীনবন্ধু, মনোমোহন, হরলাল রায়, লক্ষ্মী নারায়ণ চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের দেয় চুকাইয়া দিয়া অন্তর্হিত; জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর রামকৃষ্ণ রায় প্রমুখ বহু কর্ম্মী তখন কবিকর্ম্মে নিযুক্ত। বিখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তখন (৭০ খানির মধ্যে) ৪৪ খানি রচনা শেষ করিয়াছেন—এবং উহাদের মধ্যে 'বিল্বমঙ্গল' 'প্রফুল্ল' 'হারানিধি' 'জনা' প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। উপন্যাসের ক্ষেত্রে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বারোখানি উপন্যাস অবদান করিয়াছেন, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৫-৯১) 'স্বর্ণলতা' 'হরিষে বিষাদ' এবং 'অদৃষ্ট' ও 'তিনটি গল্প' দিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, সঞ্জীবচন্দ্র (১৮৩৪-৮৯) 'কণ্ঠমালা' 'মাধবীলতা' 'জাল প্রতাপচাঁদ' কে প্রকাশ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯) 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), 'সংসার' (১৮৭৫), 'মাধবী-কঙ্কণ' (১৮৭৭), 'জীবন-প্রভাত' (১৮৭৮), 'জীবন-সন্ধ্যা' (১৮৭৯) এবং 'সমাজ' (১৮৮৭) তখন ভাণ্ডারে উঠিয়া গিয়াছে, স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) 'দীপনির্ব্বাণ' (১৮০৬), 'কোরকে কীট' (১৮৭৭), 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯), 'বিদ্রোহ' (১৮৯০), 'হুগলীর ইমামবাড়ী' (১৮৮৭), 'মিবাররাজ' (১৮৮৭) এবং 'ফুলের মালা' (১৮৯৪) ও 'স্নেহলতা' তখন শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং অন্যান্য অখ্যাত লেখকদের উপন্যাস-গল্পের দানও বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে বেশ পুরু হইয়া জমিয়াছে। মোটকথা ক্ষীরোদপ্রসাদ যখন সাহিত্য-রচনা

আরম্ভ করেন তখন বাঙলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে ফসলের বেশ পুঁজি জমিয়া গিয়াছিল; বিশেষতঃ নাটকের ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে "শৈল্পিকধরণ" এবং বিষয়-বৈচিত্র্য অনেক পরিমাণে আসিয়া গিয়াছিল। এই সময়, শৈল্পিক ধরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 'রোমান্টিকতা', 'কাল্পনিকতা'; যদিও বাস্তব-নিষ্ঠা কাহারও কাহারও মধ্যে যে একেবারে না ছিল এমন নহে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের সামাজিক পরিবেশ

এইরূপ সাংস্কৃতিক পরিবেশের পাশেই ছিল—সামাজিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য—জাতীয়তা-চেতনার উন্মেষ, স্বাধীনতা-কামনার অভিপ্রকাশ—হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে জাতি হিসাবে এক হইয়া দাঁড়াইবার উদ্দীপনা। "দেশ শনৈঃ শনৈঃ একজাতীয়তা ও ভারতীয়তার দিকে আগাইয়া চলে" ('ভারতের মুক্তি সংগ্রাম')। 'ভারতসভা' (প্রতিষ্ঠিত ১৮৭৬, ২৬শে জুলাই) চতুর্ব্বিধ উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া—(১) জনমত গঠন, (২) রাজনীতিক আশা আকাঙ্খা পূরণকল্পে বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতির মধ্যে ঐক্যের উন্মেষ, (৩) হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন এবং সমসাময়িক আন্দোলনের সঙ্গে সাধারণের সংযোগ সাধন কার্য্যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র ভারতবর্ষে চারণ কবির মত বিচরণ করিয়া ভারতবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে প্রাণ-মন অর্পণ করিয়াছিলেন এবং এই চেষ্টাই ১৮৮৫ খ্রীঃ 'কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠানরূপে সংহতভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। উনবিংশ শতকের শেষ দশকে নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে এবং ঐ সকল ঘটনা ভারতবাসীকে আত্মস্থ ও উদ্বুদ্ধ হইবার শক্তিমান প্রেরণা যোগাইল—স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বধর্ম্ম সম্মেলনে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া শুধু ধর্ম্মেরই জয়ধ্বজা উড়াইলেন

না, পরাধীন ভারতের মর্য্যাদাকেও যেন উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিলেন—জাতির লুপ্ত সংবিৎ ফিরাইয়া আনিলেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক জাতিকে স্বাভিমুখী ও স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে 'গণপতি উৎসব' এবং ১৮৯৫ সালে 'শিবাজী উৎসব' প্রবর্ত্তন করিয়া শুধু মহারাষ্ট্রের চেতনাতেই ঐক্যবুদ্ধি সঞ্চার করেন নাই, অন্যান্য প্রদেশেও বীরপূজার প্রেরণা জাগাইয়া তুলেন (প্রতাপ-আদিত্য প্রভৃতি নাটকের জন্মের মূলে এই প্রেরণার প্রভাব লক্ষণীয়); তারপর, ১৯০৩ খ্রীঃ ৺ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "ডন সোসাইটি" 'ডন' পত্রিকার মারফৎ দেশজ শিল্পদ্রব্য ব্যবহারের জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকেন আর এই সময়েই ব্যারিস্টার ৺ প্রমথনাথ মিত্রের উৎসাহে আত্মরক্ষা ও শক্তিচর্চ্চার উদ্দেশ্যে "অনুশীলন সমিতি" গঠিত হয়।

ইহার পর ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই, ভারতসচিব বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব মঞ্জুর করেন এবং দেশবাসী রুদ্ধ আক্রোশে গুমরিয়া উঠে। কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে ও ব্রতকথায় বাঙালীর মর্ম্মকথা ব্যক্ত হইতে থাকে—জাতির সর্ব্বদেহে তীব্র চেতনা সঞ্চারিত হয়। এই তীব্র জাতীয়তাবোধের সহিত কংগ্রেস সমান তালে পা রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই এবং পারে নাই বলিয়াই এই সন্ধিক্ষণে কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে—বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, তিলক, মুঞ্জে এবং লালা লাজপৎ রায় রফা-পন্থায় বিশ্বাস অটুট রাখিতে পারেন নাই। ভারতীয় রাজনীতিতে দুই দলের মধ্যবর্ত্তী আর এক দলের আবির্ভাব ঘটিল—ইহারা অস্ত্রবলে বিশ্বাসী সাগ্নিক বিপ্লবী দল। ১৮৯৪ সালে পুণায় সর্ব্বপ্রথম ইহাদের দলের বা সংগঠনের সূচনা দেখা যায়। এই সঙ্ঘের সদস্যরা সর্ব্বপ্রথম যে সন্ত্রাসবাদী পন্থা অবলম্বন করেন তাহাই বাঙলার সন্ত্রাসবাদে চরম পরিণতি লাভ করে। এই দলের মধ্যে শক্তিসাধনার যে একাগ্র কামনা জাগিয়াছিল, তাহা

অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল প্রভৃতির কর্ম্মসাধনায় এবং বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত "বন্দেমাতরম্", ব্রহ্মবান্ধব সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' এবং ভূপেন্দ্র-নাথ দত্ত সম্পাদিত 'যুগান্তর'-এর প্রচারে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। —জাতিকে শক্তিমন্ত্রে, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিল। (এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতাপ-আদিত্য নাটকের গোবিন্দদাসের নির্ব্বাসন এবং বিজয়া এবং চণ্ডীবর চরিত্র স্থাপন করিলে কবি কল্পনার উৎস অতি স্পষ্টভাবেই দেখা যায়)। ইহার পরেই আরম্ভ হইল সরকারের দমননীতি—এবং কংগ্রেসের পাল্টা নীতি-সংগ্রাম। একদিকে এইরূপ রাজনৈতিক আবহাওয়ার প্রভাব—অন্যদিকে সমাজের আত্মশুদ্ধির ও আত্মপ্রস্তুতির সাধনা—জাতীয় দুর্ব্বলতাগুলি পরিবর্জ্জনের সঙ্কল্প। অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন—হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—এই সময়ে জাতির মহতী চেষ্টার অন্যতম বলিয়া গণ্য। নারীশক্তির পুনরুদ্বোধনও যেন অবশ্য করণীয় বিষয়রূপে সম্মুখে উপস্থিত এবং আরো নানারূপ সামাজিক সমস্যা সমাধানের দাবী লইয়া পরিবেষ্টনীর মধ্যে সমাসীন।

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ উল্লিখিত (অবশ্য খুব সামান্য রূপে) সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া কবিকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। সেই হিসাবে তাঁহার কবি-কল্পনার বিশেষ উপাদান ও বৈশিষ্ট্য এই পরিবেশ হইতেই তাঁহার ব্যক্তিমানস কর্তৃক বিশেষতঃ সংগৃহীত ও সমীকৃত ও অভিস্ফুজিত। ক্ষীরোদপ্রসাদের বিশিষ্ট ব্যক্তি-মানস এবং পরিবেষ্টনীর প্রকৃতি সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার রচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, রচনার প্রেরণার উপাদানের ও বৈশিষ্ট্যের যথার্থ সন্ধান পাওয়া যাইবে। দেখা যাইবে যে কোনখানির রচনায় রঙ্গমঞ্চের চাহিদা, কোনখানির রচনায় যুগ-প্রেরণা বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে। কিন্তু নানারূপ চাহিদায় নাট্যকার বিষয় নির্ব্বাচনে

প্রবৃত্ত হইলেও বিষয়ের অঙ্গ-বিন্যাসে এবং প্রাণ-সঞ্চারে ব্যক্তি-মানসের প্রবণতার বশেই চলিয়াছেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনা ও রচনাকাল

রচনা	বিষয়-বস্তু	রচনা বা অভিনয় কাল
১। ফুলশয্যা	(কল্পিত ইতিহাস কাহিনী)	১৮৯৫
২। প্রেমাঞ্জলি	(পৌরাণিক কাহিনী)	১৮৯৬
৩। আলিবাবা	(আরব্যোপন্যাসের কাহিনী)	১৮৯৭
৪। কুমারী	(কল্পিত কাহিনী)	১৮৯৮
৫। প্রমোদরঞ্জন		১৮৯৮
৬। জুলিয়া		১৮৯৯
৭। বভ্রুবাহন		১৮৯৯
৮। দক্ষিণা		১৯০১
৯। সপ্তম-প্রতিমা		
১০। সাবিত্রী		১৯০২
১১। বেদৌরা		
১২। রঘুবীর		
১৩। প্রতাপ-আদিত্য	(ঐতিহাসিক কাহিনী)	১৯০৩
১৪। বৃন্দাবন বিলাস		
১৫। রঞ্জাবতী	(ধর্ম্মমঙ্গল কাহিনী)	১৯০৪
১৬। নারায়ণী		১৮০৫
১৭। পদ্মিনী		১৮০৫

রচনা	বিষয়-বস্তু	রচনা বা অভিনয় কাল
১৮। উলূপী		
১৯। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত		১৯০৬
২০। রক্ষ ও রমণী		
২১। দাদা ও দিদি		১৯০৭
২২। চাঁদবিবি		
২৩। নন্দকুমার		১৯০৭
২৪। আলাদিন		
২৫। অশোক	(ঐতিহাসিক)	
২৬। দৌলতে দুনিয়া		
২৭। বরুণা		১৯০৮
২৮। ভূতের বেগার		
২৯। বাসন্তী		
৩০। পলিন		১৯১০
৩১। বাঙ্গালার মসনদ		১৯১০
৩২। খাঁজাহান		১৯১২
৩৩। মিডিয়া		১৯১২
৩৪। ভীষ্ম		
৩৫। নিয়তি		১৯১৩
৩৬। রূপের ডালি		
৩৭। আহেরিয়া		১৯১৪
৩৮। রত্নেশ্বরের মন্দিরে		১৯১৫
৩৯। রামানুজ		১৯১৬
৪০। বঙ্গে রাঠোর		১৯১৭

রচনা	বিষয়-বস্তু	রচনা বা অভিনয় কাল
৪১। কিন্নরী		১৯১৮
৪২। আলমগীর		১৯২১
৪৩। মন্দাকিনী		১৯২১
৪৪। বিদূরথ		১৯২২-২৩
৪৫। গোলকুণ্ডা		১৯২৩-২৪
৪৬। নরনারায়ণ	(পৌরাণিক)	১৯২৬

ক্ষীরোদপ্রসাদের গুণাগুণ

ক্ষীরোদপ্রসাদ আর যাহাই করুন, বাঙালা নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে যে কার্পণ্য করেন নাই—তালিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝা যায়। নাটকগুলির শিল্পগত গুণ সন্তোষজনক হইয়াছে কি না এ বিষয়ে মতান্তরের সম্ভাবনা থাকিলেও যে একটী বিষয়ে কোন বিসংবাদ পাওয়া যাইবে না তাহা এই যে, ক্ষীরোদপ্রসাদ নানা বিচিত্র বিষয় লইয়া নাটক রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার নাটকের কয়েকখানি আজও রঙ্গমঞ্চের স্বত্বাধিকারীদের বেশ অর্থ যোগাইয়া থাকে—বাঙালী নাট্যামোদীদের আজও আকর্ষণ করিয়া থাকে।

বাস্তবিক, ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনার শৈল্পিক মহিমা যাহাই থাকুক, রচনার ঐতিহাসিক এবং ঔপযৌগিক মূল্য স্বীকার করিতেই হইবে। স্বীকার করিতে হইবেই যে ক্ষীরোদপ্রসাদ শব্দশক্তির সমাবেশে যে "রচনা-মূর্ত্তি" গড়িয়াছেন তাহার সঞ্চারণ-শক্তি (pcwer cf communication) একেবারে অপর্য্যাপ্ত নহে। নাট্যকার তাঁহার রচনা-মাধ্যমে উদীয়মান জাতীয়তার চেতনাকে, হিন্দু-মুসলমানের

মিলনের মন্ত্রকে জাতির হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে সক্রিয় সহযোগিতা করিয়াছিলেন—গীতিনাটকের কল্পনা-কুহকে ও আনন্দরসে তিনি বাঙালীচিত্তকে যেমন উৎফুল্ল করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিক এবং কাল্পনিক নাটকের সাহায্যে জাতিকে শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'প্রতাপ-আদিত্য' নাটকখানি বাঙালীর বা ভারতবাসীর পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিতে ও প্রেরণায় পরিপূর্ণ ছিল বলিয়াই একদিন প্রতাপ-আদিত্যের অভিনয়ে সমস্ত বাঙলা আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল—এমন কি, সেই কারণে রাজপুরুষরাও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৯০১ খ্রীঃ অভিনীত 'সীতারাম' নাটকে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কামনা প্রথম আভাষিত হইলেও, এ কথা বলিতেই হইবে যে প্রতাপাদিত্য নাটকেই প্রথমে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কামনা উদ্‌ঘোষিত হয় এবং জাতীয় দুর্ব্বলতার প্রতি বিশ্লেষণী আলোক নিক্ষিপ্ত হয়। যুগোপযোগী ভাবাদর্শের সমাবেশ ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকগুলির অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ। অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন, নারীজাগরণ, ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ, ধর্ম্মের পুনরুদ্বোধন—এই সকল নানা সামাজিক চাহিদার পূরণে নাট্যকার সাড়া দিয়াছিলেন।

আর একটী বিষয়েও ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রশংসা দাবী করিতে পারেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিষয় নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রটীকে নতুন নতুন দিকে প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আরব্য-পারস্যের কাহিনী অবলম্বনে গীতি-নাট্য রচনা করার তিনি পথপ্রদর্শক না হইলেও তাঁহার 'আলিবাবা' প্রভৃতি গীতি-নাট্য আরব্য-পারস্য কাহিনীকে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। ঐতিহাসিক পরিবেশে কাল্পনিক কাহিনী এবং ধর্মমঙ্গল কাহিনী প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ বিষয়বস্তুতে বেশ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মিডিয়ায় কৌতূহলকর কাহিনী পরিকল্পনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ যথেষ্ট

কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এবং এই বৈশিষ্ট্য প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। (ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যরচনার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে কাহিনীর মনোহারিত্ব বা প্লটের গল্পরস—সু. সেন।)

তৃতীয়তঃ এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে ক্ষীরোদপ্রসাদ ভাষায় ও চরিত্র-চিত্রণে দুই একটী ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় ক্ষেত্রেই গতানুগতিকতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তবে বিংশশতাব্দীর প্রবণতার চাপে নাট্যকার ভাষায় এবং চরিত্রধারণায় নূতন রীতি একেবারে অবলম্বন না করিয়া পারেন নাই। উল্লিখিত দুইটী ব্যাপারে নাট্যকার প্রায় ক্ষেত্রেই 'ক্লাসিক', তবে কয়েক ক্ষেত্রে "নিও ক্লাসিক" হইয়াছেন। শেষ বয়সের রচনায়—বিশেষতঃ আলমগীর নাটকখানিতে ক্ষীরোদপ্রসাদ ভাষায় এবং চরিত্রধারণায় নতুন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—বিংশশতাব্দীর ভাবিক পরিবেশের সহিত সজ্ঞানে অভিযোজন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমালোচক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় ক্ষীরোদপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে যে যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন উহাদের মধ্যে ভাষার উপর অনন্যসাধারণ অধিকার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে এবং চরিত্রসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যও ধরা হইয়াছে। (শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের মতে ক্ষীরোদ প্রসাদের বৈশিষ্ট্য—(ক) নানা নূতন ধারার প্রবর্ত্তন, (খ) অবান্তর প্রেমকাহিনীর অভাব, (গ) ভাষার উপর অনন্যসাধারণ অধিকার, (ঘ) ভাবসম্পদের প্রাচুর্য্য, (ঙ) সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টা, (চ) পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্র সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসুর সহিত অন্যান্য বিষয়ে একমত হইতে বিশেষ কুণ্ঠা না থাকিলেও "ভাষার অনন্যসাধারণ অধিকার" বিষয়ে একমত হইতে অনেকেই কুণ্ঠা বোধ করিবেন। কারণ তাঁহার সমসাময়িক স্রষ্টাদের ভাষার সহিত, প্রকাশশক্তির সহিত তাঁহার

শক্তির তুলনামূলক আলোচনা করিলে শ্রীযুক্ত বসুর সহিত একমত হইয়া কিছুতেই বলা চলে না যে ক্ষীরোদপ্রসাদের ভাষা (উৎকর্ষের দিকে) অনন্যসাধারণ। দ্বিতীয়তঃ চরিত্র-সৃষ্টি ব্যাপারেও তাঁহার নিপুণতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়া উঠে নাই—তাঁহার চরিত্রগুলির মনে না আছে সুগভীর আলোড়ন, ধারণা-প্রেরণায় না আছে মনস্তত্ত্বের শক্ত বাঁধুনি। মোটকথা চরিত্র-সৃষ্টির চমৎকারিতা তাঁহার রচনায় খুবই কম পাওয়া যায়।

ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্যকার—দৃশ্যকাব্যস্রষ্টা কবি। কবিত্ব দুর্লভ, সে দিক দিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ ন্যায়তঃ দুর্লভ শক্তির অধিকারী। কিন্তু "কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা"—এই সুদুর্লভ শক্তির অধিকারী তিনি নহেন।

'প্রতাপ-আদিত্য' নাটকের ঐতিহাসিকতা *

আদিশূরের সময়ে যে পাঁচজন কায়স্থ বঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিরাট গুহ একজন। তাঁহার অধস্তন নবম পর্য্যায়স্থ অশ্বপতি বা আশ গুহ বঙ্গজ কায়স্থগণের এক বীজপুরুষ। এই আশ গুহের এক প্রপৌত্রের নাম রামচন্দ্র। এই রামচন্দ্র অর্থভাগ্য অন্বেষণে বাকলা হইতে "সপ্তগ্রামে" আগমন করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রাম তখন গৌড়ের অধীন একটী শাসনকেন্দ্র। রাজস্ব সংগ্রহের ও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সেখানে বহু কর্ম্মচারী বাস করিতেন। অধিকন্তু সপ্তগ্রাম তখন একটী সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। অর্থোপার্জ্জনের বহু পন্থা মিলিতে পারে—এই আশায় রামচন্দ্র সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন এবং শ্রীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে আশ্রয় ও কালক্রমে তাঁহার কন্যার পাণিও গ্রহণ করিলেন। চাকরী লাভেও বিলম্ব ঘটিল না। প্রথমে "মুহুরী" পদে পা দিয়া দাঁড়াইয়া পরে "নিয়োগী" পদে সমাসীন হইয়া বসিলেন। এই সময়ে হুসেন শাহ গৌড়েশ্বর।

সপ্তগ্রামে আসিবার পূর্ব্বে রামচন্দ্র ষষ্ঠীধর বসুর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সেই পত্নীর গর্ভে ভবানন্দ, গুণানন্দ এবং শিবানন্দ নামে তিনটী পুত্রও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহারাও ক্রমে সপ্তগ্রামে উপনীত যথাসময়ে কার্য্যে নিযুক্ত এবং পরিণয়পাশেও আবদ্ধ হইলেন। ভবানন্দ প্রভৃতি তিন ভ্রাতাই কালক্রমে পিতৃপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। যে পুত্রটী ভবানন্দের বংশধর তাঁহার নাম শ্রীহরি—ইতিহাসে যিনি "বিক্রমাদিত্য", গুণানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হইল জানকীবল্লভ—

* যশোহর-খুলনার ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত।

ইতিহাসে যিনি "বসন্ত রায়", আর শিবানন্দের পুত্রদের নাম যথাক্রমে —হরিদাস, গোপালদাস ও বিষ্ণুদাস।

এই শিবানন্দের সহিত সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তার বিশেষ একটী কারণে সাংঘাতিক মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। কারণটী এই—শের শাহের অকর্ম্মণ্য বংশধর আদিল শাহ যখন দিল্লীর তক্তে উপবিষ্ট, বঙ্গের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ সূর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া মহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করিয়া বসিলেন; এদিকে সপ্তগ্রামের শাসন-কর্ত্তার মধ্যেও স্বাধীনতা ঘোষণার বাসনা প্রবল আকার ধারণ করিল। শিবানন্দ কর্ত্তার ইচ্ছায় সায় দিতে পারেন নাই এবং পারেন নাই বলিয়াই তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হইল (১৫৫৪)।

পয়ষট্টি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ রামচন্দ্র পুত্র ভবানন্দকে সঙ্গে লইয়া গৌড়ে উপস্থিত এবং মহম্মদ শাহের শরণাপন্ন হইলেন। মহম্মদ শাহ সন্তুষ্টচিত্তে রামচন্দ্রকে ও তাঁহার পুত্রদের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ফলে রামচন্দ্র পরিবারবর্গকে গৌড়ে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই গৌড়ের মায়া ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন।

ওদিকে গৌড়েশ্বর মহম্মদ শাহ, শের শাহের অনুকরণে দিল্লীশ্বর হইবার বাসনায় আগ্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়া "ছাপরা-মৌ"-এর যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৫৫৫)। অল্পদিনের মধ্যেই আকবর সেনাপতি বৈরাম খাঁয়ের সহিত অগ্রসর হইয়া পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে দিল্লীশ্বর আদিল শাহের সেনাপতি হিমুকে পরাজিত ও নিহত করিয়া রাজতক্ত কাড়িয়া লইলেন (১৫৫৬)। অগত্যা আদিল পলায়ন করিলেন—এবং করিলেন পূর্বমুখে; কিন্তু মুখ ও মান তো থাকিলই না, প্রাণটীও রক্ষা করিতে পারিলেন না। পর বৎসর গৌড়েশ্বর বাহাদুর শাহ এবং মগধের শাসনকর্ত্তা সুলেমান কররাণী মুঙ্গেরের যুদ্ধে

আদিলকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। শত্রুশূন্য বাহাদুর শাহ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া কয়েক বৎসর সুশাসনই করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারই রাজদপ্তরে কার্য্যদক্ষতা দেখাইয়া ভবানন্দ প্রভৃতি মজুমদার উপাধি লাভ করেন। বাহাদুর শাহ ১৫৬০ খ্রীঃ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলেন।

বাহাদুর শাহের পর তাঁহার ভ্রাতা জেলালুদ্দিন প্রায় তিন বৎসর, জেলালুদ্দিনের শিশুপুত্র সাত মাস এবং এই শিশুর হত্যাকারী গিয়াসুদ্দিন এগার মাস গৌড়ে রাজত্ব করিবার পরে কররাণী বংশীয় পাঠানবীর তাজ খাঁ ১৫৬৩ খ্রীঃ রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু অচিরে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তদীয় ভ্রাতা সুলেমান রাজতক্তে অধিষ্ঠিত হইলেন।

সুলেমানের অধীনে ভবানন্দ হইলেন মন্ত্রী আর শিবানন্দ হইলেন কানুনগো দপ্তরের অধ্যক্ষ। এই সময়ে শ্রীহরি (বিক্রমাদিত্য) এবং জানকীবল্লভ (বসন্ত রায়) উভয়েই উদীয়মান যুবক। সুলেমানের পুত্র বয়াজিদ ও দায়ুদের সহিত উহাদের বন্ধুত্ব বয়সের সমতায় এবং বসবাসের সান্নিধ্যে ক্রমেই দৃঢ়তর হইয়া উঠিল।

প্রতাপাদিত্যের জন্ম

এই সময়েই ভবানন্দ প্রভৃতি যখন গৌড়ে অবস্থান করিতেছিলেন, ১৫৬০ খ্রীঃ অথবা ইহার অব্যবহিত পরে, শ্রীহরির অতি অল্প বয়সেই উগ্রকণ্ঠ বসু মহাশয়ের কন্যার গর্ভে প্রতাপ জন্মগ্রহণ করেন। *

* জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে নানা মত :—(ক) রামরাম বসুর মতে—যশোহর আসিলে জন্ম, অতএব ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে জন্ম হইতে পারে না। (খ) সত্যচরণ শাস্ত্রীর মতে—১৫৬৮ খ্রীঃ জন্ম এবং ১৬০৬ খ্রীঃ মানসিংহের হস্তে শেষ পতন ও মৃত্যু। প্রতাপের পরমায়ু ৩৯ বৎসর। (গ) "বিশ্বকোষ" মতে—১৫৬৪ খ্রীঃ জন্ম—৪২ বৎসর জীবৎকাল। (ঘ) "বঙ্গের বীর পুত্র" গ্রন্থে যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের মত—১৫৬০ খ্রীঃ জন্ম। (ঙ) নিখিলনাথ রায়—১৫৬১ খ্রীঃ।

ওদিকে সুলেমানের মৃত্যুর পরে দায়ূদ সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন (১৫৭৩) এবং পুরাতন বন্ধু ও বয়স্ত শ্রীহরিকে ও জানকী-বল্লভকে অমাত্যপদে বরণ করিলেন—অবশ্য যোগ্য এবং জমকালো উপাধিতে ভূষিত করিয়াই। শ্রীহরি হইলেন 'বিক্রমাদিত্য' আর জানকীবল্লভ হইলেন "বসন্ত রায়"। *

কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনার গতিবেগ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। দায়ূদ ক্ষমতামদে আত্মহারা হইয়া, শুধু উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে গা ভাসাইয়াই নিরস্ত থাকিলেন না, উদ্ধত হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন, ফলে মোগল-পাঠানের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

'যশোহর রাজ্য' প্রতিষ্ঠা

মোগল-পাঠান সংঘর্ষের ঝড়ো মেঘ আকাশে দেখা দেওয়ার অনেক আগে, পাকা-মাথা ভবানন্দ বুদ্ধিটুকু কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুলেমানের মৃত্যুর পরে গৃহবিবাদ বাধিতেই তিনি কাজ গুছাইবার ফাঁক খুঁজিতে লাগিলেন। দক্ষিণবঙ্গে যমুনার পূর্ব্ব পারে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী ভূভাগ চাঁদ খাঁ জায়গীর নামে চিহ্নিত ছিল; চাঁদ খাঁ নিঃসন্তান অবস্থায় মরিয়া বিক্রমাদিত্যের ভাগ্য ফিরাইয়া দিয়া গেলেন। ভবানন্দ বিক্রমাদিত্যকে দিয়া দায়ূদ খাঁর নিকট জায়গীরটী প্রার্থনা করাইলেন। দায়ূদ বয়স্তের প্রার্থনা পূর্ণ না করিয়া কি পারেন? ১৫৭৫ খ্রীঃ যশোহর রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল। ভবানন্দ সর্ব্বাপেক্ষা উদ্যমী ও কর্ম্মক্ষম বসন্ত রায়কে চাঁদ খাঁ জায়গীরে রাজ্য স্থাপন করিতে পাঠাইলেন। জঙ্গল কাটিয়া বসন্ত রায় নূতন রাজ্য পত্তন করিলেন।

* সম্ভবতঃ এই সময়েই শ্রীহরির পুত্রকেও 'আদিত্য'দের একজন করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মোগল-পাঠান সংঘর্ষ

এই সময়েই দায়ূদ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেই আকবরের সেনাপতি মুনেম খাঁ আসিয়া পাটনা অবরোধ করিলেন। শোণ নদের মোহনায় যুদ্ধ হইল। পরাজিত দায়ূদ পাটনা দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন (১৫৭৪)। তারপর এক সহস্র রণতরী লইয়া সম্রাট আকবর স্বয়ং পাটনায় উপস্থিত হইলেন। হাজিপুর দুর্গ আক্রান্ত হইল—মোগলরা যুদ্ধে জয়লাভ করিল। দায়ূদের আমীর ও ওমরাহবর্গ পলায়ন অথবা আত্মসমর্পণ—এই দুই দিক ছাড়া আর কোন দিকেই চিন্তার গতি ফিরাইতে পারিলেন না। দায়ূদ কিন্তু দুইটীর কোনটীকেই গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন না। তবে বুদ্ধিবল বড় বল। কতুল খাঁ দায়ূদকে মদ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া নৌকাপথে পলায়ন করিলেন।

বিক্রমাদিত্য দায়ূদের ধনসম্পত্তি নৌকায় বোঝাই করিয়া লইয়া পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন। দায়ূদ নিজের ভবিষ্যত স্পষ্ট অক্ষরে লিখিত দেখিয়া বিক্রমাদিত্যকে ধনরত্ন যশোরে লইয়া যাইতে নির্দ্দেশ দিলেন। ওদিকে আকবর পাটনা দুর্গ অধিকার করিলেন এবং মুনেম খাঁকে বাঙ্গালার 'নবাব' নিযুক্ত করিয়া আগ্রায় ফিরিয়া গেলেন।

দায়ূদ পলাইয়া তাণ্ডায় গেলেন। কিন্তু মুনেম খাঁকে নিকটবর্তী দেখিয়াই উড়িষ্যার দিকে পলায়ন করিলেন। টোডরমল্ল দায়ূদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে দায়ূদের পুত্র জুনেদ খাঁ উড়িষ্যার পাঠান বীরগণের সহযোগিতায় টোডরমল্লকে আক্রমণ এবং পরাজিত করিলেন। কিন্তু মুনেম খাঁ আসিয়া পড়ায় যুদ্ধের গতি ফিরিয়া গেল। মোগলমারী নামক স্থানে গুজর খাঁ মুনেম খাঁকে একবার

পরাজিত করিলেও, শেষ পর্য্যন্ত নিহত হইলেন। দায়ূদ অগত্যা পলায়ন করিলেন। কিন্তু টোডরমল্ল সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনুসরণ করায়, দায়ূদ বাধ্য হইয়া বশ্যতা স্বীকার ও সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা পূর্ণ হইল। দায়ূদকে উড়িষ্যার শাসনভার দেওয়া হইল। মুনেম খাঁ বঙ্গ-বিহারের শাসনকর্ত্তা হইয়া গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিলেন।

এই সময়ে গৌড়ে ভীষণ মহামারী দেখা দিয়াছিল। মুনেম খাঁ এত যুদ্ধে জয়ী হইলেও ব্যাধির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রাণটী ত্যাগ করিলেন। আকবর হুসেনকুলি খাঁকে বঙ্গেশ্বর করিয়া পাঠাইলেন। দায়ূদ অবসর পাইয়া আবার বিদ্রোহী হইলেন। প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও দায়ূদ পরাজয় ঠেকাইতে পারিলেন না, অবশেষে প্রাণও হারাইলেন। বিক্রমাদিত্য এবং বসন্তরায় প্রকৃত বন্ধুর মত এ পর্য্যন্ত দায়ূদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু দায়ূদের মৃত্যুর পরে তাঁহারা নিরুদ্দেশ হইলেন—অর্থাৎ ছদ্মবেশে থাকিতে বাধ্য হইলেন। প্রবাদ রটিয়া গেল—বিক্রমাদিত্য বসন্তরায় সন্ন্যাসী হইয়াছেন। টোডরমল্ল দায়ূদের নথিপত্র ঘাটিয়া দেখিলেন যে হিসাব-পত্র সমস্তই বিক্রমাদিত্য বসন্তরায়ের করায়ত্ত। সুতরাং তাঁহাদের সাহায্য অপরিহার্য্য। তিনি বিক্রমাদিত্যের সন্ধান করিতে লাগিলেন। বিক্রমাদিত্যও অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া টোডরমল্লের সহিত দেখা করিলেন এবং আনুগত্যের মাথাটী পাঠানের দিকে না দিয়া মোগলের দিকে নত করিয়া দিলেন (১৫৭৬)। টোডরমল্ল অকৃতজ্ঞ হন নাই; তিনিই চেষ্টা করিয়া যশোর রাজ্যের বাদশাহী সনদ আদায় করিয়া দিলেন; ১৫৭৭ খ্রীঃ বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহন করিলেন।

প্রতাপাদিত্যের বাল্যজীবন

১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে বা কিছুকাল পরে গৌড়ে বিক্রমাদিত্যের যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহার নামকরণ করা হইয়াছিল গোপীনাথ; পরবর্ত্তীকালে বৈশিষ্ট্যের ছাপ দিতেই গোপীনাথের নাম রাখা হইয়াছিল প্রতাপাদিত্য।

প্রতাপের কোষ্ঠীর ফল মোটেই ভাল ছিল না। পিতৃহত্যা-দোষ লইয়া তাঁহার জন্ম। পাঁচ দিন মাত্র বয়সেই—সূতিকা গৃহেই—মাতার মৃত্যু ঘটিল। বিক্রমাদিত্য পত্নীবিয়োগে মর্ম্মব্যথা না পাইলেন এমন নহে, কিন্তু পুত্র পিতৃঘাতী হইবে—কোষ্ঠীর এই ফল শুনিয়া দারুণ অশান্তি ও অস্বস্তির মধ্যে পড়িলেন। নব জাতকের প্রতি তাঁহার স্নেহ স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হইতে পারিল না। কিন্তু বসন্তরায় প্রতাপকে স্নেহতপ্ত বক্ষে ধারণ করিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নী সূতিকাগৃহেই প্রতাপের মায়ের স্থান পূর্ণ করিয়া বসিলেন।

অতি শিশুকালে প্রতাপ নাকি অত্যন্ত শান্ত ও নিরীহ ছিলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলতা এবং ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সময়ের প্রথানুসারে প্রতাপকে সংস্কৃত, ফারসী ও বাঙ্গালা শিখিতে দেওয়া হইল, কিন্তু শাস্ত্র অপেক্ষা শস্ত্রের প্রতি তাঁহার অধিকতর পক্ষপাত দেখা যাইতে লাগিল। বাল্যকালেই প্রতাপ মৃগয়া আরম্ভ করিলেন। এই সব ব্যাপারে শঙ্কর সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি দুরন্ত বালকের সাহচর্য্য ছিল অবিরাম ও অকুণ্ঠ। একদিন এমন একটী ঘটনা ঘটিল—প্রতাপের বাণে আহত হইয়া একটী পাখী ঘুরিতে ঘুরিতে বৃদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্যের সম্মুখেই আসিয়া পড়িল। এই ঘটনাটী যত তুচ্ছই হউক, বিক্রমাদিত্যকে প্রতাপের কোষ্ঠীর ফল স্মরণ করাইয়া খুবই চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। কথিত আছে—এইরূপ নানাপ্রকার ঘটনা

রাজার মধ্যে এত মাত্রায় বিরক্তি ও অস্থিরতা বাড়াইয়া দিয়াছিল যে তিনি পুত্রটীর বিনাশের কল্পনাকেও এক সময় মনে স্থান দিয়াছিলেন। তবে বসন্তরায়ের স্নেহালিঙ্গন এত দুর্ভেদ্য ছিল যে বিক্রমাদিত্য কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

প্রতাপের বিবাহ ও রাজ্যাধিকার

বিবাহ দিলে প্রতাপের মতিগতি ফিরিতে পারে এই আশায়, বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় উদ্যোগী হইয়া প্রতাপের বিবাহ দিলেন, * কিন্তু বিবাহের পরেও দুরন্তপনা কমিল না। তখন দুই ভাই আবার পরামর্শ করিলেন এবং স্থির করিলেন—প্রতাপকে আগ্রায় পাঠানো কর্ত্তব্য—রাজনীতির অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যেই প্রতাপ ১৫৭৮ খ্রীঃ আগ্রায় প্রেরিত হইলেন।

বসন্তরায়ের পত্র লইয়া প্রতাপ আগ্রা যাত্রা করিলেন। বসন্তরায়ের সহিত টোডরমল্লের পূর্ব্বেই খুব পরিচয় ঘটিয়াছিল, সুতরাং পত্রখানি তাঁহার কাছেই লেখা হইল। এই সময় টোডরমল্লের বিপুল সম্মান—বাদশাহ তাঁহাকে উজীর পদে উন্নীত করিয়া রাজা উপাধি দিয়াছিলেন (১৫৭৮)। বসন্তরায়ের পত্র পাইয়া টোডরমল্ল বাদশাহের সহিত প্রতাপের সাক্ষাৎকারের সুযোগ করিয়া দিলেন। বাদশাহ প্রতাপের বীরত্বব্যঞ্জক আকৃতি দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারিলেন না।

প্রতাপাদিত্যের আগ্রা গমনের কিছুকাল পূর্ব্বে ১৫৭৫ খ্রীঃ রাণা প্রতাপ হলদিঘাটের যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী ঘরে ঘরে মুখে মুখে উদ্গীত হইতেছিল। রাজধানী তখন

* ঘটক কারিকার মতে—তিন বিবাহঃ—(১) জগদানন্দ রায়ের কন্যা, (২) জিতমিত্র নাগের কন্যা "শরৎকুমারী"—ইনিই উদয়াদিত্যের কন্যা, (৩) গোপাল ঘোষের কন্যা।

প্রতাপের কীর্ত্তিকাহিনীতে মুখরিত। রাণাপ্রতাপের অটল সঙ্কল্প প্রাণপণ সাধনা বাঙ্গলার প্রতাপের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আগ্রার কার্য্য শেষ করিয়া প্রতাপ শঙ্কর সূর্য্যকান্তের সহিত তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং হিন্দু-বীর্য্যের প্রধান তীর্থ চিতোর দর্শন করিয়া আসিলেন। চিতোর দুর্গের অবস্থান ও নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া প্রতাপ শুধু বিস্মিতই হইলেন না, দুর্গ নির্ম্মাণের কৌশল ও প্রেরণাও লাভ করিলেন এবং স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনা এই সময় হইতেই মাথা তুলিতে চেষ্টা করিল।

প্রতাপ যশোর রাজ্যের অধিকার নিজের হস্তে লইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। সুযোগও মিলিয়া গেল। ১৫৮০ খ্রীঃ প্রারম্ভে বঙ্গ-বিহারে জায়গীরদারদিগের এক ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। টোডরমল্ল বিদ্রোহ দমনের জন্য বাঙ্গলায় প্রেরিত হইলেন এবং পরবর্ত্তী দুই বৎসরের জন্য বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। টোডরমল্লের অনুপস্থিতিকালে প্রতাপাদিত্য যশোর রাজ্য নিজ হস্তে লইবার জন্য কৌশল প্রয়োগ করিলেন। দুই তিন বারের খাজনা জমা না দিয়া বাদশাহকে জানাইলেন যে যশোরের শাসনকর্ত্তারা খাজনা আদায় করিতে সক্ষম নহেন,—সনন্দ তাঁহাকে দিলে তিনি বাকী খাজনা শোধ করিয়া দিবেন এবং চিরানুগত হইয়া থাকিবেন। বাদশাহ সম্মত হইলেন, প্রতাপ সনন্দ লাভ করিলেন।

১৫৮২ খ্রীঃ বাদশাহী লোক-লস্কর লইয়া প্রতাপ যশোর পৌছিলেন এবং অতর্কিতে যশোর দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন। এই অভাবিত ঘটনায় সকলেই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু বসন্তরায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর ও স্নেহময় ব্যবহারে বিদ্রোহী প্রতাপকে বশীভূত করিলেন। প্রতাপ গর্ব্বে ও সানন্দে রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

যশোরেশ্বরী আবিষ্কার ও রাজ্যাভিষেক

রাজা বিক্রমাদিত্য প্রতাপের ব্যবহারে মরমে মরিয়া গেলেন। বসন্তরায় তাঁহার অক্লান্ত সেবার এবং অকৃত্রিম ভক্তি ভালবাসার বিনিময়ে কেবলমাত্র বঞ্চনা ও কৃতঘ্নতা পাইবে—কিছুতেই তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজ্যকে তিনি দশ-আনা ছয়-আনা ভাগ করিলেন—প্রতাপের ভাগে পড়িল দশ-আনা, আর বসন্ত পাইলেন ছয়-আনা। কিন্তু এই বিভাগও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। বিক্রমাদিত্যের ভাগ্য ভাল—১৫৮৩ খ্রীঃ তিনি মরিয়া বাঁচিয়া গেলেন।

প্রতাপ ধূমঘাটে নূতন দুর্গ ও রাজধানী স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। বসন্তরায়ই অগ্রণী হইয়া সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন করিলেন; কমল খোজা দুর্গ নির্ম্মাণের তত্ত্বাবধান করিতে নিযুক্ত হইলেন। প্রবাদ আছে—এই তত্ত্বাবধান-কালে কমল খোজা জঙ্গলের মধ্যে গভীর রাত্রে অগ্নিশিখা দেখিতে পাইয়াছিলেন। জঙ্গল পরিষ্কৃত হইলে স্তূপীকৃত ইষ্টকাদির ভগ্নাবশেষের তলে যশোরেশ্বরী দেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইল। এই দেবীর আবিষ্কারের পরে প্রতাপের জীবন-স্রোত পরিবর্ত্তিত হইল। প্রতাপ পৈতৃক বৈষ্ণব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে শাক্ত হইয়া উঠিলেন। মায়ের প্রসাদী সুরা পান করিতে করিতে প্রতাপ যেন সুরাসক্ত হইয়া পড়িলেন।

১৫৮৭ অব্দে ধূমঘাট দুর্গ ও তৎসংলগ্ন আবাস-বাটী নির্ম্মিত হইলে প্রতাপ সপরিবারে তথায় স্থানান্তরিত হইলেন এবং বসন্তরায়ের উৎসাহে ও সুব্যবস্থাপনায় তাঁহার পুনরভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। এই উপলক্ষে বঙ্গদেশের সকল ভূঞা রাজগণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এবং স্বাধীনতা-রক্ষা করিবার উপায় সম্বন্ধে মত-বিনিময়ও করিয়াছিলেন।

প্রতাপের দুর্গ-সংস্থান ও সৈন্য-বিভাগ

রাজ্যাভিষেকের পর প্রতাপ নানা স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন : (১) যশোর দুর্গ, (২) ধূমঘাট দুর্গ, (৩) রায়গড় দুর্গ, (৪) কমলপুর দুর্গ, (৫) বেদকাশী দুর্গ, (৬) শিবসা দুর্গ, (৭) সালিখা দুর্গ, (৮) মাত্‌লা দুর্গ, (৯) আড়াই বাঁকীর দুর্গ, (১০) সাগর দ্বীপ দুর্গ, (১১) মণি দুর্গ, (১২) রায়মঙ্গল দুর্গ, (১৩) চাকসিরি দুর্গ।

প্রধান প্রধান সেনাপতি হইলেন সূর্য্যকান্ত, কমল খোজা, জামাল খাঁ, যুবরাজ উদয়াদিত্য এবং ফিরিঙ্গি রডা : (ক) ঢালী সৈন্যের অধ্যক্ষ হইলেন—মদন মল্ল, কালিদাস রায়, সবাই বাড়ুয্যে ; (খ) অশ্বারোহী সৈন্যের—প্রতাপসিংহ দত্ত ; (গ) তীরন্দাজ সৈন্যের—সুন্দর ও ধুলিয়ান বেগ ; (ঘ) গোলন্দাজ সৈন্যের—ফ্রানসিস্কো রডা ; (ঙ) নৌ-সৈন্যের —অগস্টাস্ পেড্রো ; (চ) রক্ষিসৈন্যের অধ্যক্ষ—বিজয়রাম ভঞ্জ ও রত্নেশ্বর ; (ছ) কুকি সৈন্যের—রঘু।

প্রতাপ ধূমঘাটে রাজত্ব আরম্ভ করিলে (১৫৮৭) বসন্তরায় রায়গড় দুর্গে পরিবারবর্গ স্থানান্তরিত করিলেন। কেবল উৎসবাদির সময়ে কখনও কখনও যশোরে আগমন করিতেন। এদিকে প্রতাপ শঙ্কর প্রভৃতির মন্ত্রণায় স্বাধীনতা ঘোষণার আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রতাপের হাবভাব দেখিয়া বসন্তরায় খুবই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। মোগলের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে অনিবার্য্য পরিণাম যাহা ঘটিবে, মানস চক্ষে তাহা দেখিতে পাইয়া প্রতাপের ইচ্ছাকে তিনি সমর্থন করিতে পারিলেন না। প্রতাপ কিন্তু খুল্লতাতের অনিচ্ছাকে শুভাকাঙ্খা রূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে এই ধারণাই প্রবেশ করিল যে খুল্লতাত তাঁহার অভ্যুদয়কে সরল মনে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না।

ওদিকে ১৫৯১ খ্রীঃ পাঠানগণ পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং হাম্বীর মল্লের রাজ্য আক্রমণও করিয়া বসিল। হাম্বীর মল্ল ছিলেন মোগলের অনুগত, প্রতাপ হাম্বীর মল্লের পক্ষে পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইতে বাধ্য হইলেন। যুদ্ধযাত্রাকালে তিনি খুল্লতাতের পদধূলি লইয়া উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৫৯৩ খ্রীঃ প্রতাপ যুদ্ধশেষে যশোরে প্রত্যাগত হইলেন এবং খুল্লতাতের জন্য 'গোবিন্দদেবের বিগ্রহ' লইয়া আসিলেন।

বসন্তরায়ের হত্যা

কিন্তু নিয়তিকে কে কবে বাধা দিতে পারিয়াছে! নিয়তির চক্রান্তে হিত বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। বসন্তরায়ের অযাচিত স্নেহ-ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইয়াও প্রতাপ বসন্তরায়কে সন্দেহের চোখে দেখিতে লাগিলেন। অবশ্য ইহার যে কোন কারণ ছিল না এমন নহে। প্রথমতঃ সঙ্গিগণের কুপরামর্শ বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছিল, পরে বসন্তরায়ের পুত্রদের জ্ঞাতি-বিদ্বেষের ফলে বীজ অঙ্কুরে পরিণত হইয়াছিল, এবং এই অঙ্কুর চাকসিরি পরগণার স্বত্বাধিকার-দ্বন্দ্বে পরিণত বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছিল। চাকসিরি পরগণা বসন্তরায়ের শ্বশুর কৃষ্ণরায় দত্ত মহাশয়ের সম্পত্তি, সেই কারণেই প্রতাপের রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইলেও উহা বসন্তরায়ের শ্যালকদের অধিকারে ছিল। অথচ পূর্ব্বদেশীয় শত্রুর অভিযানের কবল হইতে রাজ্যকে রক্ষা করিতে হইলে 'চাকসিরি'র উপর পূর্ণ অধিকার একান্ত অপরিহার্য্য। প্রতাপ মরিয়া হইয়া উহার দাবী করিলেন—কিন্তু বসন্তরায় চাকসিরি প্রত্যর্পণের কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না; কারণ তাঁহার পুত্রগণ ও শ্যালকেরা ভীষণ বিরোধী হইয়া পড়িলেন। এই কারণে প্রতাপের ক্ষোভ ও ক্রোধ সপ্তমে চড়িয়া গেল। চাকসিরি তাঁহার চাইই চাই।

সুযোগও জুটিয়া গেল। বসন্ত রায়ের পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত, ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রথমা পত্নীর অগ্রাধিকার থাকা সত্ত্বেও বসন্তরায় এই অনুষ্ঠানে জ্যেষ্ঠা পত্নীকে ধূমঘাট হইতে না আনাইয়া, গোবিন্দরায়ের মাতাকেই সহধর্ম্মিণীর অধিকার দিলেন। প্রথমা পত্নী প্রতাপকে মানুষ করেন এবং ধূমঘাটেই প্রতাপের কাছে থাকিতেন। ধূমঘাট হইতে কেবলমাত্র প্রতাপ নিমন্ত্রিত হইলেন। 'প্রতাপের মা' প্রতাপকে অপমানের কথা জানাইলেন, অবশ্য প্রতাপও বুঝিয়াছিলেন—প্রতাপের ক্ষোভের আগুনে বাতাস লাগিল।

প্রতাপ প্রস্তুত হইয়া এবং সশস্ত্র শরীররক্ষী দ্বারা পরিবৃত হইয়া শ্রাদ্ধদিনে রায়গড় দুর্গে প্রবেশ করিলেন। অতিরিক্ত মদ্যপান করায় চক্ষু তাঁহার রক্তবর্ণ—তারপর যোদ্ধৃবেশ। গোবিন্দরায় (বসন্তরায়ের পুত্র) অতিশয় আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। অতি আতঙ্কের ফলে গোবিন্দ বাক্যব্যয় না করিয়াই দোতালার বারান্দা হইতে প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া দুই দুইবার তীর নিক্ষেপ করিলেন।

তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইলে প্রতাপের মৃত্যু যত অনিবার্য ছিল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় গোবিন্দের মৃত্যু তত অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। প্রতাপ ক্ষিপ্ত হইয়া গোবিন্দকে শেষ করিয়া দিলেন। চারিদিকে হাহাকার উঠিয়া গেল। বসন্তরায় যেখানে শ্রাদ্ধে বসিয়াছিলেন সেখানে সংবাদ পৌঁছিতে তিনি অসহ্য ক্ষোভে অস্থির ও আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। অসীমসাহসী বীরযোদ্ধা 'বসন্ত রায়' বৃদ্ধ শরীরের মধ্যেই আবার জাগিয়া উঠিলেন! "গঙ্গাজল" (বসন্ত রায়ের তরবারির নাম) "গঙ্গাজল" বলিয়া তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন। প্রতাপ দেখিলেন "গঙ্গাজল" বসন্তরায়ের হস্তে পৌঁছিলে পরিণাম ভয়াবহ। ভীত-ত্রস্ত প্রতাপের বিচার বুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল। কৃতঘ্নতার

প্রতিমূর্ত্তির মত প্রতাপ খুল্লতাত বসন্তরায়কে হত্যা করিয়া বসিলেন। *

ঈশাখাঁ মছন্দরী, কন্দর্পনারায়ণ

সর্ব্বজনপ্রিয় উদার ও বীর বসন্তরায়ের হত্যায় চারিদিকে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। হিজলীর ঈশাখাঁ মছন্দরী বসন্তরায়ের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। বসন্তরায়ের জামাতা রূপবসু (কেহ কেহ বলেন বসন্তরায়ের ভ্রাতা বাসুদেব রায়ের জামাতা) কচুরায়কে লইয়া ঈশাখাঁর শরণাপন্ন হইলেন। প্রতাপাদিত্য পাঠানদিগের শক্তি সংগ্রহের সংবাদ শুনিয়া অবিলম্বে ঈশা খাঁকে শিক্ষা দিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। রায়গড় দুর্গে সৈন্য সমাবেশ করিলেন এবং বজবজ প্রভৃতি স্থানে সুসজ্জিত রণতরী প্রেরণ করিলেন। আয়োজন সম্পন্ন হইলে হিজলীর যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য স্বয়ং আগমন করিলেন,

* বসন্তরায়ের হত্যাকাল সম্বন্ধে মতভেদ :—(ক) সাধারণ মত এই যে চন্দ্রদ্বীপের রাজপুত্র রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপের কন্যার বিবাহকালে বসন্তরায় জীবিত ছিলেন। এই বিবাহ হয় ১৬০২ খ্রীঃ, অতএব বসন্ত রায়ের হত্যা ১৬০২ খ্রীঃ অথবা ইহার পরে হয়। (খ) ঘটককারিকার মতে—১৬০২ খ্রীঃ হত্যাকাল। (গ) সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে—খ্রীঃ ১৫৯৪-৯৫।

যুক্তি :—(১) জেসুইট পাদ্রীগণ ১৫৯৯ হইতে ১৬০৩ অব্দ পর্য্যন্ত এদেশে ছিলেন। বসন্তরায়ের বাক্যের উল্লেখ কোথায়ও নাই।

(২) রামরাম বসুর গ্রন্থ হইতে জানা যায়—বসন্তরায়ের হত্যার পরে তৎপুত্রগণ হিজলীর ঈশাখাঁ মছন্দরীর শরণাপন্ন হন। ঈশাখাঁর মৃত্যু ১৯১৫ খ্রীঃর পরে হয় নাই।

(৩) হত্যার পর কচুরায় দিল্লী যান, তখন তিনি অল্পবয়স্ক (১২ বৎসর কুলাচার্য্যগণের মতে), অথচ মানসিংহ যখন যুদ্ধার্থে আগমন করেন তখন কচুরায় মহাবীর, অর্থাৎ ২৩।২৪ বর্ষের কম নহে। মানসিংহের আগমনকাল—১৬০২-৩ অব্দ ধরিলে কচুরায়ের দিল্লী যাত্রাকাল ১৫৯৫ অব্দের পর হইতে পারে না।

তাঁহার সঙ্গে আসিলেন ফিরিঙ্গী রডা (একটী যুদ্ধে বন্দী হইয়া রডা কিছুকাল আগে প্রতাপের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন) এবং সুন্দর প্রভৃতি সেনাপতিবর্গ। ১৮ দিন যুদ্ধের পর ঈশাখাঁ পরাজিত ও নিহত হইলেন। হিজলীতে এবং সাগর দ্বীপে প্রতাপের নৌ-সেনার প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইল।

এদিকে পূর্ব্ববঙ্গের পাঠানগণ বাংলা আক্রমণ করিয়া বসিল। কন্দর্পনারায়ণকে প্রতাপ সাহায্য পাঠাইতে বিলম্ব করিলেন না, ফলে পাঠানগণ পরাজিত হইল এবং দেশও ত্যাগ করিল (১৫৯৬)।

১৫৯৬ খ্রীঃ কন্দর্পের মৃত্যু হয়, রামচন্দ্রের বয়স তখন ৬ বৎসর। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দের কথা—প্রতাপের কন্যা বিন্দুমতী (রোহিনীকুমার সেন মহাশয়ের মতে—বিমলা) দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন এবং কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্র তখন চতুর্দ্দশ বর্ষে। বিবাহের যোগ্য আয়োজন উভয় পক্ষেই হইল, কিন্তু রামাই ঢুঙ্গীর মাত্রা-ছাড়ানো একটী রসিকতা উৎসবের সমস্ত আলোক নিবাইয়া দিল। রামচন্দ্র কোন রকমে প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেলেন।

প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা ঘোষণা

প্রতাপাদিত্য শুধু রাজ্য শাসন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিলেন না, রাজ্য বিস্তারেও মনোযোগ দিলেন। হালিসহর, কাঁচড়াপাড়া, জগদ্দল প্রভৃতি স্থান হুগলীর মোগল ফৌজদারের অধিকার হইতে বলপ্রয়োগে দখল করিয়া লইলেন। কথিত আছে নদীয়া জিলার কতক স্থানও প্রতাপাদিত্যের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এই সময়ে সপ্তগ্রামের ফৌজদারের সহিত বিবাদ বাধিয়া গিয়াছিল এবং রাজমহলের জনৈক কর্ম্মচারী শের খাঁর সহিতও তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। শের খাঁ

শঙ্করকে বন্দী করিয়াছিলেন, কিন্তু বন্দী করিয়া রাখিতে পারেন নাই। ক্রোধান্ধ শের খাঁ প্রতাপের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু প্রতাপের আক্রমণে সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া রাজমহলে ফিরিয়া গেল। প্রতাপ ১৫৯৯ খ্রীঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন।

প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা-ঘোষণার এবং দৌর্জ্জন্যের সংবাদ শুনিয়া বাদশাহ আকবর মানসিংহের উপর প্রতাপকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য আদেশ দিলেন। মানসিংহ বাইশজন সেনাপতিসহ মহাড়ম্বরে বঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৬০০ খ্রীঃ মানসিংহ কাশী হইতে রাজমহলে পৌছিলেন এবং ১৬০৩ খ্রীঃ প্রারম্ভে বিরাট সৈন্য-বাহিনী লইয়া যশোরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রূপবসু ও কচুরায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। জলঙ্গীর তীরবর্ত্তী 'চাপড়া' নামক স্থানে ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহকে বহুযত্নে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বহুসংখ্যক নৌকা সংগ্রহ করিয়া দিয়া বাদশাহী সৈন্যকে নদী পার হইতে সাহায্য করিলেন। চাপড়া হইতে মানসিংহ চূর্ণী নদী পার হইয়া চাকদহে পৌছিলেন এবং সেখান হইতে ক্রমে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে মোগল সৈন্য বসিরহাট ও টাকী অতিক্রম করিয়া হাসনাবাদে পৌছিল। সম্মুখে ছিল বুড়নহাটি দুর্গ। এখানে সামান্য ধরণের একটু সংঘর্ষ হইল।

ইহার পর মানসিংহ কালিন্দী পার হইয়া বসন্তপুরে ছাউনি করিলেন এবং একগাছি শৃঙ্খল এবং একখানি তরবারি দিয়া একটী দূত পাঠাইয়া দিলেন। চারিদিকে তখন প্রতাপ সৈন্য সমাবেশ করিতেছিলেন। প্রতাপাদিত্য নকীব কেশব ভট্টকে তরবারি লইতেই আদেশ দিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বসন্তপুর ও শীতল-পুরের পূর্ব্বভাগস্থ প্রান্তর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। (ঘটকদের মতে) তিন দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। প্রথম দুই দিনে মানসিংহ

পরাজিত কিন্তু তৃতীয় দিনে জয়ী হইলেন এবং প্রতাপকে বন্দীও করিলেন। *

প্রতাপাদিত্যের পতন

১৬০৫ খ্রীঃ আকবর দেহত্যাগ করিলে জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বঙ্গে তখনও বিদ্রোহের শান্তি হয় নাই। জাহাঙ্গীর মানসিংহকে আবার বঙ্গে প্রেরণ করিলেন (আট মাস বঙ্গে ছিলেন)। তাহার পরে কুতুবউদ্দিন এবং শের আফগানের সহিত সংঘর্ষে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ বঙ্গের নবাব হইলেন। বৎসরাধিক কালের মধ্যে কুলি খাঁ মৃত্যুমুখে পড়িলে ইসলাম খাঁ বঙ্গের সর্ব্বময় শাসনকর্ত্তা হইলেন (১৬০৮)। এই ইসলাম খাঁ'র হস্তেই প্রতাপের পরাজয় ও পতন ঘটিয়াছিল (১৬০৯)। সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন, "প্রতাপাদিত্যের শেষ পতন যে ইসলাম খাঁ'র সময়ে হয়, মানসিংহের হস্তে নহে "বহারিস্তান" তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে।"

সন্ধিপ্রার্থী প্রতাপাদিত্য ইনায়েৎ খাঁ'র সঙ্গে যথা সময়ে ঢাকায় গিয়া পৌঁছিলেন। নবাব কিছুতেই সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না,

* এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য মতান্তর :—ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের মতে—মানসিংহের হস্তেই প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ও পতন ঘটে। রামরাম বসু কিন্তু লিখিয়াছেন যে সন্ধির পরে "সিংহ রাজার সহিত প্রতাপাদিত্যের অধিক অন্তরঙ্গতা হইল"। নিখিলনাথ রায়, সতীশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির মতে—প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া মানসিংহের সহিত সন্ধি করিলেন। মানসিংহ বসন্তরায়ের বংশধরদের ছয় আনা অংশ উদ্ধার করিয়া দিয়া যশোর হইতে রাজমহল ফিরিয়া গেলেন এবং পরে শ্রীপুরের কেদাররায়ের রাজ্য আক্রমণ করিয়া শ্রীনগরের যুদ্ধে কেদার রায়কে পরাজিত ও নিহত করিলেন। ১৬০৪ অব্দে মানসিংহ বঙ্গের কার্য্য ত্যাগ করিয়া আগ্রায় চলিয়া গেলেন (তারপর ১৬০৬ খ্রীঃ মাত্র আট মাসের জন্য বঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিলেন)।

নবাব ইসলাম খাঁ প্রতাপকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন (বহারিস্তান) এবং ইনায়েৎ খাঁকে যশোরের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। প্রতাপাদিত্য ঢাকা নগরীতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছেন এবং উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা নাই—এই নিদারুণ সংবাদ যশোরে পৌছিতেই উদয়াদিত্য "চণ্ডমূর্ত্তি ধরিয়া মোগলের উপর পতিত হইয়াছিলেন," কিন্তু উদয় আর ফিরিতে পারেন নাই। দুর্গমধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল; রাণী শরৎ-কুমারী তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিতে বিলম্ব করিলেন না। পরিবারবর্গ ও শিশুসন্তানসহ যশোরের মহারাণী জাতি মান রক্ষা করিতে জলমগ্ন হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

আর প্রতাপাদিত্য ! অনেকদিন পর্য্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ঢাকায় বন্দী করিয়া রাখিয়া ইসলাম খাঁ প্রতাপসিংহকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া ঢাকা হইতে নৌকাপথে আগ্রায় প্রেরণ করিলেন। পথে কাশীধামে প্রতাপাদিত্যের অমর আত্মা দেহমায়া ত্যাগ করিয়া অক্ষয়-কীর্ত্তিলোকে প্রস্থান করিল—বঙ্গের শেষ বীর শোচণীয়ভাবে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

প্রতাপ-আদিত্য নাটকের ঐতিহাসিকত্ব

প্রতাপাদিত্য, ঐতিহাসিক ব্যক্তি—বাঙ্গলার বার ভুঁইঞাদিগের অন্যতম এবং প্রধান। তাঁহার জীবনের ঘটনা অবলম্বন করিয়া নাটকখানি লিখিত, সুতরাং নাটকখানির মূল ভিত্তি বা বিষয় ইতিহাস বলিয়া নাটকখানিকে ঐতিহাসিক নাটকের পংক্তিতে স্থান দিতে আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য কিন্তু এ সিদ্ধান্তও না করিয়া উপায় নাই যে নাটকখানির মধ্যে ঐতিহাসিক পরিবেশ অপেক্ষা কাল্পনিক ও আধ্যাত্মিক আবহাওয়াই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক তথ্যকে নাট্যকার এমন অসঙ্গতভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন,

স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে এমন কাল্পনিকতা দেখাইয়াছেন যে বিশেষ উপাদানের হিসাবে নাটকখানির ঐতিহাসিক হইবার যথেষ্ট যোগ্যতা থাকিলেও সমগ্র সৃষ্টিরূপে উহা কাল্পনিক-প্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নাটকখানিতে ঐতিহাসিক ভাবশুদ্ধি সন্তোষজনক মাত্রায় নাই। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে বা প্রচলিত আছে, উহার অনেকগুলিই নাটকে স্থান পাইয়াছে এ কথা সত্য বটে, কিন্তু এ কথাও সত্য যে, পারম্পর্য্য এবং সঙ্গতির ধার নাট্যকার খুব কমই ধারিয়াছেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—রাজমহলের শের খাঁ'র সহিত বিবাদের কথা বহুকথিত তথা ঐতিহাসিক-প্রায়, কিন্তু আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই শের খাঁ'র আক্রমণ ও পরাজয় বরণ ইতিহাস-সমর্থিত বলা যায় না। তারপর, আগ্রাগমনকালে উদয়াদিত্যের জন্ম হয় নাই (জন্ম ১৫৮৭, গমনকালে ১৫৭৮) বা বিন্দুমতীর বিবাহও হয় নাই (বিবাহ ১৬০২ খ্রীঃ) অথচ নাটকে পাওয়া যায় যে আগ্রাগমনকালে প্রতাপাদিত্য স্ত্রী কাত্যায়নীকে কন্যা বিন্দুমতীকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে নিষেধ করিতেছেন এবং পুত্র উদয়াদিত্যের ছোটমুখে বড় বড় কথা শুনিয়া আনন্দিত হইতেছেন। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান যায় যে নাট্যকার ঘটনার স্থান কাল সম্বন্ধে মোটেই অবহিত হন নাই। ব্যবহিত ঘটনাদের সন্নিপাত করিয়া চমক সৃষ্টি করিবার দিকে অদম্য ঝোঁক থাকায় ঘটনা সন্নিবেশে কালানুবর্ত্তিতা তথা ঐতিহাসিকতা আশানুরূপ রক্ষিত হয় নাই।

কালানুবর্ত্তিতার ত্রুটি ছাড়াও অন্যধরণের ত্রুটিও পাওয়া যায় এবং সেই ত্রুটি নাটকখানির ঐতিহাসিক ভাবশুদ্ধির পরিপন্থী। প্রকৃত ঘটনাকে অতিপ্রাকৃতের রহস্যে আচ্ছন্ন করা এই ত্রুটি।

কল্পনা করিবার অধিকার স্রষ্টার আছে এবং সে-কল্পনা কবির স্বকপোলকল্পিতও হইতে পারে, কিন্তু কল্পনা যেখানে সঙ্গতি ও ঔচিত্যবোধে আঘাত দেয় এবং নিছক চমক সৃষ্টির স্থূল কৌশল হইয়া দাঁড়ায়, সেস্থলে উহাকে 'কল্পনা' (imaginaticn) না বলিয়া 'কাল্পনিকতা' *(fancy)* বলাই সঙ্গত। এইরূপ 'কাল্পনিকতা' নাটকে আছে এবং চোখেও লাগে। যেমন, প্রতাপাদিত্যের বাণে বিদ্ধ হইয়া একটী পাখী বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে পতিত হইয়াছিল এবং বিক্রমাদিত্যকে প্রতাপের কোষ্ঠীর ফল স্মরণ করাইয়া চঞ্চল ও বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল—এ কথা তথ্য হিসাবে ঐতিহাসিক, কিন্তু নাট্যকার এই সূত্রটীকে কেন্দ্র করিয়া শঙ্করের ও বিজয়ার ব্যাপারের যে কল্পনার দানা বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সমাহরণ হিসাবে যত চমকপ্রদই হউক—"নাটকীয়" কথাটীর প্রচলিত তাৎপর্য্যের দিক দিয়া যত চমৎকারীই হউক—সুসঙ্গত সৃষ্টি হিসাবে খুব সমাদরণীয় হইয়াছে বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ পর্ত্তুগীজ জলদস্যু রডা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতাপাদিত্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল—একথা ইতিহাস কথিত কিন্তু নাট্যকার বিজয়ার দৈবীশক্তির মহিমাজাল বিস্তার করিয়া যে-ভাবে রডাকে জড়াইয়া ফেলিয়া বশীভূত করিয়াছেন তাহা অতিপ্রাকৃত এবং অতি স্থূল কাল্পনিকতা। ঐতিহাসিক ঘটনাকে অতিপ্রাকৃতের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করায় নাটকখানির ঐতিহাসিকত্বের গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে।

পাত্র-পাত্রীর ঐতিহাসিকতা

পাত্রগুলির প্রায় সকলেই নামতঃ নিখুঁতভাবে ঐতিহাসিক, কিন্তু কেহ কেহ কার্য্যতঃ বা ব্যবহারতঃ সংস্কার-বিরোধী হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের চরিত্রটীর কথাই প্রথমে ধরা যাক। এই চরিত্রটী সম্বন্ধে

ঐতিহাসিক এবং সমালোচকগণ যথেষ্ট খুঁতখুঁত করিয়াছেন। 'যশোহর খুলনার ইতিহাস'-এর দ্বিতীয়খণ্ডে ৺সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন, "শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার প্রতাপাদিত্য নাটকে মহারাজ বিক্রমাদিত্য দ্বারা যে এক হাস্যাস্পদ চরিত্রাভিনয় করাইয়াছেন তাহা বড়ই অপ্রীতিকর। প্রবীণ বিক্রমাদিত্যের সে দুর্দ্দশা দেখিলে শীতরক্ত বাঙ্গালীর মুখে বিরক্তির রক্তিমা প্রতিভাত না হইয়া পারিবে না। প্রতাপাদিত্যের মুল্লুক পর্য্যন্ত যাঁহারা জানেন না, কখনও দেখেন নাই, তাঁহারাই যদি সহরের ত্রিতলে বসিয়া নাট্যমঞ্চের তাগাদায় পড়িয়া স্বদেশীয় বীরের এরূপ অস্বাভাবিক অবমাননা করেন তাহা হইলে দুঃখ রাখিবার স্থান থাকে না। কবির পথ কি এতই নিরঙ্কুশ, বাঙ্গালী আজকাল এতই গল্প-রসিক, যে তাহার নিকট হইতে সস্তায় বাহবা লইতে কোন প্রকার চেষ্টা, অনুসন্ধান বা ঐতিহাসিক সঙ্গতিরক্ষার প্রয়োজন হয় না। এই গ্রন্থেরই অন্যস্থলে তিনি লিখিয়াছেন, "আজকাল যাঁহারা বিক্রমকেশরী বিক্রমাদিত্যকে নাট্যরঙ্গ মঞ্চে আনিয়া রক্তশূন্য ভয়াতুরের চিত্র দেখাইতেছেন তাঁহারা বাঙ্গালী হইয়াও বাঙ্গালীর মুখে কালিমা লেপন করিয়া দিতেছেন"। বাস্তবিক নাট্যকার শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়া থাকুন অথবা ইচ্ছা করিয়াই শিবকে বাঁদর করিয়া থাকুন, বিক্রমাদিত্য ঐতিহাসিক সংস্কারে খুবই আঘাত দেয়। প্রতাপাদিত্যের পিতাকে হাস্যরসের 'আলম্বন' করা সর্ব্বতোভাবে অনুচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ শঙ্কর ও সূর্য্যকান্তের চরিত্র সম্বন্ধে ঔচিত্য অনৌচিত্যের অভিযোগ করা না গেলেও, তাঁহাদের বাসস্থান সম্বন্ধে নাট্যকার যে কল্পনা করিয়াছেন তাহা লইয়া প্রশ্ন করা যাইতে পারে। শঙ্করের বাসস্থান নদীয়ার অন্তর্গত প্রসাদপুর এবং সূর্য্যকান্ত শঙ্করেরই গ্রামবাসী এ তথ্য সত্য হিসাবে গ্রহণ করিবার বাধা আছে। ৺সতীশচন্দ্র মিত্রের

মতে শঙ্করের বাড়ী 'বারাসতে' এবং সূর্য্যকান্তের নিবাস পূর্ব্বাঞ্চলের কোন এক গ্রামে। যাহা হউক, এইগুলি খুব আপত্তিকর ত্রুটি নহে, কারণ ইহাদের সম্বন্ধে যথার্থ সংবাদ খুব কমই পাওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ আজিম চরিত্রটীর ঐতিহাসিকতা বিষয়েও 'কিন্তু' তোলা যাইতে পারে। "ক্ষিতীশ বংশাবলী" গ্রন্থে লিখিত আছে —প্রতাপাদিত্যের দৌর্জ্জন্যের সংবাদ শুনিয়া এবং কচুরায় প্রভৃতির সাক্ষ্যে নিশ্চিত হইয়া বাদশাহ মানসিংহকে প্রতাপকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটকদিগের কথায় পাওয়া যায় যে মানসিংহের আক্রমণের পূর্ব্বে বাদশাহ বঙ্গাধিপ প্রতাপের বিনাশের জন্য ২২ জন আমীরকে সসৈন্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন; আবার অন্নদামঙ্গলে আছে—

বাইশী লস্কর সঙ্গে কচুরায় লয়ে রঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা।

নিখিলনাথ রায় মহাশয় বাইশ আমীরের আগমনের কথা বিশ্বাস করেন না। আর আসিলেও তাঁহারা মানসিংহের অধীনেই আসিয়াছিলেন, সতীশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি এই সিদ্ধান্তেরই পক্ষপাতী। কিন্তু আজিম খাঁ যে উক্ত লস্করদেরই একজন এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না। তবে ঘটককারিকায় আছে—

সম্বাদমশিবং শ্রুত্বা জাহাঙ্গীরো মহীপতিঃ
প্রেষয়ামাস সেনানী আজিম খান সংজ্ঞকঃ।
... ...
আজিমং পাতয়ামাস তীব্র ঘাতেন ভূতলে।

লক্ষ্য করিবার বিষয়—জাহাঙ্গীর আজিম খাঁকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু নাটকে আছে বাদশাহ আকবরই তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। নাট্যকারের ধারণা বোধহয় এই ছিল যে, মানসিংহের হস্তেই প্রতাপের

পতন—অতএব আজিম খাঁকে আকবর ছাড়া আর কেহ পাঠাইতে পারেন না। সুতরাং "আজিম" এক হিসাবে ঐতিহাসিক হইলেও, আর এক হিসাবে অনৈতিহাসিক।

স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে 'বিজয়া' সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং শঙ্করের স্ত্রী কল্যাণীও কল্পনা-কন্যা। তারপর প্রতাপাদিত্যের পত্নীর (উদয়াদিত্যের মাতার) নাম শরৎকুমারী, কাত্যায়নী নহে।

উপসংহারে এই কথা বলা যায় যে, ঐতিহাসিক উপাদান লইয়া নাটকখানি লিখিত হইলেও, কাল্পনিকতার আতিশয্যে নাটকখানির ঐতিহাসিকত্বের গুরুত্ব অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। তবে, নাটকখানির এয়োদশ সংস্করণের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, অগত্যা তাহাই স্বীকার করিতে হইবে; স্বীকার করিতে হইবে, "অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও প্রতাপ-আদিত্যকে স্বচ্ছন্দে ঐতিহাসিক নাটক বলা যাইতে পারে, কারণ ইহার মূল ভিত্তি ইতিহাস।" শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বসু মহাশয় এই পর্য্যন্তই গ্রাহ্য, কিন্তু যখন তিনি বলেন, "নাটককার কোথাও কোন মুখ্য ঘটনা ও চরিত্রের বিকৃতি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, বরং তাঁহার কৌশলময়ী লেখনীর গুণে সেগুলি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শিব শিবই আছেন বানর বানরই আছে! তবে হয়ত কোন চিত্র রঞ্জিত করিবার সময় কবি (বোধহয় ইচ্ছা করিয়াই) রংটা একটু গাঢ় করিয়া ফেলিয়াছেন"—তখন তাঁহাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করা চলে না। কারণ অন্যতম মুখ্য চরিত্র বিক্রমাদিত্যের বিকৃতি শিবকে বানর করিবার কথাই স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। বিক্রমাদিত্যের চরিত্রকে 'উজ্জ্বল' বিশেষণ না দিয়া 'উচ্ছল' বা জলীয় বলাই ভাল।

প্রতাপ-আদিত্যের সাধারণ সমালোচনা

'প্রতাপ-আদিত্য' একখানি পঞ্চাঙ্ক ইতিহাসমূলক নাটক,—বঙ্গের শেষ বীর প্রতাপাদিত্যের জীবনকথা ইহার উপাদান। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যে বঙ্গবীরের আত্মপ্রতিষ্ঠার তথা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদগ্র কামনাকে দমন করিবার জন্য, স্বাধীন বাঙ্গালী জাতির অভ্যুদয়ের প্রচেষ্টাকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য, বাদশাহ আকবরকে বাইশজন আমীরসহ মানসিংহের মত সেনাপতিকে বঙ্গে প্রেরণ করিতে হইয়াছিল, গৃহ-বিবাদে দুর্ব্বল এবং পারস্পরিক অনৈক্যে শক্তি-ক্ষীণ না হইলে যিনি ঢাকার নবাব ইসলাম খাঁ প্রেরিত সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁকে পর্য্যুদস্ত করিতে তথা স্বাধীন বাংলার অধীশ্বর হইতে পারিতেন, সেই তেজোবিগ্রহ যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের শৌর্য্যবীর্য্যময় অভ্যুদয় ও অতি শোচনীয় পতনের কথাই নাটকখানির উপস্থাপ্য বিষয় বা উপাদান।

কিন্তু উপাদান যত ভালই হউক, উপাদেয় হইয়া না উঠিলে—শিল্প-সৌন্দর্য্যে মনোহর তথা মূল্যবান হইয়া না উঠিলে উহার ভাল না-হওয়া প্রায় একই কথা। শক্তিহীন স্রষ্টার হাতে গুরু বিষয়ও যে অতিলঘু হইয়া যাইতে পারে নাটকখানির সমালোচনা মুখে ঐ কথাটীই বার বার মনে জাগে এবং এই কারণেই জাগে যে—প্রতাপাদিত্যের জীবনকথার মত তেজস্ক্রিয় বিষয় উপাদানরূপে পাইয়াও নাট্যকার উহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই—উচ্চাঙ্গের শিল্পে পরিণত করিতে পারেন নাই, দেহ-প্রাণের সুষম সমবায়ে কাব্য-পুরুষের ব্যক্তিত্ব নাট্যকার সে ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন নাই। ট্র্যাজেডি সৃষ্টির উপযুক্ত উপাদান

থাকা সত্ত্বেও নাট্যকারের হাতে পড়িয়া নাটকখানি 'ন যযৌ ন-তস্থৌ' হইয়া আছে, বরং আছে এই কারণেই যে নাট্যকারের মধ্যে শিল্পীর সহজ সঙ্গতি-বোধ ও পরিমিতি-বোধের দৈন্য রহিয়াছে—ফলে কাল্পনিকতা এত প্রশ্রয় পাইয়াছে, চমৎকার অপেক্ষা 'চমক' সৃষ্টির এত প্রবণতা প্রকাশ পাইয়াছে যে নাটকখানি উপাদেয় সৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে নাই।

প্রতাপ-আদিত্যের শ্রেণী-বিচার

নাটকখানির গোত্র নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইলে নেতিবাচক দিক দিয়া এরূপ বলা যায় যে নাটকখানি "কমেডি" নহে বা মিশ্রজাতীয় "ট্র্যাজি-কমেডি"ও নহে। এখন 'কমেডি' বা 'ট্র্যাজি-কমেডি' যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর বাকী দুইটী শ্রেণীর কোন একটীতে পড়িতেই হইবে। সেই দুটী শ্রেণী—(ক) ট্র্যাজেডি এবং (খ) মেলোড্রামা। সুতরাং বিচার্য্য বিষয় এই যে প্রতাপ-আদিত্য নাটকখানি ট্র্যাজেডি অথবা মেলোড্রামা এই দুই শ্রেণীর কোন্‌টীর অন্তর্ভুক্ত। প্রশ্নাকারে বলা যায়, "প্রতাপ-আদিত্য" কি ট্র্যাজেডি ? না মেলোড্রামা ?

প্রথমেই দেখা যাক্ 'প্রতাপ-আদিত্যে' ট্র্যাজেডির কোন্ লক্ষণ পাওয়া যায়। (ক) প্রতাপ-আদিত্য নাটকের পরিণাম বিষাদজনক এবং শোচনীয়। সুতরাং 'কমেডি' হইতে পারে না—নিশ্চয়ই 'ট্র্যাজেডি' (সাধারণ অর্থে) হইবে। (খ) দ্বিতীয়তঃ নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র যেখানে মূর্ত্তিমান পুরুষকার প্রতাপাদিত্য, সেখানে নায়কের স্তরগত যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন আসিতে পারে না—প্রতাপাদিত্যের মত শক্তিমান ব্যক্তির বিস্ময়কর অভ্যুত্থান ও শোচনীয় পরিণাম ট্র্যাজেডির যোগ্যতম বিষয় এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। (গ) তৃতীয়তঃ ভয়ঙ্কর

ও করুণ ঘটনা (incident arousing pity and fear) নাটকে রহিয়াছে—গোবিন্দের ও বসন্তরায়ের হত্যা যেমন ভয়ঙ্কর, প্রতাপের পরিণাম তেমনই শোচনীয়। (ঘ) চতুর্থতঃ যে 'অতিপ্রাকৃত ঘটনা' নাটকের 'সার্ব্বজনীনতা' সৃষ্টির (universality) অন্যতম উপায় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে (*Theory of Drama*—Nicoll দ্রষ্টব্য) নাটকে সেই অতিপ্রাকৃত ঘটনার একরকম ছড়াছড়ি। তারপর "importance of the hero" ও রহিয়াছে—প্রতাপাদিত্যকে "some one of high fame and flourishing prosperity" বলা যাইতে পারে। অতএব নাটকখানিতে সার্ব্বজনীনতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

আর মহামতি নিকল লিখিয়াছেন, "The cardinal element in high tragedy is universality. If we have not this, however well written the drama may be, however perfect the plot, and however brilliantly delineated the characters, the play will fail…"—'সার্ব্বজনীনতা উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি-নাটকের মৌলিক ধর্ম্ম। এইটী যদি না থাকে, নাটক যতই সুলিখিত হউক, নাটকের কাহিনী-কল্পনা যতই পরিপাটি হউক এবং চরিত্রগুলি যত সুন্দরভাবেই বিশ্লেষিত হউক, নাটকখানি ব্যর্থ হইতে বাধ্য।' অতএব উক্ত সার্ব্বজনীনতা থাকায় নাটকখানিকে উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি না বলিয়া উপায় নাই।

উল্লিখিত যুক্তি দেখিয়া প্রতাপ-আদিত্য নাটককে ট্র্যাজেডি বলিবার ঝোঁক আসিতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডির লক্ষণ ও স্বরূপ সম্বন্ধে খুব সুস্পষ্ট ধারণা থাকিলে দেখা যাইবে যে নাটকখানি উচ্চাঙ্গের নাটক তথা ট্র্যাজেডি হইয়া উঠে নাই।

(ক) প্রথমতঃ নাটকখানি গঠনের দিক দিয়া অসুচিতরূপে শিথিলবদ্ধ এবং রোমাঞ্চকর ঘটনাপ্রবণ। ইহাতে অতিপ্রাকৃত এবং

আকস্মিক ঘটনার দ্বারা চমক সৃষ্টি করিবার দিকে অবাঞ্ছনীয় এবং অসঙ্গত ঝোঁক রহিয়াছে। (খ) দ্বিতীয়তঃ উচ্চাঙ্গ নাটকের প্রাণ যে দ্বন্দ্ব—যে দ্বন্দ্ব নাটকের মধ্যে অন্তর্মুখীনতা (inwardness) আনয়ন করে, আবেদনে তীব্রতা ও গভীরতা সৃষ্টি করে—সেই অপরিহার্য্য ধর্ম্ম দ্বন্দ্ব (conflict) নাটকখানিতে নাই বলিলেই চলে। কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রতাপাদিত্যে সংঘর্ষ আছে কিন্তু দ্বন্দ্ব নাই। ফলে চরিত্রটার শোচনীয় পরিণাম ট্র্যাজেডির গভীর আলোড়ন ও তীব্র সংবেদন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। (গ) তৃতীয়তঃ উচ্চাঙ্গের নাটকের যেটী লক্ষণীয় লক্ষণ, সেই চরিত্র সৃষ্টির (characterisation) সৌষ্ঠবও নাটকে নাই। মহাশয় নিকল লিখিয়াছেন, "We may expect to find that all great drama, whether it be tragedy, comedy or a spceies in which both are mingled, will be distinginished adove all things by a penetrating and illuminating power of characterisation : or at best by an insistence upon something deeper and more profound than mere outward events." আসল কথা, উচ্চাঙ্গের নাটকের বড় বৈশিষ্ট্য—অন্তর্য্যামী এবং সমুদ্ভাসী চরিত্র-সৃজন-ক্ষমতা অথবা অন্ততঃ কেবল বাহ্য ঘটনা অপেক্ষা গভীরতর এবং ব্যাপকতর কোন-কিছুর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ। এখন চরিত্রের গভীরতা ও ব্যাপকতার হিসাব করিলে নাটকখানিকে উচ্চাঙ্গ নাটক (great drama) বলা চলে না। কারণ নাটকের চরিত্রগুলিতে, এমন কি প্রধান প্রধান চরিত্রগুলিতেও, না আছে গভীর ভাবান্দোলন, না আছে তীব্র অনুভব। *

* লক্ষণীয় নিকল সাহেব এস্থলে চরিত্র-সৃষ্টির উপরই বেশী জোর দিয়াছেন এবং অন্তর্মুখীনতা, সার্ব্বজনীনতা প্রভৃতিকে "অথবা—অন্ততঃ" বলিয়া স্থান দিয়াছেন, কিন্তু আর এক স্থলে—সার্ব্বজনীনতাকেই মুখ্য মৌলিক করিয়া, তুলিয়াছেন।

উল্লিখিত কারণে, প্রতাপ-আদিত্য নাটকখানি ট্র্যাজেডির অর্থাৎ খাঁটি ট্র্যাজেডির পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে নাই। পক্ষে যে যুক্তিগুলি দেওয়া হইয়াছে, উহারা নাটকের দৈহিক লক্ষণ মাত্র —যদিও (অবশ্য) সার্ব্বজনীনতা আত্মিক লক্ষণ। কিন্তু সার্ব্বজনীনতাকে নিকল সাহেব যত মুখ্য করিতে চাহিয়াছেন, বস্তুতঃ উচ্চাঙ্গ নাটকে উহা তত মুখ্যত্ব দাবী করিতে পারে কি না সন্দেহ, আর করিলেও অতিপ্রাকৃত ঘটনা—দেব দেবীর আবির্ভাব, ভূত প্রেতের আবির্ভাব-অন্তর্দ্ধান প্রভৃতি সার্ব্বজনীনতা সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নহে। নাটকখানি, অতএব, ট্র্যাজেডি নহে—হইয়াছে মেলোড্রামা। "মেলোড্রামা'র শিথিলবন্ধতা, আকস্মিক ঘটনাবাহুল্য, চমকসৃষ্টিপ্রবণতা, সঙ্গতিদৈন্য, অন্তর্মুখীনতার অভাব নাটকখানিতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে 'প্রতাপ-আদিত্য' লঘুবন্ধ এবং বিষাদ-পরিণাম একখানি রোমাঞ্চকর নাটক অর্থাৎ 'মেলোড্রামা'।

এখন, কোন নাটককে মেলোড্রামা বলা আর প্রথম শ্রেণীর নাটক না বলা একই কথা। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কতকগুলি ত্রুটির জন্যই ট্র্যাজেডি 'মেলোড্রামা'র স্তরে নামিয়া যায়। অতএব এ সিদ্ধান্ত এখন অনিবার্য্য যে প্রতাপ-আদিত্য নাটকখানি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-শিল্প হইতে পারে নাই।

রসবিচার ও অভিনয়-সাফল্য

তবে কি প্রতাপ-আদিত্য নাটকে রস-নিষ্পত্তি ঘটে নাই? অপ্রিয় সত্য এই—বাস্তবিক রস-নিষ্পত্তি সুষ্ঠুভাবে ঘটে নাই, যাহা ঘটিয়াছে, সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্র মতে তাহা 'রসাভাস'। এই ধরণের রস-নিষ্পত্তিকে ঔপচারিক নিষ্পত্তি ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

যাহা হউক, প্রশ্ন উঠে—প্রতাপ-আদিত্য কোন্ রসের নাটক? নাটকখানির অধিকাংশ ব্যাপিয়া বীর প্রভৃতি নানা রস থাকিলেও উপসংহার অংশে করুণ রসেরই প্রাধান্য ও স্থায়িত্ব হইয়াছে। অভিনয় দর্শনান্তে হৃদয়ে শোকানুভূতিই সঞ্চারিত হয়। স্থায়িভাব শোচনা বলিয়া নাটকখানি উপচারতঃ করুণ রসাত্মক।

অথচ যে নাটকে ঔপচারিক রস-নিষ্পত্তি, যে নাটক শিল্প হিসাবে বাঞ্ছনীয় অভিব্যক্তি লাভ করিতে পারে নাই এবং নানাবিধ ত্রুটির জন্য যাহা রোমাঞ্চকর মেলোড্রামার স্তরে নামিয়া গিয়াছে, সেই নাটকের প্রথম অভিনয়ে বিস্ময়কর আকর্ষণ ও সাফল্য ঘটিয়াছিল। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সাক্ষ্য হইতে আমরা জানি—"*Pratapaditya* was staged on August 15, 1903, and *the Star* now began to draw over-crowded houses every evening and many had to return disappointed for want of accomodation. It had a continued run for 25 nights and the play too was very successful." শ্রীযুক্ত দাসগুপ্ত মহাশয় নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও জানাইয়াছেন—মফঃস্বল হইতে আসিয়া এক শনিবারে তিনি আট আনার টিকিট কিনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু শুনিলেন যে চার টাকার আসনও পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

একাদিক্রমে পঁচিশ রাত্রি পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে অভিনয়, নাটকখানির অভিনয় সাফল্যেরই নিদর্শন। অধিকন্তু নাটকখানি বহুমঞ্চে বহুবার অভিনীতও হইয়াছে (এখনও মাঝে মাঝে হয়)।

এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া, নিশ্চয়ই কেহ বলিতে পারেন যে নাটকখানির অভিনেয়ত্বের (দৃশ্যত্বের) মাত্রা যথেষ্টই আছে—নাটকখানির মঞ্চসাফল্য (stage-success) আশানুরূপ অপেক্ষা

কম নহে। অতএব সার্থক নাটকের অন্যতম লক্ষণ ইহাতে রহিয়াছে।

কিন্তু কেন এই দর্শক সমাগম? ইহা কি নাটকখানির শৈল্পিক উৎকর্ষের আকর্ষণের ফল অথবা অন্যবিধ আকর্ষণের ফল? ইহা কি নাটকের আভ্যন্তরীণ রস-মাধুর্য্যের আকর্ষণের ফল অথবা দর্শকগণের মানসিক বুভুক্ষাজনিত তাড়নার নির্ব্বিচার প্রতিবেদন মাত্র? পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, নাটকখানি "মেলোড্রামা" অর্থাৎ উচ্চাঙ্গের শিল্প-সৃষ্টি নহে। অতএব শৈল্পিক উৎকর্ষের আবেদন এস্থলে খুব কার্য্যকরী হইতে পারে না। তবে?

রসাস্বাদন ব্যাপার

এ কথা সর্ব্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন যে কোন রচনা-শিল্পের আবেদন সামবায়িক অর্থাৎ বহু প্রকারের খণ্ড খণ্ড তৃপ্তির সমবায়ে অখণ্ড বা একক আনন্দানুভূতি। যতগুলি উপাদানের সংযোগে রচনার সৃষ্টি, ততগুলিই উহার খণ্ড এবং প্রত্যেক খণ্ডের চমৎকারিতার সমবায়ে অখণ্ড রসাস্বাদন। বিষয়, ভাষা, ভাব, কল্পনা, অনুভাব (বিশ্লেষণ) প্রভৃতি রচনার উপাদান। সুতরাং শৈল্পিক আনন্দের মধ্যে সকল উপাদানেরই কম বেশী দান থাকে। কোন রচনায় হয়ত বিষয়-মহিমা বেশী থাকে, কোথাও হয়ত ভাব-গৌরব, কোন ক্ষেত্রে যত ভাষার লালিত্য ও বৈচিত্র্য, কোথায়ও হয়ত কল্পনা-বৈচিত্র্য ও পারিপাট্যের আকর্ষণ লক্ষণীয় হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ নানাবিধ আবেদনের সমষ্টি শৈল্পিক আনন্দবোধ। ফলে রচনা-বিচারে অনেক সময়ই বিভ্রান্তি ঘটে এই কারণে যে কোন একটী উপাদান প্রাধান্য বিস্তার করিয়া শৈল্পিক মূল্য নির্দ্ধারণে বাধা জন্মাইয়া থাকে। এমন হইতে পারে যে বিষয়টীর এমন একটী নিজস্ব মহিমা বা সাময়িক

আকর্ষণ থাকিতে পারে যাহার ফলে বিষয়টীর সামান্য ও বিশৃঙ্খল উপস্থাপনাও শ্রোতার বা দর্শকের মনে ভাব সঞ্চার করিয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে রসাস্বাদন অপেক্ষা শ্রোতার নিজস্ব বাসনা চরিতার্থতাই বেশী হয়। যুগের চাহিদানুযায়ী বিষয় বা ভাবাবেগ-তীব্র পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী গ্রহণ করিলে স্রষ্টা সহজ আবেদন-টুকু হাতের পাঁচ হিসাবেই পাইয়া থাকেন। এইরূপ ক্ষেত্রে রচনার যথার্থ শিল্পমূল্য কম হইলেও যুগমনের অতিকাম্য বিষয় উপস্থাপিত করিয়া যুগমনে বেশ স্পন্দন সৃষ্টি করিতে পারেন। স্পন্দন ও শৈল্পিক আকর্ষণ একত্রে রচনার "সামগ্রিক আকর্ষণ" সৃষ্টি করিয়া থাকে। অতএব রচনায় যথার্থ শৈল্পিক মূল্যের মাত্রা কম থাকিলেও অর্থাৎ শক্তির সমাবেশে ভাব-সঞ্চারণের ক্ষমতায় (power of communication) রচনা ক্ষীণশক্তি হইলেও, সাময়িক অতিকাম্য ভাবনা বা চাহিদা ধারণ করিয়া উহা জনমনকে বেশ আকর্ষণ করিতে পারে। কারণ যুগ-চেতনার অনুকূল বা অতিকাম্য বিষয়ের নিজস্ব ভাবোদ্দীপনী শক্তি (রিডেন্টিগ্রেটিভ পাওয়ার) থাকে এবং উহারই ফলে বিষয়ের কোন একটী অংশের উল্লেখ বা সংকেতমাত্র সমগ্র ধারণামণ্ডল সক্রিয় হইয়া উঠিয়া চেতনাকে উদ্দীপিত করিয়া তুলে।

প্রতাপ-আদিত্য নাটকের অভিনয়-সাফল্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে বিষয়বস্তুর ভাবোদ্দীপনী শক্তিই সাফল্যের মুখ্য কারণ। প্রতাপাদিত্য বাংলার শৌর্য্য-বীর্য্যের, বাঙালীর স্বাধীনতা কামনার ও সংগ্রামের অতুলনীয় প্রতীক—সর্ব্বাগ্রগণ্য উত্তরসাধক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙালী যখন স্বাধীনতা-কামনায় উদগ্র ও ব্যাকুল—শিবাজী উৎসবের অনুকরণে, উত্তরসাধকদের পূজার জন্য যখন সে একাগ্র উন্মুখ—তখন সীতারাম, কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্যই শক্তিতীর্থের দেবতারূপে বাঙালীর

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শক্তি-সাধনায় সঙ্কল্পিত বাঙ্গালী কায়মনে শক্তির উদ্বোধন করিতে, উত্তরসাধকদের প্রাণবত্তায় বাংলার আকাশ-বাতাস প্রাণময় তেজোময় করিতে চেষ্টিত হইলেন। প্রত্যক্ষ-ভাবে জাতিকে পরাধীনতার বিরুদ্ধে আহ্বান করিতে না পারিয়া, পরোক্ষভাবে শক্তি-সাধকদের জীবনীর মধ্য দিয়া জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে তৎপর হইলেন।

কবিচিত্ত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যুগের প্রবণতায় সহ-যোগিতা না করিয়া পারিল না—পুরাতন প্রতীকের মধ্য দিয়া তাঁহারা নূতন জীবনের আশা-আকাঙ্খা ও কর্ত্তব্য রূপায়িত করিতে সচেষ্ট হইলেন।

রচনার প্রেরণা

এই চেষ্টারই অন্যতম প্রকাশ "প্রতাপ-আদিত্য" নাটক। বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরই বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম নাট্যরূপে রঙ্গমঞ্চের আলোকের সম্মুখে আবির্ভূত হইল। সীতারামের স্বাধীনতা-কামনা ও চেষ্টা—তৎসহ হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের তথা একজাতীয়তার স্বপ্ন জাতির চিত্তে নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করিল। এই উদ্দীপনায় জাতির স্নায়ুতন্ত্র নূতন ও তীব্রতর উদ্দীপনার কামনায় উদগ্রীব হইয়া উঠিল। সেই উদ্দীপনার মুখেই প্রতাপ-আদিত্যের আবির্ভাব! *Indian Stage* নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-নাথ দাশগুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন "*Sitarám* inspired Khirode prasad to write a drama on another national hero—*Pratapaditya* and it too produced a great sensation in the country." এই '.ensation' এর অন্যতম কারণ সম্বন্ধে তিনি আগে লিখিয়াছেন, "besides the times were

also exciting." 'পশ্চিম বঙ্গ পত্রিকা'র রবিবাসরীয় সংখ্যায় (৫ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৫৫ সাল) ফণী রায় মহাশয় "সেকেলে কথা" প্রবন্ধে এই সময়ের এবং প্রতাপ-আদিত্য নাটক রচনার চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন। সামান্য একটু অংশ উদ্ধার করিবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিলাম না: "এইভাবে অনেকস্থলেই তরুণদের গুপ্ত অভিযান................অসাফল্য হওয়ায়................ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও ভূপেন দত্ত মহাশয় প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ষ্টারের হরি বসু মহাশয়ের নিকট উদ্দেশ্য উত্থাপন করা মাত্র বসু মহাশয় তদ্দণ্ডেই সম্মত হন... ... হরি বসু মহাশয় তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি, তিনি যখন শুনলেন নৃত্যগোপাল ও অমৃত বসু এ সঙ্কল্পে আতঙ্কে অস্থির—ছায়ারও দূরে থাকার কথা জানিয়াছেন, তখন পূর্ব্ব প্রথামত অমৃত বসুকে উত্তেজিত করে প্রহসনের মারফত প্রচার কার্য্য না চালিয়ে অমৃত মিত্রের সাথে পরামর্শ করে ক্ষীরোদপ্রসাদকে দিয়ে গুরুগম্ভীর নাটকের মারফত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হন।... ক্ষীরোদপ্রসাদ কাণে শোনা মাত্র প্রস্তুত—পুরাতন নানাগ্রন্থ ইতিহাস ঘাঁটতে সুরু করলেন। প্রফেসর শ্রীযুত মন্মথ বসু মহাশয় এ বিষয়ে চার আনা তথ্য দিয়ে নাট্যকারকে উৎসাহিত করলেন; অমৃত মিত্রের আবেদনে 'বিজয়া চরিত্র' এবং হরি বসু মহাশয়ের চাহিদা মিটাতে যশোহরের এক শার্দ্দুলরব-মুখরিত অরণ্যমধ্যে যশোরেশ্বরীর মন্দির ও মূর্ত্তির সম্মুখে ধ্যানরত বাঙ্গালী জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ চণ্ডীবর ও ভবিষ্যৎপন্থানির্দ্দেশকারিনী বিজয়াকে দাঁড় করিয়ে অপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণা করলেন। এ রকম 'সিডিশন্' দৃশ্য কোন্ নাটকে আছে ?"

ভাব-সম্পদ

পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে জাতির উদগ্র মানসিক চাহিদার মুখে উপস্থিত হওয়ার ফলেই নাটকখানি ঐরূপ মঞ্চ-সাফল্যের অধিকারী হইয়াছিল। যুগটীর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, বাঙ্গালী (ভারতবর্ষের মধ্যে তখন অগ্রণী) হিন্দু-মুসলমানের সমবায়ে জাতি গঠন করিতে উদ্বুদ্ধ, (খ) দেশের জন্য জাতির মুক্তির জন্য জীবনোৎ-সর্গকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধর্ম্ম এবং শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলিয়া মনে করে, (গ) পারস্পরিক অনৈক্য, বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বার্থপরতাই যে জাতির দুর্গতির জন্য দায়ী এ সত্যকে সে মর্ম্ম দিয়া জানিতে ও জানাইতে চাহে, (ঘ) কায়মনে বাঙালী শক্তির উদ্বোধন চাহে, (ঙ) নারী-শক্তির জাগরণও তাঁহাদের অন্যতম কাম্য বিষয়। প্রতাপ-আদিত্য নাটকে যুগের উল্লিখিত আকাঙ্ক্ষাগুলিকে উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এইগুলি নাটকখানির ভাব-সম্পদ বলা যাইতে পারে। এই ভাব-সম্পদের আকর্ষণ বিষয়-বস্তুর সহজ আকর্ষণের সহিত যুক্ত হওয়াতেই নাটকখানির 'আকর্ষণ'-শক্তি বাড়িয়া গিয়াছে এবং সেই কারণেই অভিনয়-সাফল্যের মাত্রা অত বেশী।

বাস্তবিক, এই নাটকখানিতেই প্রথমে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের তথা ধর্ম্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের আহ্বান শোনা যায়। হিন্দু-মুসলমান যে এক জাতি, তাহাদের একমাত্র পরিচয় তাহারা বাঙালী —হিন্দু প্রতাপের এবং মুসলমান ঈশাখাঁর মুখে তাহার প্রথম অঙ্গীকার পাওয়া গেল। প্রতাপের ঘোষণা—"হিন্দু-মুসলমান এক মায়ের দুই সন্তান। এক অন্নে প্রতিপালিত, এক স্নেহরসসিক্ত। বাল্যে ক্রীড়ায়, যৌবনে মাতৃকার্য্যে, প্রতিযোগিতায়, বার্দ্ধক্যে আত্মীয়তায়—এস ভাই সব—আমরা এক প্রাণে এক মনে মায়ের

দুঃখ দূর করি। পরস্পরের সহায়তায় বঙ্গে মহাযশোরের প্রতিষ্ঠা করি। মাতৃসেবাকার্য্যে আর আমরা ব্রাহ্মণ নই, শূদ্র নই, সেখ নই পাঠান নই—বঙ্গসন্তান"। (৩য় অঙ্ক—৩য় দৃশ্য দ্রঃ)।

হিন্দু প্রতাপাদিত্যের মুখে যে ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা আহ্বান হইয়া ধ্বনিত হইয়াছে, মুসলমান ঈশাখাঁর মুখে সেই আকাঙ্ক্ষাই আন্তরিক আশ্বাসবাণী রূপে উচ্চারিত হইয়াছে। ঈশা খাঁ প্রতাপকে তথা সমগ্র মুসলমান সমাজকে আশ্বস্ত করিতে বলিয়াছে—"দুদিন বাদে সবাই বুঝবে বাংলা মুলুক হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়—বাঙ্গালীর" (৩য় অঙ্ক—৭ম দৃশ্য)। এই সাম্প্রদায়িক-চেতনা-শূন্য জাতীয়তা-বোধের উদ্বোধন ও প্রচার নাটকখানির অতি-মূল্যবান ভাব-সম্পদ।

দ্বিতীয়তঃ প্রতাপের জীবনে মাতৃভূমির জন্য আত্মোৎসর্গের যে ঐকান্তিক একাগ্রতা দেওয়া হইয়াছে তাহারও ভাব-মূল্য খুবই বেশী। প্রতাপ ধন চান না, যশ চান না, পুণ্য চান না, প্রতিষ্ঠা চান না— একমাত্র যশোর চান। প্রতাপের অটল সঙ্কল্প—"আমি যশোর চাই —নরকের প্রচণ্ড অনল-পথ ভেদ করেও যদি আমাকে যশোর ফিরিয়ে আনতে হয়, তবু আমি যশোর চাই"—স্বর্গ হইতেও মাতৃভূমি প্রতাপের কাছে গরীয়সী। তাই তাঁহার অন্তরের কথা—"সম্মুখ-সমরে, দেহত্যাগে যে স্বর্গ আমি সে স্বর্গ চাই না। যে কার্য্যে স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমির বিন্দুমাত্রও উপকার হয় সে কার্য্যে যদি নরকও অদৃষ্টে থাকে, সূর্য্যকান্ত! যদি বুঝতে পারি—মা আমার বেঁচেছে— তা' হ'লে আমি হাসিমুখে নরকেও প্রবিষ্ট হ'তে পারি।" প্রতাপের এই কামনায় যুগের কামনাই প্রতিফলিত।

তৃতীয়তঃ জাতিবিরোধ, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অনৈক্য এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য দেশদ্রোহিতা যে স্বাধীনতা লাভের ও রক্ষার অন্ত-

রায় এই আত্ম-বিশ্লেষণও তখন খুবই অতিকাম্য। চতুর্থতঃ বাঙালীর —বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর—শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের কামনাও নাটকে রূপায়িত। গোবিন্দদাসকে যশোর ত্যাগে বাধ্য করায় এবং বিজয়ার শক্তিমন্ত্রের প্রচারে উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর বৈষ্ণব-দৈন্যের প্রতি বিরাগ এবং শক্তি-সাধনার প্রতি অনুরাগ সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। পঞ্চমতঃ কল্যাণীর এবং বিজয়ার মধ্যে নারী-শক্তির পুনরুদ্বোধনের যে চেষ্টা নাট্যকার করিয়াছেন, যুগ-চেতনার কাছে তাহা কম প্রিয় ছিল না। 'না জাগিলে সব ভারত ললনা ভারত উদ্ধার হবে না হবে না'—কবির সৃষ্টির মধ্যে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। ষষ্ঠতঃ রাজশক্তির হস্তে প্রজার লাঞ্ছনার চিত্রে রাজাকে ডাকাত আখ্যা দিয়া, নাট্যকার ব্রিটিশের প্রতি ভারতীয় মনোবৃত্তির প্রকৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তথা বাঙ্গালীর ব্রিটিশ বিরাগকে পরোক্ষভাবে তৃপ্ত করিয়াছেন। তারপর রডার উক্তির মধ্যেও ভারতবাসীকে ব্রিটিশ কি চক্ষে দেখে তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে —"শাদা নিশেন তুললে শাদা মানুষ মারতে বাইবেলে নিষেধ আছে। কিন্তু কালা আদমি—অসভ্য কালা—ড্যাম নিগার—মারিয়া ফেল—মারিয়া ফেল—উদ্ধার কর, পুণ্যি আছে"—রডার এই উক্তিটী শ্বেতকায় জাতির বিশেষতঃ ইংরেজদের মনোভাবের নিদর্শন রূপেই দেখা দিয়াছে—ফলে ব্রিটিশ-বিরাগকেই পুষ্ট করিতে সাহায্য করিয়াছে।

নাটকের কাহিনী ও গঠন

এই সকল ভাবের আকর্ষণের সহিত কাহিনী-কৌতূহল যুক্ত হইয়া নাটকখানির শৈল্পিক দৈন্যকে অন্তরালে ফেলিয়া দিয়াছে। কাহিনী-কল্পনার মধ্যে নাট্যকার অপ্রত্যাশিত তথা আকস্মিক ঘটনা

উপস্থাপন করিয়া কাহিনীর গতিতে কৌতূহল-তীব্রতা সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন। বিশেষতঃ যশোরেশ্বরীকে রক্তমাংসের দেহ দিতে যাইয়া যে বিজয়া চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে শুধু একাধারে নবীন-ভোগ্য শক্তি-দর্শন এবং বৃদ্ধ-মনোমুগ্ধকর দেবী-মাহাত্ম্যই প্রকাশ পায় নাই, কাহিনীকে অলৌকিক আবহাওয়ায় রোমাঞ্চকর করিয়া তুলিয়াছে। যে বিজয়ার একহাতে প্রবীণদের মুক্তিদায়ী-সুধা ভক্তি এবং আর এক হাতে নবীনদের সঞ্জীবনী-সুরা মহাশক্তি, সেই বিজয়া-চরিত্রের আকর্ষণ সহজেই অনুমেয়। এইরূপ নানা প্রকার আবেদনে নাটকখানির মঞ্চসাফল্য যথেষ্ট পরিমাণেই ঘটিয়াছে এবং এখনও না হয় এমন নহে।

কিন্তু, নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি, কাহিনীর বিকাশে কৌতূহল বজায় রাখা এবং নানাবিধ ভাবের কথার যোজনা—সৃষ্টিব্যাপারে উপেক্ষণীয় না হইলেও, প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টির বড় লক্ষণ ইহারা ছাড়াও অন্য কিছু এবং সেই অন্য কিছু—"penetrating and illuminating power of characterisation" এবং রচনার দৈহিক সুষমা এবং মানসিক তীক্ষ্ণতা ও ব্যাপকতা। এই 'অন্য কিছু'র হিসাবে নাটকখানি উচ্চাঙ্গের শিল্প হইতে পারে নাই।

প্রথমেই ধরা যাক্—দৈহিক সুষমা বা গঠন-পারিপাট্যের বিষয়। প্রত্যেক শিল্প-বস্তু সৃষ্ট পদার্থ হিসাবে "অবয়বী" বিশেষ, অর্থাৎ নানা অবয়ব বা অঙ্গের সমাবেশে একটা মূর্ত্তি বিশেষ। প্রত্যেক মূর্ত্তিরই একটা স্বাভাবিক আয়তন বা আকৃতি থাকে, আর সেই আয়তন নির্ভর করে অবয়ব-সংস্থানের সুষমার উপরে এবং সেই সুষমার মাত্রার উপরেই নির্ভর করে মূর্ত্তিটির দৈহিক সৌষ্ঠব—রূপশ্রী। সেইরূপ শিল্পেরও একটা আয়তন বা 'অঙ্গ-বিন্যাস'-মাত্রা আছে এবং সেই আয়তনের সৌষ্ঠব নির্ভর করে গঠন-সুষমার উপরে—"সন্ধি"-

সংস্থাপনের উপর। কোনও বিশেষ অঙ্গের অতিস্ফীতি বা অসম্পূর্ণতা যেমন অঙ্গীর বা দেহীর দেহ-বিকৃতিরই লক্ষণ, তেমনি শিল্পেও কোন অংশের বা অঙ্গের অতিবৃদ্ধি এবং অতিক্ষীণতা সৃষ্ট বস্তুর অঙ্গহানিরই নিদর্শন।

'প্রতাপ-আদিত্য' নাটকে অবয়ব-সংস্থাপনের শোচনীয় ত্রুটি ঘটিয়াছে। উপস্থাপ্য বিষয়কে সুসঙ্গত সন্ধি-বিভাগে সুবিভক্ত করা, সেই বিভাগের মধ্যে মুখ্য রসের অভিমুখী করিয়া ঘটনা-সংস্থাপন করা এবং সেই সকল ঘটনার মধ্য দিয়া চরিত্র ও রস-সৃষ্টি করা যেরূপ সৃজন-প্রতিভার কাজ, সেইরূপ সর্ব্বতোমুখী সৃজন-প্রতিভা নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদে নাই।

নাটকখানির মুখ্য উপস্থাপ্য প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তিকাহিনী—অতএব, দৃশ্যযোজনা ও পরিকল্পনা মুখ্য বিষয়ের উপস্থাপনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই করা উচিত। অথচ দেখা যায় যে, নাটকের মুখেই আলোকপাত করা হইয়াছে শঙ্করের উপরে এবং প্রথম দুই দৃশ্যে প্রতাপের নাম গন্ধ নাই—অর্থাৎ দুইটা দৃশ্যের মধ্যেও নাট্যকার বীজ-স্থাপন করিতে পারেন নাই। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত রচনা করিতে দুইটা দৃশ্য ব্যয় করা শুধু অমিতব্যয়িতা নহে নিছক অপব্যয় বলিয়াই নিন্দনীয়। তারপর শঙ্কর যে উদ্দেশ্যে গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন সে উদ্দেশ্যানুযায়ী কাজ করেন নাই—প্রজাদের দুঃখদুর্দ্দশার কথা যশোর রাজের কাছে নিবেদন করিতেই—মুখপাত্রের কার্য্য করিতেই—শঙ্কর প্রসাদপুরের গরিব প্রজাদের সঙ্গে যশোর আসিয়াছিলেন। অথচ প্রজাদের সম্বন্ধে বাগ্‌নিষ্পত্তি করিতে তাঁহাকে দেখা যায় না; পক্ষীর মস্তক চূর্ণ করিয়া চমক লাগাইবার অতি-উৎসাহে শঙ্কর আসল উদ্দেশ্যের কথাই ভুলিয়া গিয়াছেন। নাট্যকারের দৃষ্টি 'বাণবিদ্ধ পক্ষীর' দ্বারা চমক সৃষ্টির

মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তিনি পূর্ব্বাপর চেতনা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তারপর প্রথম অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যটী সর্ব্বতোভাবে নিরর্থক বলা যাইতে পারে। বিক্রমাদিত্যের সম্মুখেই শঙ্কর ও প্রতাপের মধ্যে লক্ষ্যবেধের যে প্রতিযোগিতা ঘটিয়াছিল তাহার পরেও—হা ঠাকুর, তোমার নাম কি?—বিক্রমাদিত্যের এই প্রশ্নটী অদ্ভুতই লাগে। অধিকন্তু এই দৃশ্যটীতে 'টিংটিঙে ভেতো বাঙ্গালী' বা 'শিড়িঙে বাঙ্গালী'কে যে গালাগালি করা হইয়াছে তাহা কালাতিক্রমণ দোষে দুষ্ট এবং খুবই অবান্তর। কাহিনীর বিকাশেও উহার কোন কার্য্যকারিতা নাই। নাট্যকার বর্ত্তমানের কাচে অতীতকে দেখিয়াছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কটীও অপব্যয়ে পরিপূর্ণ। ছয়টী দৃশ্যের মধ্যে চারিটী দৃশ্যই কেন্দ্র-বিমুখ অর্থাৎ প্রধান ঘটনার সহিত ইহাদের প্রত্যক্ষ যোগ নাই। দ্বিতীয় দৃশ্যে যশোরের প্রান্তরে গোবিন্দদাস ও বিজয়ার মুখে জন্মভূমির মায়া-মহিমা কীর্ত্তন ভাবাদর্শের দিক দিয়া প্রশংসনীয় হইলেও বেশ খাপছাড়া। আর চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তিনটী দৃশ্য শঙ্কর-গৃহিণী কল্যাণীর জন্য প্রযোজনা করা অবয়ব যোজনার শোচনীয় ত্রুটি বলা যাইতে পারে। কল্যাণীকে উদ্ধার করা প্রতাপাদিত্যের যত বড় কীর্ত্তিই হউক, প্রতাপের অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ চেষ্টার সহিত উহার কোন অন্তরঙ্গ যোগ নাই। এই অঙ্কে প্রতাপাদিত্যের সনন্দলাভ —আগ্রাজীবনই প্রধান উপস্থাপ্য বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু নাট্যকার কল্যাণীর ব্যাপারে অত্যধিক আগ্রহ দেখাইতে যাইয়া শিল্প-সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। বিষয়বস্তুর পরিবর্দ্ধনের দিক দিয়া দ্বিতীয় অঙ্কটী অসম্পূর্ণ ও অক্ষম।

তারপর, তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নাট্যকার যে ঘটনা-সন্নিপাত ঘটাইয়াছেন,তাহা এত অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক যে কিছুতেই সহজ মনে গ্রহণ করা যায় না। নবাব সের খাঁ কল্যাণীকে বন্দী করিতে না পারিয়া

আক্রোশে যশোর আক্রমণ করিয়াছেন এবং পঞ্চাশ হাজার সৈন্যও প্রেরণ করিয়াছেন ; এই আক্রমণের কারণ—শঙ্করের সাক্ষ্যে জানা যায়—"কল্যাণীকে বন্দিনী করিতে এসেছিল। আপনার জন্যে পারেনি। তাই আক্রোশে নবাব যশোর আক্রমণ করতে আসছে।" কিন্তু আমরা জানি যে, আগ্রা গমনের পথেই প্রতাপ কল্যাণীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং তাহা দীর্ঘকাল পূর্ব্বের কথা। "দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর" প্রতাপ যশোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই সের খাঁর আক্রোশ আক্রমণে চেতিয়া উঠিয়াছে—এইরূপ ঘটনা ঐতিহাসিক তো নহেই, কল্পনা হিসাবেও অসঙ্গত। ঘটনার সন্নিপাত তথা চমক ও কৌতূহল সৃষ্টির চেষ্টা করা নিন্দনীয় নহে, কিন্তু যেখানে সন্নিপাত দুর্বল ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়—অর্থাৎ সঙ্গতি ও সম্ভাব্য-বোধকে আঘাত করিয়া বসে, সেখানে উহাকে নিন্দা না করিয়া উপায় নাই (দৃশ্যটীর শেষাংশ দৈবী বিভীকায় বাস্তবিকই রোমাঞ্চকর)।

তৃতীয় অঙ্কে আটটী দৃশ্যের সমাবেশে বিষয়বস্তুর বিস্তার বা বিকাশ যেটুকু ঘটানো হইয়াছে তাহা আরো কম অবসরে ঘটানো যাইত। কয়েকটী দৃশ্যের অবান্তরতা একটু লক্ষ্য করিলেই ধরা যায়। পঞ্চম ও অষ্টম দৃশ্যে রস ও ভাব কোনটীই আবেদী হইয়া উঠে নাই। অষ্টম দৃশ্যে বিজয়া মেরী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যে অলৌকিক আভা বিকীরণ করিয়াছেন তাহা চমক হিসাবে যত মনোলোভাই হউক—নাটকখানিকে অতিপ্রাকৃত আবহাওয়ার চাপে বেশ লঘু করিয়া ফেলিয়াছে। এই একটী অঙ্কের মধ্যে নাট্যকার প্রতাপাদিত্যের আভ্যুদয়িক কার্য্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সন্তোষজনক হয় নাই। প্রতাপাদিত্যের মধ্যাহ্ন-দীপ্তির ঔজ্জ্বল্য অঙ্কটীতে আশানুরূপ উদ্‌ভাসিত হয় নাই। আয়োজনের আড়ম্বরের তুলনায় প্রয়োজন-সাধন খুবই অকিঞ্চিৎকর। অঙ্কটী 'প্রতিমুখ' সন্ধির (পঞ্চ সন্ধি : মুখ,

প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি) সীমার মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে ; গর্ভ-সন্ধির পরিবর্দ্ধিততর চূড়ান্ত ভাব-বিকাশ (Climax) ইহাতে পাওয়া যায় না।

চতুর্থ অঙ্কে মোগলের সহিত প্রথম সংঘর্ষ এবং প্রতাপের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার পরম নিদর্শন আজিম খাঁর পরাজয়। "হয় ধ্বংস নয় হিন্দুস্থান" (হিন্দুস্থান কথাটী লক্ষণীয়) এই সংকল্প প্রতাপের জীবনের চরম আবেগময় মুহূর্ত্তের প্রকাশ। কিন্তু 'চাকসিরি' অধিকার করিতে প্রতাপ যে কারণে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং শঙ্কর যে-কারণে বলিয়াছিলেন "যেমন করে হোক্ চাইই চাই"—রডার আত্ম-সমর্পণের সঙ্গে সে কারণের শক্তি স্তিমিত হইয়া গিয়াছিল ; তৃতীয় অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে প্রতাপের মধ্যে 'চাকসিরি' দাবী 'চাইই-চাই' রূপে দেখা দিয়া চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আসিয়া তীব্রতা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

চাকসিরি দাবীর তীব্রতা আর ফিরিয়া আসে নাই। পঞ্চম-অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের শেষের দিকে চাকসিরি অধিকারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও পূর্ব্বেই প্রতাপ অন্তর্দৈন্যে দুর্ব্বল ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন; দেখা যায়। প্রতাপ কল্যাণীর কাছে আশীর্ব্বাদ চাহিয়াছেন —"আশীর্ব্বাদ কর মা—আশীর্ব্বাদ কর, শীঘ্র এ রাজ্যের ধ্বংস হো'ক।" জামাতার পলায়নে প্রতাপ এতখানি অন্তর্দৈন্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন যে তাহার দিব্য দৃষ্টিও খুলিয়া গিয়াছে ; তিনি দিব্য চক্ষে দেখিয়াছেন, —"বাঙ্গালীর চিরন্তন দুর্দ্দশা আবার তাকে গ্রাস করবার জন্য ধীরে ধীরে তার দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে"। শুধু এই পর্য্যন্ত যাইয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, মানসিংহ যশোর আক্রমণ করিয়াছেন শুনিয়া —"বেশ হ'য়েছে" বলিয়া আত্মপীড়নের অদ্ভুত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। দেখা যায়, তাঁহার মনে যশোরের ধ্বংস চিন্তাও উদিত হইয়াছে এবং "যশোরের অস্তিত্বের কিছুমাত্রও মূল্য নাই," এমন কি রডা

যখন বলিল—"তোমার বোবানন্দ চাকসিরি দিয়ে শত্রু আনবে তা হামি কি করবে?"—প্রতাপ তখন বিষণ্ণ হতাশায় শুধু বলিলেন—"শঙ্কর! শুনলে?" —চাকসিরির জন্য প্রতাপের মুখে দীপ্ত দাবী আর শোনা যায় নাই। সুতরাং বসন্তরায়ের হত্যার মত দারুণ একটী কার্য্যের কারণ হওয়ার শক্তি 'চাকসিরি' অনেক আগেই হারাইয়া বসিয়াছে। তাই বসন্তরায়ের হত্যা ব্যাপারটী নাটকে কারণহীন কার্য্যের মত খাপছাড়া। অথচ এই বসন্তরায়ের হত্যাই নাটকের —বিশেষতঃ ট্রাজেডি সংঘটনে—সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘটনা। ঘটনাটীর সদ্ব্যবহার নাট্যকার করিতে পারেন নাই এবং পারেন নাই বলিয়াই পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে ঘটনাটী সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই ঘটনাটী নাট্যকার এত বিলম্বে উপস্থাপিত এবং এত আকস্মিক ভাবে শেষ করিয়াছেন যে নাটকের রসের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে। বসন্তরায়ের হত্যার পরে প্রতাপ আত্মধিক্কারে ও অনুতাপে অস্ত্রত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঘটনাটী সুদুঃসহ অন্তর্দ্বন্দ্বে করুণ হইয়া উঠিতে পারে নাই। প্রতাপের আকস্মিক 'প্রস্থান' এবং নাটকের ত্বরিৎ সমাপ্তি প্রতাপের তথা নাটকের পরিণামকে দ্বন্দ্ব-করুণ করিয়া তুলিতে পারে নাই। অমিতব্যয়িতার ফল অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে—প্রথম দিকে নানারূপ অবান্তর ঘটনায় নাটকের গতি অতিবিলম্বিত—বিড়ম্বিত ও বটে; কিন্তু শেষের দিকে ঘটনা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যেন হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। 'উদ্দেশ্য'-কেন্দ্রিক করিয়া ঘটনা নির্ব্বাচন করিতে না পারায়, ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত সত্ত্বেও নাটকখানি ট্র্যাজেডির বা উচ্চাঙ্গ রচনার গঠন পারিপাট্য পায় নাই। নাটকখানিতে অবয়ব-সংস্থানের ত্রুটি শোচনীয়।

তারপর, চরিত্র-চিত্রণের কথা। পরিপাটি অঙ্গ পরিকল্পনা বা

বিশ্বাস যে শিল্প-প্রতিভার অভিব্যক্তি সেই প্রতিভারই আর এক দিক—চরিত্র-সৃজনের ক্ষমতা। প্রথম শ্রেণীর নাটকের বড় বৈশিষ্ট্যই—"Penetrating and illuminating power of characterisation" (Nicoll). এই নাটকে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের উভয় শক্তিই অত্যন্ত ক্ষীণরূপে পাওয়া যায়। 'চরিত্র' সৃষ্টির জন্য যে পরিমাণ পর্য্যবেক্ষণ ও অন্তর্বীক্ষণ আবশ্যক নাট্যকারের মধ্যে এই ক্ষমতার মাত্রা খুবই কম। কোন পাত্র-পাত্রীই যথার্থ ভাবে 'চরিত্র'বান্ হইয়া উঠিতে পারে নাই। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের ভাষায় বলা যায় "চরিত্রগুলিতেও পরিণতির অথবা পূর্ণতার অভাব আছে" (বাঃ সাঃ ইতিহাস, ২য় খণ্ড)। বাস্তবিক নাটকের প্রধান প্রধান ব্যক্তির কাহারও চরিত্রই এই অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারে না। নাট্যকার না ধরিতে পারিয়াছেন চরিত্রের গতি-প্রকৃতি না উপলব্ধি করিয়াছেন উহার ভাব-পরিধি ও গভীরতা। এই কারণেই বিক্রমাদিত্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিতে যাইয়া নাট্যকার যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে 'শিব গড়িতে বাঁদর গড়া' ছাড়া অ.র কিছুই বলা চলে না। দ্বন্দ্বের প্রকৃতি যথার্থরূপে ধারণা করিতে না পারায় চরিত্রটী শোচনীয় ভাবে লঘু হইয়া পড়িয়াছে। সন্তানবাৎসল্য ভ্রাতৃ-প্রীতি এবং আত্মরক্ষার প্রেরণার মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুন্দর অবকাশ থাকিলেও রূপায়ণের দোষে তাহা শিল্প-সুষমায় পরিণত হইতে পারে নাই। এমন কি প্রধান ও কেন্দ্রীয় চরিত্রটীতেও—প্রতাপ-আদিত্যে—ব্যক্তিত্বের সুসম্বদ্ধ বিকাশ ঘটিতে পারে নাই। প্রতাপাদিত্যের মধ্যে যতগুলি ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনা স্বাভাবিক, তাহাদের পারস্পরিক দাবী ও দ্বন্দ্ব চরিত্রটীতে সুসঙ্গত রূপ পায় নাই। পিতার প্রতি—বিশেষতঃ খুল্লতাত বসন্তরায়ের প্রতি উক্তি

ও ভালবাসা—আত্মপ্রতিষ্ঠার অদম্য কামনা তথা উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অন্যান্য প্রবৃত্তির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় চরিত্রটী চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে নাই (এই কারণেই চরিত্রটী ট্র্যাজেডি-করুণ হইতে পারে নাই)।

তারপর, রাজা বসন্তরায়ের রূপ খুব স্পষ্ট আকার ধারণ করে নাই। প্রতাপের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের এবং অটল সদাশয়তার প্রত্যক্ষ পরিচয় চিত্তাকর্ষক রূপে কোথাও অভিব্যক্ত হয় নাই। যে তন্ময়তা বা সহানুভূতি থাকিলে ব্যক্তির হৃদয়াবেগের তলদেশ পর্যান্ত স্বচ্ছ হইয়া দেখা দেয়, নাট্যকারের মধ্যে সেই তন্ময়তার খুবই অভাব। ফলে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির দৈহিক সত্তা যতটা আছে, মানসিক সত্তা ততটা নাই। তাঁহার হাতে চরিত্রগুলির মুখ যতটা ফুটিয়াছে, হৃদয় ততটা খুলে নাই এবং এই কারণেই নাটকখানিতে হৃদয়াবেগের পরিমাণ (emotional love) অকিঞ্চিৎকর।

এত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রতাপ-আদিত্য নাটকখানি বাঙ্গালীর মঞ্চে ও মনে এখনও সাদরে গৃহীত। আজও আমরা প্রতাপ-আদিত্যকে একান্ত ভাবে স্মরণ করিতে চাহি—স্মরণ করিতে চাহি বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-মহিমাকে তথা নিজেকেই স্মরণ করিতে চাহি। আজও হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের কামনা আমাদের প্রিয়তম জাতীয় কামনা—অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার সাধনা আজও আমাদের শ্রেয়ঃ সাধনা, আজও আমরা প্রতাপাদিত্যের আহ্বান শুনিতে চাই—বাংলা মুলুক হিন্দুর ও নয়, মুসলমানের ও নয়—বাঙ্গালীর। নাটকখানির শৈল্পিক মূল্য ও মহিমা যত কমই থাকুক, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নাটকখানিতে যে ঘটনা ও ভাবনা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাঁহার নিজস্ব আকর্ষণ কম

নহে; নাটকখানি দর্পণের মত বাঙ্গালীর শক্তি ও দুর্ব্বলতা প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু মহাশয় ভূমিকায় এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে (অক্ষরে অক্ষরে মতের মিল না থাকিলেও), "প্রতাপ-আদিত্য নাটকখানি এক হিসাবে আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস। বাঙ্গালীর শক্তি জগতে দুর্লভ, আবার বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্যও চিরপ্রসিদ্ধ, বাঙ্গালী না পারে এমন কার্য্যই নাই, অথচ বাঙ্গালী প্রবর্ত্তিত কোনও মহাকার্য্যেরই শেষ রক্ষা হয় না, কোথা হইতে চরিত্রগত দুর্ব্বলতা ফুটিয়া উঠিয়া সমস্তই পণ্ড করিয়া দেয়। ....বাঙ্গালী-জীবনের এই হর্ষবিষাদ ভরা ইতিহাস, এই আলো-ছায়ার অদ্ভুত সংমিশ্রণ, প্রতাপ-আদিত্যে অতি সুন্দর রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে কি করিতে পারে, আবার কি দোষে তাহার বহুকালের চেষ্টার ফল ব্যর্থ হইয়া যায় তাহা নাট্যকার যথাসম্ভব চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।"

উপসংহারে বলা চলে—নাটকখানি গঠন-পারিপাট্যে, চরিত্র-চিত্রণে, শিল্প-সৌন্দর্য্যে আকর্ষণীয় হইয়া না উঠিলেও ভাব-মহিমার ঐশ্বর্য্য নাটকখানির কম নহে। অধিকন্তু ইহার "বিষয়-বস্তুর" নিজস্ব এমন একটী আকর্ষণ আছে যাহা বাঙালীর চিত্তে অদ্ভুত উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়া থাকে। বিষয়-বস্তুর নিজস্ব মহিমা, কৌতূহল জনক ঘটনা-বিন্যাস এবং বহুকাম্য ভাব-বৈভব—এই তিনটী বিষয়ের সমাবেশে নাটকখানির সামগ্রিক আবেদন এবং এই আবেদনের মাত্রা সাধারণ চিত্তকে সহজেই আকর্ষণ করিতে পারে।

আলমগীর নাটকের ঐতিহাসিক উপাদান

নিম্নের আলোচনা শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ
সরকার মহাশয়ের History of Aurangzib,
vol III, অবলম্বনে লিখিত।

যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পরেই (১৬৭৮ খ্রীঃ, ২৮শে নবেম্বর ১০ই পৌষ, ১৭৩৫ সংবৎ) ঔরংজীব ১৬৭৯ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে মাড়োয়ার অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে আজমীর পৌঁছিলেন এবং খান-ই-জামান এবং তাহির বেগকে যোধপুরে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। এই সময় লাহোর হইতে সংবাদ আসিল—যশোবন্ত সিংহের তুইটী পুত্র-সন্তান জন্ম লাভ করিয়াছে; কিন্তু ঔরংজীবের নীতির কোনও পরিবর্ত্তন হইল না—মাড়োয়ারে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

তখন, মাড়োয়ারের রাঠোর বীরগণ যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিত সিংহের দাবী উপস্থাপিত করিতে দিল্লী গমন করিলেন কিন্তু তাহাতেও কোনও ফল হইল না। ঔরংজীব মাড়োয়ারের অধিকার ইন্দ্রসিংহকে দান করিলেন (২৬শে মে, ১৬৭৯)। রাঠোর বীরগণ হতমান ও প্রত্যাখ্যাত হইলেন বটে, কিন্তু মনের তেজ একটুও হারাইলেন না; তুর্গাদাসের নেতৃত্বে তাঁহারা মোগল সৈন্তের অগণ্য সংখ্যার দৃঢ় ব্যূহ ভেদ করিয়া দিল্লী হইতে অজিত সিংহকে ছিনাইয়া লইয়া আসিলেন। এই সংবাদ মাড়োয়ারে পৌঁছিতেই রাঠোর বীরগণ কঠোর আক্রমণে মোগলদিগকে বিতাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। মোগল-প্রতিনিধি দিনদার খান নাগোরে

পলাইয়া গেলেন—'মৈর্ত্তা' ও 'শিওনা' মোগলের গ্রাস হইতে মুক্ত হইল।

এইভাবে মুখের শিকার যাওয়ায় ঔরংজীব যত স্তম্ভিত, তত ক্ষিপ্ত হইয়া প'ড়িলেন সরবুলন্দ খানের অধীনে বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিলেন এবং এক পক্ষ পরেই নিজেই তিনি আজমীরে যাইয়া শিবির স্থাপন করিলেন। অন্যান্য প্রদেশ হইতে সৈন্য আনিয়া বলবৃদ্ধি করিতে এবং মোহম্মদ আকবরের নেতৃত্বে এবং তয়ব্বর খানের নায়কত্বে অভিযান চালাইতে লাগিলেন। একটী খণ্ড যুদ্ধের পরেই রাঠোরগণ গেরিলা-যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

ঔরংজীব মাড়োয়ারে অত্যাচার ও পীড়নের তাণ্ডব তুলিলেন। উদয়পুরের মহারাণা কোন মতেই উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। অজিত সিংহের মাতা একে মেবারী কন্যা, তারপর আশ্রয়-প্রার্থিনী; মহারাণা অজিতকে আশ্রয় দিলেন এবং অবশ্যম্ভাবী মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য শক্তি সংহত করিলেন। ১৬৭৯ খ্রীঃ উদয়পুরের সহিত ঔরংজীবের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাধিয়া গেল।

১৬৭৯ খ্রীঃ ঔরংজীব উদয়পুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হাসান আলি খান সাত হাজার অগ্রগামী সৈন্যসহ প্রধান সেনাবাহিনীর জন্য পথ প্রস্তুত করিতে রাণার রাজ্যে প্রবেশ এবং আনুষঙ্গিক লুটপাট করিতেও লাগিলেন। রাণা দেখিলেন, সমতল ক্ষেত্রে মোগল বাহিনীর সন্মুখীন হওয়া আর আত্মক্ষয় করা একই কথা। এই কারণে তিনি সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রজাদের সরাইয়া পার্ব্বত্য দুর্গের মধ্যে লইয়া গেলেন। 'দোবারী' গিরিপথ হইতে উদয়পুর পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত প্রদেশ বাদশাহের হস্তগত হইল—এক রকম বিনা যুদ্ধেই পরিত্যক্ত উদয়পুর নগরী মোগলগণ অধিকার করিল (৪ঠা জানুয়ারী, ১৬৮০) এবং বহু মন্দির ধ্বংস করিয়া ফেলিল।

হাসান আলি খান রাণার অনুসন্ধানে পার্ব্বত্য প্রদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিখোঁজ হইয়া গেলেন। মোগল-শিবিরে দারুণ উৎকণ্ঠা দেখা দিল। কেহই সাহস করিয়া ভিতরে যাইতে চাহে না—এমন অবস্থা। জনৈক তুরানী সহ সেনাপতি মীর সিহাবুদ্দিন অতি সাহসে ও কৌশলে হাসান আলি খানের সন্ধান উদ্ধার করিলেন। হাসান আলির সৈন্যবল আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইলে তিনি মহারাণার শিবির আক্রমণ করিলেন এবং উদয়পুরের ১৭৩টী মন্দির ধ্বংস করিলেন। অন্যদিকে "চিতোর"ও মোগল-অধিকৃত এবং তথাকার ৬৩টী মন্দির ধূলিসাৎ হইল। মেবারের শক্তি পর্য্যুদস্ত হইয়াছে মনে করিয়া ঔরংজীব (২২শে মার্চ্চ) আজমীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই মনে করাই ঔরংজীবের হিসাবের বড় ভুল। মেবার ও মাড়োয়ারের মধ্যে যে আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণী তাহাই ছিল মহারাণার প্রধান ঘাঁটি। মহারাজের বড় সুবিধা ছিল এই যে তিনি ইচ্ছামত পূর্ব্বে বা পশ্চিমে যে-কোন দিকে আক্রমণ করিতে পারিতেন। কিন্তু মোগল পক্ষে উদয়পুর, রাজসমুদ্র ও দেওসুরি এই তিনটী প্রবেশপথ অধিকার না করা পর্য্যন্ত মাড়োয়ার এবং মেবারের সহিত সংযোগ রক্ষা করা অসম্ভব ছিল।

মোগলগণের সম্মুখে সংযোগ রক্ষার সমস্যা বড় সমস্যা। ঔরংজীব আজমীরে ফিরিয়া যাইতেই রাজপুতগণ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন এবং চারিদিক দিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। আকবরের শিবির একদিন হঠাৎ আক্রান্ত হইল, মহারাণা পার্ব্বত্য শিবির হইতে অবতরণ করিয়া "বেদনোর" জিলায় অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন; এমন কি, আজমীরের সহিত আকবরের সংযোগ-পথ বন্ধ হয় হয় এমন অবস্থা সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন। মোগল

শিবিরে মহাতঙ্ক দেখা দিল। আকবর মহারাণার আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ভীমসিংহ ঝড়ের মত এক এক স্থানে আক্রমণ করিয়া মোগল সৈন্য নষ্ট এবং শিবির বিশৃঙ্খল করিতে লাগিলেন এবং মোগল-সেনাপতিরা ভয়ে অসাড় হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন ('Our army is motionless through fear'—so Akbar complains)। ক্রোধে ও ক্ষোভে ঔরংজীব অস্থির হইয়া আকবরকে মাড়োয়ারে সরাইয়া দিলেন এবং কুমার আজমকে চিতোরে অধিনায়ক করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার পরিকল্পনা ছিল—পূর্ব্ব হইতে আজম দোবারি গিরিপথে, উত্তর হইতে মোয়াজ্জম সমুদ্রপথে এবং পশ্চিম হইতে আকবর দেওসরি গিরিপথে আক্রমণ চালাইবেন। কিন্তু আজমের ও মোয়াজ্জমের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল এবং আকবর কিছু কাল যাইতে না যাইতেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসিলেন।

মাড়োয়ারে যাইয়া আকবর 'সোজাত'-এ ঘাঁটি করিলেন এবং 'নাদোল' (গঙ্গোয়ার জিলার প্রধান সহর) অধিকার করিয়া সেখান হইতে সৈন্যাধ্যক্ষ তয়ব্বর খাঁকে দিয়া 'দেওসুরি' পথে কমলমীর প্রদেশ অধিকার করিবার পরিকল্পনা করিলেন। কিন্তু রাজপুতগণ মোগলদের প্রাণে এমন আতঙ্ক সঞ্চারিত করিয়াছিলেন যে তয়ব্বর খাঁ "নাদোল" যাইবার পথে "ঘারোয়া"তে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেন। বার বার তাগিদের পর তয়ব্বর 'নাদোল' পর্য্যন্ত পৌছিলেন বটে, কিন্তু গিরিপথে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করিলেন। আকবর গিরিপথে প্রবেশ করিতে কঠোর আদেশ দিলেন। অগত্যা তয়ব্বর খাঁ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু ভীমসিংহের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ হইল (ঈশ্বর দাসের ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। ইহার পরেই আকবরের এবং তয়ব্বর খাঁর মধ্যে ভাবান্তর উপ-

স্থিত হইল—তয়ব্বর খাঁর মাধ্যমে রাজসিংহের সহিত আকবরের কূটনৈতিক সংযোগ স্থাপিত হইল। ১৬৮০ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে তয়ব্বর খাঁ বেশ ঢিল দিলেন, তাঁহার না ছিল কোন উৎসাহ, না ছিল কোন ঐকান্তিকতা। ইতিমধ্যে মহারাণা রাজসিংহ (১৬৮০, ২২শে অক্টোবর) দেহত্যাগ করিলেন, কিন্তু কোন পক্ষই অস্ত্র ত্যাগ করিল না। ঔরংজীবের কড়া তাগিদে আকবর ও তয়ব্বর খাঁ গিরিপথে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন, যুদ্ধও করিলেন এবং ঝিলওয়ারা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াও লইলেন (২২শে নভেম্বর), কিন্তু ১৬৮১ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী আকবর রাজপুতগণের সহিত মিলিত হইয়া পিতার বিরুদ্ধে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং রাজমুকুট ছিনাইয়া লইতে আজমীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তবে যাত্রার ফল ভাল হইল না; আকবর না ছিলেন কৌশলী না ছিলেন একাগ্র উদ্যমী, ফলে নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন, আর বিদ্রোহী ও বিভ্রান্ত তয়ব্বর খাঁ মোগলপক্ষে যোগ দিতে যাইয়া নিহত হইলেন।

এই সময়ে, উভয় পক্ষই সন্ধির জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। বিকানীরের শ্যামসিংহ মধ্যস্থ হইয়া (১৪ই জুন, ১৬৮১) কুমার আজমের সহিত দেখা করিলেন এবং উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি-সেতু স্থাপন করিলেন। বাদশাহ ঔরংজীব নতুন মহারাণা জয়সিংহের নিকট 'শোক পরিচ্ছদ' পাঠাইয়া মহারণা রাজসিংহের মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন করিলেন এবং সন্ধির দুইমাস পরে বীর ভীমসিংহ সম্রাট ঔরংজীবকে সম্মান প্রদর্শন করিতে গেলেন ও মোগলের অধীনে কার্য্যও গ্রহণ করিলেন। ঔরংজীব ভীমসিংহকে রাজা উপাধি দিয়া আজমীরে স্থাপিত করিলেন।

নিম্নে লিপিবদ্ধ ইতিহাস টড সাহেবের রাজস্থান হইতে গৃহীত, কিন্তু ইহা রাজস্থানের আক্ষরিক অনুবাদ নহে।

যখন রাজসিংহ ১৬৫৪ খ্রীঃ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন সম্রাট সাজাহান দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন এবং তাঁহার পুত্রগণ সেই সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে শক্তি-সংগ্রহে ও ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত। দারা, সুজা, ঔরংজীব ও মোরাদ প্রত্যেকেই রাণা রাজসিংহকে পক্ষে টানাটানির জন্য গোপনে চেষ্টা করিতেছিলেন, কারণ প্রত্যেকেই জানিতেন রাজপুতশক্তি যাঁহার পক্ষে যোগ দিবে, তাহারই ভাগ্য সুপ্রসন্ন। শেষ পর্য্যন্ত রাণা দারার পক্ষে যোগ দিলেন, কিন্তু দারার ভাগ্যকে প্রসন্ন করিতে পারিলেন না। ঔরংজীবের ভাগ্যের জোর এত বেশী ছিল যে, সমস্ত সংহত শক্তি বার বার পরাজিত হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত ঔরংজীবই সিংহাসন অধিকার করিলেন (১৬৫৯)।

এই ঘটনার প্রায় বিশ বছর পরে, ঔরংজীবের দুর্নীতির ফলে রাজসিংহকে সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইল। কয়েকটী ঘটনা এমন ভাবে সন্নিপাতিত হইল যে মোগলশক্তির বিরুদ্ধে অসি নিষ্কোষিত করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকিল না। ঘটনাগুলি এই—

কাবুলের অন্তর্গত জামরুদে যশোবন্ত সিংহ এবং দাক্ষিণাত্যে জয়সিংহ প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে ঔরংজীব রাজপুত দমনের গোপন ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলেন। ১৬৭৯, ২রা এপ্রিল তিনি সমস্ত হিন্দুর উপরে 'জিজিয়া কর' ধার্য্য করিলেন এবং ১৫ই জুলাই যশোবন্তের শিশুপুত্র অজিত সিংহকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ দিলেন। আরো একটী ঘটনা এই সময়ে ঘটিয়াছিল। মোগল বাদশাহ রূপনগরের রাজ-কুমারীর পাণিপীড়ন (প্রাণপীড়ন ছাড়া কি) করিবার আগ্রহে

কন্যাটীকে আনিবার জন্য দুই হাজার অশ্বারোহীর এক বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজকুমারী ঘৃণাবশেই অথবা রাজসিংহের প্রতি অনুরাগবশেই করুন, বাদশাহের প্রস্তাব রাজপুতানীর তপ্ত তেজস্বিতা লইয়াই প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং রাণা রাজসিংহের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া পুরোহিতের হস্তে পত্র প্রেরণ করিলেন। রাণা অগত্যা শরণার্থিনীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন এবং মোগল সৈন্যের বিরাট আয়োজন নিষ্ফল করিয়া রাজকুমারীর প্রাণ ও মান উভয়ই রক্ষা করিলেন। শিকারহারা ঔরংজীবের মনে ক্রোধের ও প্রতিহিংসার আগুণ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

এই শোচনীয় পরাজয়—জিজিয়ার বিরুদ্ধে রাজসিংহের বিনয়-মিশ্র তীব্র প্রতিবাদ-পত্র এবং অজিতসিংহকে আশ্রয়দান—এই তিনটী ব্যাপার একযোগে ঔরংজীবকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল—ঔরংজীব মেবার আক্রমণে উদ্যোগী হইলেন। পুত্রদের এবং প্রধান প্রধান সেনাপতিদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। আকবর আসিলেন বাঙ্গালা হইতে, আজিম কাবুল হইতে এবং মোয়াজ্জম আসিলেন দাক্ষিণাত্য হইতে। এই বিরাট সৈন্যবল লইয়া ঔরংজীব মেবার অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন।

ওদিকে রাণা রাজসিংহ আরাবল্লীর শিখর-প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ ও শিবির সন্নিবেশ করিলেন। মোগলগণ সমতল প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন—চিতোর, মণ্ডলগড়, মন্দাসর, জিরণ, এবং অন্যান্য ঘাঁটিও দখল করিলেন। ঔরংজীব দোবারি গিরিপথের সম্মুখে শিবির সংস্থাপিত করিয়া পঞ্চাশ হাজার সৈন্যসহ আকবরকে উদয়পুর অধিকার করিতে পাঠাইলেন। আকবর প্রথমে বিনা বাধায় অগ্রসর হইলেন এবং জনশূন্য রাজধানীতে শিবির স্থাপন করিলেন। তারপর গোগুণ্ডার অভিমুখে অভিযান করিতে যাইয়া আকবর

গিরিপথের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাঁহার আর কোন উপায়ই ছিল না। এমন সময় জয়সিংহের 'অতি-নির্বিচার উদারতা' (ill-judged humanity) আকবরকে শুধু অনশনের এবং আত্মসমর্পণের হাত হইতেই বাঁচাইল না, ঝিলোয়ারার পথে চিতোর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল।*

ওদিকে দিলীর খাঁ মাড়োয়ার হইতে দেউসরি গিরিপথ দিয়া অবাধে অগ্রসর হইতে হইতে বিক্রম সোলাঙ্কি ও গোপীনাথ রাঠোরের কঠোর আক্রমণের সম্মুখীন হইলেন, ("অসম্ভব"— যদুনাথ সরকার বলেন)। ফাল্গুন মাসে (১৬৮০, ফেব্রুয়ারী) রাঠোরদিগের সাহায্যে রাণা দোবারি গিরিপথে ঔরংজীবকে পরাজিত করিয়া চিতোরে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। শ্যামল দাস চিতোর এবং আজমীরের মধ্যবর্ত্তী সংযোগ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঔরংজীব ক্ষুব্ধ চিত্তে আজমীর ফিরিয়া গেলেন। সেখান হইতে তিনি রোহিল্লা খানের অধীনে পুত্রদের জন্য রসদ ও সৈন্য পাঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু খান সাহেবও 'পুর-মণ্ডলে' পরাজিত হইয়া আজমীরে ফিরিয়া গেলেন (সরকার একথাও বিশ্বাস করেন না ;

* শ্রদ্ধেয় যদুনাথ সরকার মহাশয় এই কাহিনী বিশ্বাস করেন না। আর "মানুচি" এ সম্বন্ধে যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও বিশ্বাস করেন না। মানুচি তদীয় "ষ্টোরিও-ডো-মোগর" নামক গ্রন্থে এই ঘটনাটির অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে রাণা স্বয়ং ঔরংজীবকেই আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন—এমন কি উদীপুরী বেগমও রাণার হস্তে বন্দিনী হইয়াছিলেন। রাণা ঔরংজীবকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং উদীপুরীকে সসম্মানে বাদশাহের কাছে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিশেষ লক্ষণীয়:—ওর্মি (Orme) তাঁহার ফ্রাগমেণ্টস্ নামক গ্রন্থে ঔরংজীবকেই অবরুদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

তাঁহার মতে ঔরংজীবের বা আকবরের ঐ ধরণের পরাজয় অসম্ভব)।

রাণার পুত্র ভীমসিংহও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তিনি গুজরাট আক্রমণ করিলেন, ইদর অধিকার করিলেন এবং বহু নগর লুণ্ঠন করিলেন। রাণার দেওয়ান দয়াল সাহ মালব লুণ্ঠন করিলেন এবং জয়সিংহের সহিত যোগ দিয়া কুমার আজমকে আক্রমণ করিলেন ও পলায়নে বাধ্য করিলেন। এইরূপে মেবার মোগল-মুক্ত হইল। ওদিকে ভীমসিংহ, নৈশ আক্রমণে মোগল-শিবির হইতে ৫০০ গবাদিপশু কাড়িয়া লইলেন এবং গণোরাতে আকবরকে ও তয়ব্বর খাঁকে পরাজিত করিলেন।

জয়ের পরে জয়লাভ করায় রাণা উল্লসিত হইলেন এবং আকবরকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইবার উদ্দেশ্যে চক্রান্তের টোপ ফেলিতে লাগিলেন। আকবর টোপ গিলিতে ইতস্ততঃ করিলেন না—পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। আজমীরে ঔরংজীব তখন প্রায় নিঃসঙ্গ। মোয়াজ্জম ও আজিম দূরের পথে অথচ আকবর ছিলেন কেবলমাত্র একদিনের দূরে। ঔরংজীব অগত্যা ছলের আশ্রয় লইলেন—আকবরের নামে পত্র লিখিয়া দুর্গাদাসের শিবিরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। কৌশল ফলিয়া গেল। রাজপুতরা আকবরকে পরিত্যাগ করিলেন, তয়ব্বর খাঁ ঔরংজীবকে হত্যা করিতে যাইয়া নিজেই নিহত হইলেন। ইতিমধ্যে মৌজাম ও আজিম সসৈন্যে উপস্থিত হইতেই ঔরংজীব নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হইলেন। আকবর দুর্গাদাসের সাহায্যে কোন রকমে পলাইয়া মারাঠাবীর সম্ভাজির কাছে গেলেন এবং সে স্থান হইতে ইংরেজ জাহাজে চড়িয়া পারস্যে পাড়ি দিলেন।

এই সময়ে বিকানীররাজ শ্যামসিংহ মধ্যস্থ হইয়া মেবারের সহিত মোগলের সন্ধি সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন।

নাটকে গৃহীত উপাদানের ঐতিহাসিকতা

এ কথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে চারিটী বিচ্ছিন্ন কাহিনীর সমবায়ে আলমগীর নাটকখানি রচিত হইয়াছে—আলমগীরের পারিবারিক ও রাজনৈতিক পরাজয়ের (এবং পরাজয় সত্বেও অপরাজেয়ত্বের) রূপ উপস্থাপিত হইয়াছে। এই চারিটী কাহিনী—(১) রূপকুমারী কাহিনী, (২) ঔরংজীব-উদিপুরী কাহিনী, (৩) ভীমসিংহ-জয়সিংহ কাহিনী, (৪) মাড়োয়ার ও মেবারের বিরুদ্ধে ঔরংজীবের অভিযান কাহিনী। ইহাদের মধ্যে উদিপুরী কাহিনী যেমন বাদশাহ ঔরংজীবের পারিবারিক গণ্ডীর ব্যাপার, তেমন ভীম সিংহ-জয়সিংহ কাহিনীটীও রাণা রাজসিংহের পারিবারিক পরিধির ঘটনা ; আর রূপকুমারী কাহিনী রাজনৈতিক সংঘর্ষ কাহিনীরই একটী উপধারা—মুখ্য রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও ইহা রাজনৈতিক গণ্ডীর মধ্যেই চলিয়া গিয়াছে। এই কাহিনীর একটী বিশেষ অর্থাৎ দ্বৈত মর্য্যাদা আছে। একদিকে রাজকুমারী ঔরংজীবের পারিবারিক পরাজয়ের নিমিত্ত কারণ আবার অন্যদিকে মেবার আক্রমণের অন্যতম কারণও। যাহা হউক উল্লিখিত চারিটী প্রধান কাহিনীর সমবায়ে নাটকখানির কাহিনী গঠিত।

এখন, এই কাহিনীগুলি ঐতিহাসিক কি না এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই যে নাটকখানির ঐতিহাসিকতার সাধারণ রূপ নির্ভর করিতেছে—এ কথা বলাই বাহুল্য। আমরা দেখি,—এই চারিটী কাহিনীই এক হিসাবে ঐতিহাসিক। আণুবীক্ষণিক গবেষণার আলোকে কাহিনীগুলির দুই একটী ভিত্তিহীন বলিয়া ধরা না পড়িতে পারে এমন নহে, কিন্তু বর্ত্তমান ইতিহাসে স্থান দেওয়া হয় না বা চলে না বলিয়াই কোন ঘটনা অনৈতিহাসিক হইয়া যায় না—যদি

মর্য্যাদাশালী কোন বিবরণে উহার উল্লেখ থাকিয়া থাকে তাহা হইলে উহাকে ঐতিহাসিক বলিতে ন্যায়ত আমরা বাধ্য। এই হিসাবে নাটকখানির মূল কাহিনীগুলি ঐতিহাসিকই বটে। রূপকুমারী সম্বন্ধে বা ভীমসিংহের জন্মরহস্য বিষয়ে টড সাহেবের রাজস্থানে স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়, তারপর ঔরংজীবের উদিপুরী সম্পর্কে যে দুর্ব্বলতা ছিল তাহাও ইতিহাস-কথিত—আর মাড়োয়ার ও মেবারের বিরুদ্ধে ঔরংজীবের অভিযান তো আলমগীরের জীবনের অন্যতম প্রধান ঘটনা।

কিন্তু নাট্যকার কাহিনীগুলি যথাযথরূপে প্রয়োগ করেন নাই। কোন কোন কাহিনীকে এত কল্পনা-মাংসল করিয়াছেন যে অনেক পরিমাণে উহা বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। কোনটীর পরিণতি নিজের খেয়ালেই অনৈতিহাসিক করিয়া ফেলিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে রূপকুমারী বৃত্তান্তকে নাট্যকার নাটকে যে রূপ দিয়াছেন তাহাতে অনৈতিহাসিকতার মাত্রা অনেক পরিমাণে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। কামবক্সের রূপনগরের রাজকুমারীর রূপ পরখ করিতে যাওয়া এবং উদিপুরীর শিবিরে রূপকুমারীর 'সম্রাজ্ঞী মা'কে দেখিতে যাওয়া শুধু কল্পনাই নহে, খাঁটি উৎকল্পনা। রূপকুমারী-কাহিনীকে বিস্তার করিবার অধিকার নাট্যকারের অবশ্যই আছে, কিন্তু আছে বলিয়াই তিনি সম্ভাব্যের গণ্ডী মুছিয়া ফেলিতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ ভীমসিংহ-জয়সিংহ কাহিনীর কথা ধরা যাক্। টড সাহেব 'বুনেরা'র রাজার মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন—

"A few hours only intervened between his entrance into the world and that of another son called Bhim. It is customary for the father to bind round the arm of a new-born infant a root of that species of grass called—'*amirdhob*'—the imperishable '*dhob*'......The Rana first

attached the ligature round the arm of the youngest apparently an oversight though in fact from superior affection for his mother. As the boys approached to manhood, the Rana apprehensive that this preference might create dissention, one day drew his sword and placing in the hand of Bhim (the elder) said, it was better to use it at once on his brother than hereafter to endanger the safety of the state. This appeal to his generosity had an instantaneous effect and he not only ratified 'by his father's throne' the acknowledgement of the sovereign rights of his brother but declared to remove all fears—he was not his son if he again drank water within the pass of Dobari.........His cup bearer (panairi) brought his silver goblet filled from the cool fountain but as he raised it to his lips, he recollected.........poured the libation on the earth.........he proceeded to Bahadoor Shah.........but quarrelling with the imperial general he was detached with his contingent west of the Indus where he died.

দেখা যায় রাজস্থানের মতে ভীমসিংহ সিন্ধুতে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু নাটকে দেখা যায় ভীমসিংহ 'দোবারি' গিরিপথে ঔরংজীবের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু সরকার লিখিত *History of Aurangzib* নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়—"Two months after the treaty the heroic Bhim Shimha paid his respects to the emperor and was taken into Mugul service with his son". গ্রন্থের সরকার মহাশয় এই সম্বন্ধেই পাদটীকায় লিখিয়াছেন—Bhim Simha was created a Raja and posted at Ajmer for the war with the Rathors." সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে নাট্যকার ভীমসিংহের যেরূপ পরিণাম ঘটাইয়াছেন তাহা রাজস্থান-সমর্থিত এবং ইতিহাস-কথিতও নহে।

তৃতীয়তঃ বীরাবাঈএর ভীমসিংহের প্রতি স্নেহ-আসক্তি নির্দোষ কল্পনা বটে, কিন্তু 'দোবারী-ঘাটে' (২য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য) বীরাবাঈ যে দৃশ্য দেখাইয়াছেন,—মাতৃত্বের নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি হিসাবে তাহা খুবই চিত্তাকর্ষক হইলেও ঘটনাটীর কোন ঐতিহাসিক বা কিংবদন্তী মূলক ভিত্তি নাই। ঘটনাটী চমৎকার কিন্তু রোমাঞ্চকর। চতুর্থতঃ কামবক্সকে পৌঁছাইয়া দিতে জয়সিংহের সঙ্গে যাওয়া এবং কিছুক্ষণ পরেই অতিনাটকীয়ভাবে ভীমসিংহের ঔরংজীবের সম্মুখে,—বিশেষতঃ দিল্লী-প্রাসাদ-রংমহলএ উপস্থিতি অসম্ভব অতিকল্পনা। নাট্যকারের এই কল্পনার মূলসূত্র খুব সম্ভব টডের রাজস্থান হইতে গৃহীত— অবশ্য উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিয়া। রাজস্থানে পাওয়া যায় যে আকবর যখন গিরিপথে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন জয়সিংহ আকবরকে উদারতাবশে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং চিতোর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়াও দিয়াছিলেন। রাজস্থানের এই কাহিনীটুকু কামবক্সের সহিত জয়সিংহের সঙ্গী হিসাবে যাওয়ার পরিকল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, আর ইহারই সহিত জড়ানো হইয়াছে মানুচির "স্টোরিয়ো-ডো-মোগর" গ্রন্থের বর্ণিত কাহিনী। কথিত আছে একদিন বাদশাহ জয়সিংহের মুখোমুখি পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং উদারতার ছল করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নাট্যকার এই দুই 'কথা'কে একত্র করিয়া যে সমীকরণ করিয়াছেন, তাহা অতিকল্পনায় পরিণত হইয়াছে। রংমহলের মর্য্যাদার দিকে নাট্যকার একটুও দৃষ্টি রাখেন নাই। মোগলের রংমহলকে এত বে-আবরু ও 'বেওয়ারিস' কল্পনা করা সঙ্গত নহে।

পঞ্চমতঃ ঔরংজীবের উদিপুরী দুর্ব্বলতা। রূপনগরের রাজকুমারীর সহিত উদিপুরীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইতিহাস-কথিত না হইলেও অস্বাভাবিক ও অসম্ভব নহে। শেষ বয়সের প্রণয়িনী—'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' উদিপুরী যে নিজ প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার জন্য রূপকুমারীর সহিত

প্রতিদ্বন্দ্বিতা তথা ঔরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। এই হিসাবে উদিপুরীর প্রেমের রাজ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা নির্দ্দোষ পরিকল্পনা। কিন্তু আপত্তি এখানে নহে; আপত্তি এই যে, উদিপুরীকে নাট্যকার একেবারেই বে-আবরু ও বেসামাল করিয়া তুলিয়াছেন। ইতিহাসকার শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—"...Aurangzib's yonngest and best loved concubine Udipuri Mahal, the mother of Kambakhsh...The contemporary Venetian traveller Munuchi speaks of her as a Georgian slave-girl of Dara-Shukho's harem who on the downfall of her first master become the concubine of his victorious rival. She seems to have been a very young woman at the time as she become a mother in 1667, when Aurangzib was verging on fifty. She retaind her youth and influcece over the Emperor till his death and was the darling of his old age. Under the spell of her beauty he pardoned the many faults of Kambaksh and overlooked her freaks of drunkenness which must have shocked so pious a Muslim". নাটকে ঔরংজীবের উদিপুরী মোহ সুন্দরভাবেই দেখান হইয়াছে কিন্তু উদিপুরীকে 'স্থান-কাল-পাত্র' নিরপেক্ষ করিয়া ফেলা হইয়াছে।

ষষ্ঠতঃ মাড়োয়ার অধিকার এবং মেবার অভিযানের কথা:—ইতিহাসে আছে—যশোবন্তের মৃত্যুর পরে দুর্গাদাস অজিত সিংহকে ঔরংজীবের কবল হইতে ছিনাইয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাড়োয়ারের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়। মহম্মদ আকবরের সেনাপতিত্বে এবং তয়ব্বর খাঁর নায়কতায় এই অভিযান অগ্রসর হয়। ইহার কিছুকাল পরেই মহারাণা রাজসিংহ যুদ্ধে যোগদান করেন। মেবার অধিকার করিবার জন্য ঔরংজীব প্রায় সর্ব্বশক্তি নিযুক্ত করিলেন কিন্তু তাঁহার

বাসনা পূর্ণ হইল না। কেহ কেহ বলেন—ঔরংজীব নিজেই গিরি-পথের মধ্যে বন্দী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং রাজসিংহ উদারতাবশে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন (যেমন মানুচি, ওর্মি প্রভৃতি)। এই কথা অনেক ঐতিহাসিক অস্বীকার করিলেও ইহার ঐতিহাসিকতা কাব্যের ক্ষেত্রে অন্ততঃ অবশ্য স্বীকার্য্য। তবে ভীমসিংহের জলপাত্রহস্তে প্রবেশ ও অন্তিম শয়ন এবং ঔরংজীবের মুখে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনা অনৈতিহাসিক এবং অসঙ্গত কল্পনা। তারপর সপ্তমতঃ, দিলীর খাঁ'কে যে পরিমাণ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে আকবরের সহিত দিলীর খাঁ'র জামাতা-শ্বশুর সম্বন্ধ বিষয়ে ইতিহাসে কোনও কথাই জানা যায় না। *History of Aurangzib* গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৫২ পৃষ্ঠায় আকবরের ইতিহাস যেটুকু দেওয়া হইয়াছে তাহাতে এ সম্পর্কের কোন আভাসই নাই। তারপর ঔরংজীবের ওয়াজিরের (প্রধান মন্ত্রী) তালিকায় যে কয়জনকে পাওয়া যায়, ফাজিল খান, জাফর খান (১৬৬৩-৭০), আসাদ খান (১৬৭৬ হইতে ৩১ বৎসর) তাঁহাদের মধ্যে দিলীর খাঁর নাম নাই, তারপর বক্‌শিদের নামের তালিকায়ও তাঁহার নাম নাই। অন্যান্য খান-ই-সামান, 'সদর-উস্-সাদুরস' কাজী প্রভৃতির তালিকাতেও দিলীর খাঁকে পাওয়া যায় না। দিলীর বড় যোদ্ধা ছিলেন এবং দারার পক্ষ ত্যাগ করিয়া ঔরংজীবের পক্ষে যোগ দিয়া ছিলেন। রাজপুত-যুদ্ধের সময় দিলীর খাঁ উত্তরভারতে ছিলেন—ইতিহাসের সাক্ষ্যে এই সংবাদই পাওয়া যায়। ১৬৭৭ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে ঔরংজীব খান-ই-জাহানকে দাক্ষিণাত্যে হইতে ডাকিয়া পাঠান এবং দিলীর খাঁকে দাক্ষিণাত্যে পাঠাইয়া দেন। উক্ত খান-ই-জাহানই মাড়োয়ারে অভিযান চালাইয়াছিলেন। অতএব দিলীর খাঁকে অত অন্তরঙ্গ করিয়া অঙ্কন করিবার কোন হেতু নাই। ১৬৭৬ খ্রীঃ ৮ই অক্টোবর হইতে পরবর্ত্তী ৩১ বৎসর পর্য্যন্ত আসাদ

খান উজীর (প্রধান মন্ত্রী) ছিলেন অর্থাৎ রাজপুত-যুদ্ধের সময়ে দিলীর খাঁ উজীর ছিলেন না। সুতরাং দিলীর খাঁ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ইতিহাস-সম্মত নহে।

তারপর উদিপুরীর ঐতিহাসিক পরিচয়। নাটকে উদিপুরীকে "আরমানী বিবি" বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ইতিহাসে নানা মত দেখা যায় : ঔরংজীবের সমসাময়িক ভিনিসীয় ভ্রমণকারী মানুচির মতে উদিপুরী দারাশিকোর হারেমের দাসী-কন্যা, জাতিতে জর্জ্জীয়, ওর্মির মতে সিরকাশিয়ান, টড সাহেব ওর্মির মত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন— "Orme calls her a Cashmerian, certainly she was not a daughter of the Rana's family. Though it is not impossible she may have been of one of the great families of Shahpura or Bunera (then acting independently of the Rana) and her desire to burn shews her to have been Rajpoot". দেখা যাইতেছে টড সাহেব উদিপুরীকে রাজপুত কন্যাই বলিতে চাহেন। ঐতিহাসিক সরকার টডের মত গ্রহণীয় বলিয়া মনে করেন না। যাহাই হউক, উদিপুরীকে 'আরমানী বিবি' বা 'কাশ্মিরী বেগম' বলায় অনৈতিহাসিকতা-দোষ ঘটে নাই।

উপসংহারে বলা যায় যে, নাটকখানি যে কয়টী কাহিনীর সমবায়ে রচিত, উহারা মূলতঃ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু নাট্যকার অতিকল্পনা দ্বারা উহাদের ঐতিহাসিক বিশুদ্ধি অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। নাটকের চরিত্রগুলির প্রায় সব কয়টীই নামতঃ ঐতিহাসিক এবং কার্য্যতঃ আতিশয্য দোষে দুষ্ট হইলেও প্রায়-ঐতিহাসিক। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে পুরোহিত দীপচাঁদ নামতঃ অনৈতিহাসিক কিন্তু কার্য্যতঃ ঐতিহাসিক এবং নারী-চরিত্রের মধ্যে 'সুজাতা' নামে ও কার্য্যে নিছক কাল্পনিক।

আলমগীরের সাধারণ সমালোচনা

'আলমগীর' পঞ্চাঙ্ক একখানি ঐতিহাসিক নাটক *—দিল্লীর বাদশাহ ঔরংজীবের—দিগ্বিজয়ী আলমগীরের জীবনের পারিবারিক ও রাজনৈতিক ঘটনার উপাদান-সমবায়ে রচিত। বলা যাইতে পারে যে, 'কাশ্মীরী বেগম' তরুণী ভার্য্যা উদিপুরীর সহিত কৌশল-দ্বন্দ্বে বা শক্তি-প্রতিযোগিতায় এবং মেবারের রাণা রাজসিংহের সহিত রাজনৈতিক এবং সামাজিক দ্বন্দ্বে অপরাজেয় আলমগীরের শোচনীয় পরাজয় সত্ত্বেও অপরাজেয়ত্ব দেখান তথা তাঁহার অদ্ভুত জটিল ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ করা নাটকখানির মুখ্য উপস্থাপ্য। পারিবারিক ও রাজনৈতিক ঘটনাগুলি মনে হয় নাটকের বহিরঙ্গ, নাটকখানির অন্তরঙ্গ আকৃতি ঔরংজীবের জটিল ও বহুরূপী ব্যক্তিত্বের নানামুখী অভিব্যক্তি-পরম্পরা —পরাজয়ের ভিতর দিয়া অপরাজয়ত্বের প্রতিষ্ঠা। নাটকখানিতে ১৬৭৮ খ্রীঃ হইতে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দুই বৎসরের রাজনৈতিক ঘটনাকে মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এই মূল ভিত্তির

* এই নাটকখানি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর "বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল কোম্পানী কর্তৃক (ম্যাডান থিয়েটার কোম্পানীর বাঙ্গালা বিভাগ) প্রথম অভিনীত হয়! নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হন (অধ্যাপক) শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম. এ, এবং এই অভিনয়েই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁহার প্রথম ও শুভ অবতরণ।

[প্রথম রজনীর পাত্র-পাত্রী : আলমগীর—শিশির ভাদুড়ী, এম.এ, রাজসিংহ—প্রবোধ বসু, গরীব দাস—নৃপেন বাবু, ভীমসিংহ—সত্যেন দে, দয়াল সা—শীতল, কামবক্স—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, রামসিংহ—গোপাল ভটাচার্য্য, বীরাবাঈ—বসন্তকুমারী, রূপকুমারী—প্রভা।]

সহিত আনুষঙ্গিক রূপে রূপকুমারী-কাহিনী, ভীমসিংহ-জয়সিংহ-কাহিনী এবং উদিপুরী-কাহিনীকে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে, নাটকখানির মূল কাহিনী-উপাদান প্রধানতঃ চারিটী—(১) আলমগীর-রাজসিংহ-কাহিনী, (২) আলমগীর-উদিপুরী-কাহিনী, (৩) রূপকুমারী-কাহিনী এবং ভীমসিংহ-জয়সিংহ-কাহিনী।

নাটকে দ্বিবিধ দ্বন্দ্বের অবতারণা করা হইয়াছে এবং একই কালীন পরিসরে করা হইয়াছে। এই দ্বন্দ্বের একটীর নাম দেওয়া যায়—পারিবারিক আর একটী রাজনৈতিক। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র আলমগীরকে এই দুইটী দ্বন্দ্বের সম্মুখীন করা হইয়াছে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে আলমগীরের প্রতিযোগী তাঁহারই মোহিনী প্রেয়সী উদিপুরী—দেহের রূপে, মনের গুণে বিমোহিনী উদিপুরী। এই উদিপুরীর রূপের অহংকার ভাঙ্গিবার জন্য আলমগীর রূপনগরের রূপকুমারীকে অন্তঃপুরে আনিবার যে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, দৃঢ়তর সঙ্কল্পের সহিত উদিপুরী অপরাজেয় আলমগীরের সে সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন, অপরাজেয়কে সত্যই পরাজিত করিয়াছেন। আর রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে আলমগীরের সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী—রাজপুত-গৌরব মহারাণা রাজসিংহ—অপরাজিত রাজসিংহ। রূপকুমারীকে ছিনাইয়া লইয়া রাজসিংহ আলমগীরের মুখের গ্রাসই কাড়িয়া লইয়াছিলেন আর যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিতসিংহকে আশ্রয় দিয়া এবং জিজিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র পাঠাইয়া আলমগীরের আলমগীরত্বকেই ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আলমগীর সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াও এই দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিতে পারেন নাই—দেবগিরি গিরিগুহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পিপাসায় আর্ত্তনাদ ও রাজসিংহের কাছে অনুচ্চারিত বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। এই দুই ক্ষেত্রের পরাজয়ই নাটকের উপস্থাপ্য বহিরঙ্গ।

নাটকখানির শ্রেণী-পরিচয়

ভারতীয় সাহিত্য বিচারের পদ্ধতি অনুসরণ করিলে আমাদের নাটকখানির প্রধান রসটী নির্দ্ধারণ করিতে হইবে—'কোন্ রসের নাটক ?'—এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। অন্যভাবে বলা যায় যে—নাটকখানির কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরিণাম আমাদের যে বিশেষ ভাবটী উদ্রিক্ত করিয়া থাকে, সেই ভাবটীকে নির্ণয় করিতে হইবে। কেবলমাত্র সুখ-পরিণাম বা দুঃখ-পরিণাম—এই দুইভাগে ভাগ করাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নহে, যে বিশেষ স্থায়িভাব নাটকটীর ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়া ব্যক্ত বা রসতা প্রাপ্ত হইয়াছে সেই বিশেষ স্থায়িভাবটীকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে—উপলব্ধি করিতে হইবে— "the main spirit" বা "impression"কে ("*the unity of impression* which the auther always strives to produce"—Sarcey in *A theory of the Theatre.* *

প্রশ্ন এখন এমন কোন স্থায়িভাব নাটক হইতে পাওয়া যায় কি না ? কেহ হয়ত বলিবেন যে এই ধরণের কোন বিশেষ ভাব প্রধান হইবেই এমন কি কথা আছে ? আধুনিক অনেক নাটকে চরিত্র-বিশ্লেষণ করিবার অথবা সমস্যা সমাধানের ঝোঁক অত্যধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং এই সকল নাটকে রস-সৃষ্টির দিকে যতটা লক্ষ্য না থাকে, বিশ্লেষণ ও সমাধানের বা প্রচারের দিকে ততোধিক লক্ষ্য থাকে। এই সকল নাটকে কোন একটী ভাব স্থায়ী বা প্রধান হয় এমন কথা বলা চলে না ; অতএব রসের প্রশ্ন সব ক্ষেত্রে না তুলাই উচিত। নাটক রসাত্মক হইবেই এমন কি কথা ?

* It is rather interesting to note that, their insistence on impression, these modern critics were anticipated by the ancient writers on Sanskrit drama—"The theory Drama" By A. Nicoll.

এই ধরণের যুক্তির আপাত-ঔজ্জ্বল্য যতই থাক, আমার মনে হয়, ইহার ভিত্তি খুব পাকা নহে। চরিত্র-বিশ্লেষণ, চরিত্র-সৃষ্টি, সামান্য-উপস্থাপন কাব্য সৃষ্টির উপায়, লক্ষ্য নহে। চরিত্র-সৃষ্টি বলিতে কয়েকটী প্রধান ভাববন্ধের (dominant sentiment) প্রবণতার ফলে, ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কি কি ভাবে আচরণ করে না করে তাহাঃ রূপায়িত করা বুঝায়। আর সমস্যা উপস্থাপনা তখনই কাব্য বলিয়া গৃহীত হয়, যখন সমস্যাটী ব্যক্তির চরিত্রের মধ্য দিয়া উপভোগ্য রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং, 'ভাব'বিহীন চরিত্র অসম্ভব এবং সেই কারণে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মধ্যে প্রধান 'স্থায়িভাব' পাওয়া একেবারে অসম্ভব হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে সমালোচক এলারডাইস্ নিকলের কথা স্মরণ করা যায়। Unity of impression সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি আধুনিক সমালোচকদের 'impression'-প্রবণতার উল্লেখ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন—"This however, may be said :—'That every great drama shows a subordination of the particular elements of which it is composed to some central spirit by which it is inspired and that any drama which admits emotion not so in subordination to the main spirit of the play will thereby be blemished." সমালোচক নিকল সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রের আলোচনা-পদ্ধতিকে "Oriental Approach" বলিয়া শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"This system of Oriental Approach is in essential agreement with that of those who emphasise all-important the 'idea' or "impression" received from witnessing a dramatic "work of art"

যাহাই হউক, আলমগীর নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও উহার প্রধান ভাব আছে এবং চরিত্রটীর প্রধান ও স্থায়িভাব—"উৎসাহ" —বীর রসের স্থায়িভাব। এই স্থায়িভাবটীই যে আলমগীর চরিত্রের মধ্যে অভিব্যক্ত বা নিষ্পন্ন হইয়াছে নাটকের দৃশ্যগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই উপলব্ধি করা যায়। দিগ্বিজয়ীর অটল অভিযান, অকম্পিত আত্ম-প্রত্যয় ও নির্ভীকতা এবং সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি-শক্তি ও কৌশল আলমগীর চরিত্রের দুর্ভেদ্য বর্ম্ম—প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বর্ম্ম কখনও আলমগীরের দেহ হইতে বিচ্যুত হয় নাই—এমন কি পরাজয়ের দুর্দ্দিনেও নহে। পরাজয়ের পরিবেশেও আলমগীর এমন দৃঢ়ভাবে তাঁহার অপরাজেয়ত্বকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন যে পরাজয়ই যেন পরাজিত হইয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্তের অভাব নাই—চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে যেখানে ঔরংজীব কোন বাহিরের শত্রু দ্বারা নির্জ্জিত নহেন, যেখানে আপনার নির্জ্জন সত্তার হস্তেই নিজে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত, সেখানেও আলমগীর নিষ্প্রভ হইয়া পড়েন নাই—আত্মপ্রত্যয়ের গরিমা-দীপ্তিতে পূর্ব্বের মতই তিনি ভাস্বর। চিরবিজয়ীর অটল আত্মপ্রত্যয়—"পুণ্য তো আছেই এবং চিরদিন থাকবে। আমার সাহস আছে এবং চিরদিনই থাকবে। সে সাহসের মালিক দুনিয়ায় একমাত্র আমি।" *

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে—একটী মাত্র কথা ক্ষণপ্রভার দীপ্তিতে সমগ্র চরিত্র-ভূমিকে উদ্‌ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। ভীমসিংহ যখন বলিলেন—"যদি দুর্ভাগ্যবশে এই অস্ত্র আপনার বিরুদ্ধে উত্তোলন

* জুলিয়াস সিজারকে মনে পড়ে—
......danger knows full well
That Caesar is more dangerous than he :
We are two lions littered in one day,
And I the elder and more terrible.

করি ?" —আলমগীর শুধু বলিলেন—"ক্ষুদ্র বালক ! আমি আলমগীর ! 'আমি আলমগীর !' —এই একটীমাত্র কথা চরিত্রটীর বজ্রকঠোর আত্ম-বিশ্বাসকে—সমগ্র সত্তাকে যেন এক নিঃশ্বাসে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। *

তারপর, পঞ্চম অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যে—দিলীরও সুন্দর আলোক-পাত করিয়াছেন—"আপনার তুল্য নির্ভীক পুরুষ এ জগতে আর আছে কি না জানি না।" শেষ দৃশ্যে (পঞ্চম অঙ্ক, দ্বাদশ দৃশ্য) দোবারি গুহাপথের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় আলমগীর যে অনমনীয় ইস্পাত-সুকঠিন মেরুদণ্ডের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর বীরত্বেরই দীপ্ত প্রকাশ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তিনি মৃত্যুকে শাসাইয়াছেন—নির্ভীকতা ও আত্মপ্রত্যয় যেন তাঁহার সত্তা হইতে দীপ্ত তেজে বিচ্ছুরিত হইয়াছে—"দাঁড়াও মৃত্যু দূরে—আমি আলমগীর। পরাজিত অবস্থায় আলমগীর কখনও মরতে পারে না—

"না—না—আমি আলমগীর !" এই উক্তি নির্ভীক বীরত্বের প্রদীপ্ত শিখা। অপরাজেয় বীরত্ব শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত আলমগীরের মধ্যে অস্থিরভাবে বিরাজ করিয়াছে এবং সেই কারণেই পরাজিত হইয়াও আলমগীর অপরাজেয়ই রহিয়া গিয়াছেন।

এই হিসাবে, বলা যায় যে উৎসাহই আলমগীরের প্রধান স্থায়িভাব এবং নাটকখানি, আপাত-দৃষ্টিতে অন্যরূপ মনে হইলেও, প্রকৃতিতে 'বীর-রসাত্মক'।

* ম্যাক্‌বেথের উক্তিই যেন উহ্য রহিয়াছে—
—The mind I sway by and the heart I bear
Shall never sag with doubt nor shake with fear.

আলমগীর ট্রাজেডি না কমেডি

আলমগীর নাটকখানির শ্রেণী-পরিচয় করা বেশ একটু দুঃসাধ্য ব্যাপার, কারণ নাটকখানি আকৃতিতে একরূপ, প্রকৃতিতে অন্যরূপ। নাটকখানির মধ্যে আপাতঃ যাহা চোখে পড়ে, তাহা আলমগীরের পরাজয়—পারিবারিক ক্ষেত্রে উদিপুরীর কাছে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেবারের রাণা রাজসিংহের কাছে। উদিপুরী প্রেমের রাজ্যে আধিপত্য রক্ষা করিতে আলমগীরের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল আর রাজসিংহ যশোবন্তের পুত্র অজিতসিংহকে আশ্রয় দিয়া এবং জিজিয়া করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করিয়া আলমগীরের বিরুদ্ধাচরণ তথা আলমগীরত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন—আলমগীরের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই উভয় ক্ষেত্রেই আলমগীর কার্য্যত পরাজিত সুতরাং নাটকখানির কেন্দ্রীয় চরিত্রে দ্বন্দ্ব-সমস্যার তৃপ্তিকর সমাধান ঘটিয়াছে এ কথা বলা যায় না। কারণ প্রতিক্ষেত্রেই তিনি পরাজিত।

বাস্তবিক নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র আলমগীর আত্মিক ভার-সাম্যের হিসাবে একটী বিপর্য্যস্ত ব্যক্তিত্ব—(Frustrated Soul). কি পারিবারিক ক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কোন ক্ষেত্রেই তিনি বাধা অতিক্রম করিতে পারেন নাই, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁহার ভাগ্যে পরাজয়—অধিকন্তু মনোবিকারের প্রকোপে চরিত্রটী অপ্রকৃতিস্থ, এক সত্তার (নির্জ্ঞান-আসংজ্ঞান) কাছে তাহারই অন্য সত্তা শোচনীয় ভাবে নির্জ্জিত। জাগ্রত অবস্থায় আলমগীর প্রবল-প্রতাপ কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায়—"এক একদিন এক একটা মশার গানেও···শিউরে উঠেন···"। তাহার আত্মা অন্তর্বিরোধে খণ্ডিত। উদিপুরীর ভাষায় বলা যায়—তাঁহার মধ্যে—"দু'টো মানুষ আছে। একটা নকল আলমগীর, একটা আসল। নকলটা যখন ঘুমায়

তখন আসলটা জেগে ওঠে। আবার নকলটা যখন জাগে তখন আসলটা গভীর নিদ্রায় ডুবে যায় ; বাইরে তার অস্তিত্বের কিছু চিহ্ন থাকে না।" এই দিক দিয়া চরিত্রটীর ব্যক্তিত্বে অন্তর্বিচ্ছেদ (dissociation of personality) ঘটিয়াছে দেখা যায় এবং দেখা যায় যে চরিত্রটী শুধু বহিঃশক্তির কাছেই পরাজিত তাহা নহে, নিজের কাছেও নিজে নির্জিত ও লাঞ্ছিত। অতএব, যে আলমগীর চরিত্র একটা অন্তর্ভিন্ন বিপর্য্যস্ত ব্যক্তিত্ব, পারিবারিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই যাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধিরূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই—উদিপুরীর কাছে যিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত, রাজসিংহের হস্তে যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে বন্দী হইয়াছেন এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিতেই যিনি নিজের আসল সত্তার কাছে "কাফের" গালি শুনিয়াছেন—এক কথায় এতদিক দিয়া বিপর্য্যয় আসিয়া যাঁহাকে ঘিরিয়াছে, সেই আলমগীর "শোচনীয়" এ কথা না বলিয়া উপায় নাই। এতবড় একটা প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের শোচনীয় দুরবস্থা—বাস্তবিকই "sight of a losing struggle"—ট্র্যাজেডিরই অনুকূল পরিবেশ। এই হিসাবে, চরিত্রটীকে ট্র্যাজেডি-করুণ বলিবার বেশ একটা ঝোঁক আসিতে পারে ; মনে হইতে পারে যে আলমগীর নাটকখানি ট্র্যাজেডি-করুণ নাটক।

কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার এই যে নাটকখানি 'ট্র্যাজেডি' হইয়া উঠে নাই—উহার পরিণাম বিষাদাত্মক নহে। প্রথমতঃ যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আত্ম-বিদারণের জন্য, উভয় সত্তার সংঘর্ষ ও সংক্ষোভের জন্য করুণ হইয়া উঠে, সেই ধরণের অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকে পাওয়া যায় না। যেটুকু আছে তাহা নাটকখানিকে ট্র্যাজেডির বিষাদময় মহিমা দিতে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা এই

যে, নাটকখানির পরিণাম বিষাদময় বা শোচনীয় নহে। উপসংহারে যদিও আলমগীরকে পরাজয়েরই পরিবেশের মধ্যে দাঁড় করানো হইয়াছে, তবু উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যে আলমগীরের অপরাজেয়ত্বের মহিমাই পরিব্যাপ্ত; অধিকন্তু উভয়পক্ষই (মোগল-রাজপুত) হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনার এমন এক শ্রেয়স্কর ও প্রশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে যে, জয় পরাজয়ের হিসাব-বুদ্ধি মহনীয় একটী চেতনায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

নাটকের উপসংহারে পরাজিত অথচ আত্মিক বলে অপরাজেয় আলমগীর মেবারের মহারাণা রাজসিংহকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। অতএব নাটকখানি ট্র্যাজেডি পরিণাম পায় নাই এবং পায় নাই বলিয়াই—নাটকখানি কমেডি—আরো নির্দ্দিষ্টভাবে বলিলে—ট্র্যাজি-কমেডি, কারণ বহিঃপ্রকৃতিতে ট্র্যাজেডির আবহাওয়া থাকিলেও অন্তঃপ্রকৃতিতে কমেডি।

নাটকখানির সাহিত্যিক স্থান

'আলমগীর' নাটকখানি যে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা এ বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক সমালোচকই একমত। শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"আলমগীর ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে।" বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার ঘোষও লিখিয়াছেন—"আলমগীর ক্ষীরোদ-প্রসাদের কীর্তির বিজয় বৈজয়ন্তী।" বাস্তবিক, আলমগীর নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনার মধ্যে শুধু শ্রেষ্ঠই নহে, এই নাটকে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ নব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। এই নাটকে চরিত্রসৃষ্টি, অন্তর্দ্বন্দ্ব স্ফুরণে এবং রচনাবিন্যাসে নাট্যকার যে ক্ষমতার পরিচয়

দিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বের রচনায় সে ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং এমন কথা বলা যায় যে, আলমগীর ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যকার জীবনে যুগান্তর সূচনা করিয়াছে। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে—তাহাতেও এই কথা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে, 'আলমগীর' নাটকে ক্ষীরোদ-প্রসাদের নতুন শক্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এক কথায় বলা চলে —আলমগীর পাকা হাতের রচনা। এই নাটকে যেমন পাওয়া যায় তাঁহার সমবেদনশীলতার পরিচয়, তেমনি পাওয়া যায় প্রকাশক্ষমতা —কাব্যিক বাগ্‌রীতি —চমৎকার বাগ্‌ভঙ্গিমা।

সমবেদনশীলতার ফলে রাজসিংহ, বীরাবাঈ, ভীমসিংহ, আলমগীর, উদিপুরী প্রভৃতি প্রায় চরিত্রগুলিই অনুভাব-সবল—প্রাণবান্‌ অর্থাৎ ইহারা শুধু কথাই বলে নাই, অনুভবও করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ উন্নত 'ধারণা-শক্তি'র ফলে চরিত্রের মানসিক ও আত্মিক প্রকৃতি জটিলতর ও বিচিত্রতর হইয়াছে এবং এই কারণেই মানসিক ব্যাপকতার ও গভীরতার ফলে বাগ্‌-বিন্যাসেও আসিয়াছে নবতর সংস্থা—নতুন অনুভূতির আকারকে নতুন রীতিতে প্রকাশ করার চেষ্টা। এই নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রকাশ-ক্ষেত্রে, নিও-ক্লাসিকের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া রোমাণ্টিকের সীমানায় প্রবেশ করিয়াছেন। এখানে রাজসিংহ বলেন—"আকাশ সেখানে কখনও মেঘের অবগুণ্ঠন মুখে দেয় না। পাহাড় সেখানে কাঁদতে জানে না। বায়ু সেখানে অগ্নিকণায় নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করে।" এখানে আলমগীরের কথা—"ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, যোগী, সন্ন্যাসী—তাদের মাথার উপর কর! সে টাকা আদায় হয়ে যখন আমার রাজকোষে প্রবেশ করবে—ঘরের এককোণে তার সমস্ত জড় করলেও তা' মেজের সমতলত্ব দূর করতে পারবে না। ....হিন্দুরা আমাকে

গাল দেবে—আমি শুনে হাসবো। মুসলমান আমার জয় ঘোষণা ক'রবে—আমি শুনে কাঁদবো।" এখানে উদিপুরীর বাগ্‌-ভঙ্গিমা—"………পুত্র হ'ল কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য সে আপনার মুখ-সাদৃশ্য লাভ করতে পারলে না। চক্ষুতারকায় সে সেই হ্রদের গাঢ় নীলিমা মাখিয়ে নিয়ে এসেছে। তার বর্ণে কাশ্মীর পাহাড়ের সেই অরুণগর্ভ তুষারশ্রী জড়িয়ে গিয়েছে। তার মুখখানায় সমস্ত অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কাশ্মীর-কুসুমের বিজড়িত রহস্য, তার হৃদয়ে অজস্র উচ্ছ্বসিত সেই সমস্ত কুসুমগন্ধের প্রেরণা। তার রূপের অন্তরাল থেকে কাশ্মীরী প্রকৃতি নিত্য আমাকে শুনিয়ে বলে—আর কেন সখী, ও অসার সৌন্দর্য্যের মাঝে, তুমি ফিরে এস।" এখানে বীরাবাঈ বলেন—"জয়সিংহ! আমি দেখছি প্রভাতের অরুণ আমাকে অঙ্গারবর্ণা প্রেতিনী করবার জন্য উদয়াচলের অন্তরালে বসে এখন থেকেই আমার বুকের রক্ত দিয়ে তার ক্রুদ্ধ চক্ষু রঞ্জিত ক'রছে।" এই ধরণের প্রকাশ-ভঙ্গীর দৃষ্টান্ত বহুস্থলেই পাওয়া যায়। *

দেখা যায়, এই নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ নিবিড়তর সহৃদয়তার, ব্যাপকতর কল্পনা-শক্তির এবং সুষ্ঠুতর প্রকাশ-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়াছেন।

নাটকের নানা রস ও ভাব

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে যে ভাবকে স্থায়িরূপ দেওয়া হইয়াছে তাহার নাম উৎসাহ এবং উহা বীররসেরই স্থায়িভাব।

* এই ধরণের বাগ্‌-ভঙ্গিমা দেখিয়াই ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়া ফেলিয়াছেন—"কয়েকটী নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবে পড়িয়া ক্ষীরোদচন্দ্র সংলাপের ঔচিত্যের ব্যতিক্রম করিয়াছেন। তবে ক্ষীরোদচন্দ্রের ভাষা কুত্রাপি বিজাতীয় হয় নাই"।

অন্যান্য চরিত্রেও এই ভাব পাওয়া না যায় এমন নহে, ভীমসিংহ উহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই রস ছাড়াও নাটকে বাৎসল্যরস, হাস্যরস প্রভৃতিও সৃষ্টি করা হইয়াছে। রাজসিংহের ও 'বীরাবাঈ'-এর মাধ্যমে বাৎসল্য; গঙ্গাদাস, গরীবদাস এবং দয়ালশার মাধ্যমে প্রভুভক্তি ও দেশভক্তি; কামব্‌ক্সের আলম্বনে মাতৃভক্তি; আকবর-মোসাহেব রামসিংহের আশ্রয়ে হাস্যরস এবং উদিপুরীর মাধ্যমে পতি-প্রেম সৃষ্টি করিয়া নানা রসে ও ভাবে নাটকখানিকে নাট্যকার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

আর, ভাবের দিক দিয়াও নাটকখানির আকর্ষণ কম নহে প্রভুভক্তি, দেশপ্রীতি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃবাৎসল্য, উদার মনুষ্যত্বাভিমান, নির্নিমেষ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা নানা চরিত্রের আশ্রয়ে প্রকাশ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ 'জাতির গ্লানির সময় মহাত্মা'র আবির্ভাব ঘোষণা, 'সত্য'কে অস্ত্ররূপে এবং 'ত্যাগ'কে ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিবার অনুপ্রেরণা, অস্ত্রবলের উপরে আত্মবলের মর্য্যাদা স্থাপন—"অন্তরে বাহিরে শুদ্ধি"র আয়োজন—"বিলাসিতাকে কায়মনোবাক্যে ত্যাগ" করার সঙ্কল্প (পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য) যুগমনের প্রভাবে এবং যুগমনকে আকর্ষণ করিতেই উপস্থাপিত হইয়াছে এবং উহারা নাটকখানির ভাব-মূল্যই বৃদ্ধি করিয়াছে। অধিকন্তু হিন্দু-মুসলমান মিলন-মন্ত্রের প্রচার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্যের আকারেই নাটকে স্থান পাইয়াছে। এই উদ্দেশ্যের চাপে ঐতিহাসিক সত্যকে পর্য্যন্ত নাট্যকার বাঁকাইয়া ও বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন—হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রতি উজ্জ্বল আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়া আলমগীরকে দিয়া রাজসিংহকে আলিঙ্গন করাইয়া ছাড়িয়াছেন, তথা যুগের জন্য একটী অতি মূল্যবান এবং অত্যাবশ্যক প্রচারকার্য্য করিয়াছেন।

তারপর, চারণীগণের গীতি (পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য)—'ভাষা

নাহি জানে কথায় বাঁধিতে এ নব জাগর-গান'কে শুধু কথাই বাঁধে নাই সুরে সুরে সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। রাজপুতগণের জাগরণকে উপলক্ষ্য করিয়া নাট্যকার ভারতের নব-জাগরণকে যে বন্দনা করিয়াছেন তাহা ভারতের প্রত্যেকটী হৃদয়কেই স্পর্শ করিয়াছে এবং আজও করে—কারণ "আবাল বৃদ্ধ মায়ের সেবক—মায়ের সেবিকা নারী"! আর আজও সকলে—"বিজয়-নিশান তুলিয়া আকাশে" মাতৃভূমির জয়গান গাহিতে চাহে।

এই ভাব-মূল্য বা বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করিবার প্রসঙ্গেই নাটক-খানির রচনার প্রেরণা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা সুসঙ্গতই হইবে: বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করা—নারীপুরুষ নির্ব্বিশেষে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মদান করা, হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়কে একসূত্রে আবদ্ধ করিয়া জাতীয়তা-বোধকে নিবিড় করিয়া তোলা—মহাত্মা গান্ধীর আত্মবলের সংগ্রামে দেশবাসীর অভূতপূর্ব্ব সাড়া এবং আত্মবলের সংগ্রামের প্রতি জাতির ঐকান্তিক আস্থা ও সহযোগিতা জাগ্রত করা এই সকল সামাজিক প্রেরণার এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব-গভীর চরিত্র সৃষ্টির শৈল্পিক প্রেরণার সংযোগে নাটকখানি রচিত। বলা যাইতে পারে অতীত কাহিনীর কাঠামোতে নাট্যকার বর্ত্তমান ভাবের প্রতিমা গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। আলমগীর পুরাতন হইলেও তাঁহার নানা সত্তার পরস্পরিক দ্বন্দ্ব, (আধুনিক র‍্যাশার এবং রাজপুতদের দেশপ্রাণতা প্রথিত থাকিলেও) মহাত্মার আবির্ভাবের সংকেত (১৯২১ খ্রীঃ নাটকখানি রচিত ও প্রথম অভিনীত), অস্ত্রবল অপেক্ষা আত্মবলের উপর অধিক গুরুত্বারোপ, বিলাসিতা-বর্জ্জন প্রভৃতি দ্বারা বিদেশীয় দ্রব্য বর্জ্জনের নির্দ্দেশ নূতন পরিবেশের প্রেরণা হইতেই আসিয়াছে। যুগ-চেতনার প্রেরণা হইতে আসিয়াছে এমন সব উপাদান বাছিয়া লইলে দেখা যাইবে নাটকখানি

পুরাতন ইতিহাস লইয়া লিখিত হইলেও উহার ভাব ও কল্পনা রচনাকালীন আবহাওয়া হইতেই গৃহীত এবং রচনার প্রেরণাও সেখান হইতেই আসিয়াছে। আর না আসিয়াও পারে না। যুগের ব্যক্ত বা বাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষাকেই সংজ্ঞানে বা অসংজ্ঞানে প্রত্যেক স্রষ্টাই রূপ দিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কারণ সৃষ্টির বড় উদ্দেশ্য আনন্দ দেওয়া এবং ঐ আনন্দ নির্ভর করে ব্যক্তির অর্থাৎ সমাজের বাসনা চরিতার্থ করার উপরেই। যুগের প্রবৃত্তির সহিত যে-রচনার কোন যোগ থাকে না সে-রচনা যুগমনে কোনও আনন্দদায়ক আবেদন জাগাইতে পারে না এবং পারে না বলিয়াই মূল্য-বিচারে হেয় হইয়া থাকে।

নাটকের গঠন-বৈশিষ্ট্য

নাটক-রচনার সময় তিনটী ঐক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য প্রাচীন সমালোচকগণ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। ইহাদের বলা হইয়াছে—(১) কাল-ঐক্য (Unity of Time), (২) স্থান-ঐক্য—(Unity of Place) (৩) বিষয়-ঐক্য (Unity of Theme)। কিন্তু "কাল-ঐক্য" এবং "স্থান-ঐক্য" রীতি বহুকাল আগেই লঙ্ঘিত হইয়া গিয়াছে এবং আজ-কাল রক্ষণ অপেক্ষা লঙ্ঘনের দ্বারাই রীতিটীকে অতি বেশী সম্মান দেখান হয়। তবে 'বিষয়-ঐক্য' রীতি এক হিসাবে 'নাই' আবার অন্য হিসাবে 'আছে'ও বলা চলে। আরিষ্টটল প্রভৃতি বিষয়-ঐক্য বলিতে যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহার হিসাবে 'বিষয়-ঐক্য' রীতিও বহু আগেই লঙ্ঘিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু 'বিষয়-ঐক্য'কে একটু ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিলে দেখা যাইবে যে 'বিষয়-ঐক্য' আজও আছে—রচনার মূল বা প্রধান উদ্দেশ্যের ধারা ধরিয়াই সেই 'ঐক্য' গড়িয়া উঠিয়া থাকে। আধুনিক সমালোচকের অনেকে এই

ঐক্যকেই অন্যভাবে 'Unity of Impression' বলিয়া থাকেন। কিন্তু খাঁটি 'বিষয়-ঐক্য' বলিতে যাহা বুঝায়—অর্থাৎ উপস্থাপ্য বিষয় ছাড়া অবান্তর কোন বিষয়ের অবতারণা করা উচিত নহে, একটী নাটকে একটী বিষয়কেই অভিব্যক্ত করিতে হইবে, এবং অন্য অবান্তর ঘটনা আসিয়া নাটকের মুখ্য ঘটনা-প্রবাহের ধারা বিচ্ছিন্ন না করিয়া ফেলে সে দিকে কড়া দৃষ্টি রাখিতে হইবে—এই 'বিষয়-ঐক্য'ও আজ উপেক্ষিত। আজিকার নাটকে (বাঙলা নাটকে) এই ধরণের 'বিষয়-ঐক্য' দেখা যায় না। বিশেষতঃ ঐতিহাসিক নাটক গুলিতে অবান্তর ঘটনার ভিড় খুবই বেশী—প্রধান কাহিনীর পাশা-পাশি একাধিক অপ্রধান কাহিনীর নিজস্ব নিজস্ব গতিবৈচিত্র্য লইয়া বিরাজ করিয়া থাকে। ফলে দূর-নিকট সকল আত্মীয়-স্বজনের যৌথ পরিবারের মত আকারে যেমন হয় উহা বড় প্রকারে তেমন হয় বিচিত্র। বাংলা নাটক—ঐতিহাসিক নাটক অবশ্য,—এই দিক দিয়া বেশ একটী নূতন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহার কাহিনীর লক্ষ্যাভিমুখী গতি তো থাকেই—উপকাহিনীগুলিও নিজস্ব নিজস্ব লক্ষ্যের দিকে চলে এবং পরিণাম খুঁজিয়া থাকে।

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এই নাটকখানি (আলমগীর) গঠনের দিক দিয়া শুধু যে আকারে বড় এবং প্রকারে বিচিত্র তাহাই নহে, নাটকখানি বিশৃঙ্খল ও 'দ্বৈত-উদ্দেশ্য'ক। ইহা যেন দুই কাণ্ডে বিভক্ত : এক, উদিপুরী-রূপকুমারী কথার পূর্ব্বকাণ্ড; দুই, আলমগীর-রাজসিংহের যুদ্ধের উত্তরকাণ্ড। একটী শেষ হইলে আর একটী কাণ্ড যেন আরম্ভ ও শেষ হইয়াছে। দুইটী উদ্দেশ্য প্রধান হইয়া পড়ায় নাটকখানির 'বিষয়-ঐক্য' খুবই ব্যাহত।

তবে একটী কথা যে এখানে না বলিবার আছে এমন নহে : একই সময়ে পারিবারিক ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে অসম্ভব ঘটনা তাহা

বলা চলে না। এবং এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন এমন কোন চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা করিলেই যদি 'বিষয় ঐক্য' না থাকে, তাহা হইলে বিষয় ঐক্য অপেক্ষা সত্য ও স্বাভাবিককেই বেশী শ্রদ্ধা করা সঙ্গত। কথাটী সত্য, কিন্তু আপত্তি সেখানে নহে, আপত্তি এই যে ঘটনাবিন্যাস এমন হইয়া পড়িয়াছে যে নাটকখানির পর্ব্বভাগ স্পষ্টাকারেই চোখে পড়ে। এবং মনে হয় যে-বিষয়কে প্রারম্ভে বীজরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহা উপসংহার-পরিণাম লাভ করিবার পরে আর একটী আনুষঙ্গিক বিষয় পরিণতি খুঁজিতে চেষ্টা করিতেছে। প্রথম দৃশ্যটীর উপস্থাপনা অন্যরূপ হইলে এবং রূপ-কুমারী কাহিনীকে অত প্রশ্রয় না দিলে নাটকের ঐকিকতা অক্ষুণ্ণ থাকিত—এ অনুমান অন্যায় নহে। তবে একথাও অবশ্য বলা উচিত যে প্রথম দৃশ্যে উদিপুরী অর্থাৎ রূপকুমারী কাহিনী অগ্রাধিকার পাইয়াছে বটে, কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা যে একেবারে শোনা যায় নাই এমন নহে। নাটকের বীজ যে দ্বিমুখী তাহা একটী কথার মধ্যেই পাওয়া যায়— "এত যুদ্ধবিগ্রহের চিন্তার ভিতরেও রূপ-নগরওয়ালীকে আনবার জন্য যদি সম্রাটের ইচ্ছা জেগে উঠে?" কিন্তু দেখা যায়, মুখপাতে উদিপুরীর সঙ্কল্পের উপরেই বেশী পরিমাণে আলোকপাত করা হইয়াছে।

এই ত্রুটি ছাড়াও ঘটনা-বাহুল্য, অবান্তর ঘটনার সমাবেশ নাটক-খানির গঠনগত অন্যতম্ ত্রুটি। ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ঘটনার ভিঁড় এবং ভূমিকার বাহুল্য না থাকিলে নাটকটী উৎকৃষ্ট হইত।" নাটকখানির দৈর্ঘ্য বাস্তবিকই ক্লান্তিদায়ক। এই কারণে কোন্ কোন্ অংশ বাদ দিলে মূল নাটকের সৌন্দর্য্য বা রস-

হানি হইবে না তাহাও নির্দ্দেশিত করা হইয়াছে।* দেখা যায়, প্রায় দৃশ্যেই তারকা চিহ্নিত অংশ আছে এবং দুই একটী গোটা দৃশ্যও বর্জ্জনীয় হইয়া আছে। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে এই সকল অংশ ত্যাগ করিলেও "মূল নাটকের সৌন্দর্য্য বা রসহানি ঘটিবে না'। অতএব অবান্তরের পরিমাণ যে কম নহে বলাই বাহুল্য এবং নাটকখানির গঠন খুব পরিপাটি নহে—এ সিদ্ধান্তও অনিবার্য্য।

নাটকে চরিত্র-সৃষ্টি

নাটক-তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ এলারডাইস নিকল মহাশয় একস্থলে বলিয়াছেন যে, উচ্চাঙ্গের নাটকের বড় বৈশিষ্ট্য—"penetrating and illuminating power of characterisation"—অর্থাৎ অন্তরনুপ্রবেশী ও সমুদ্‌ভাসী চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যে এই ক্ষমতার দৈন্য আছে—পূর্ব্বেই এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং সেখানেই একথা বলা হইয়াছে যে, মাত্র দুই একটী স্থলেই নাট্যকার চরিত্র-সৃষ্টিতে সন্তোষজনক সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। আলমগীর নাটক ক্ষমতা-দৈন্যের সেই ব্যতিক্রম স্থল। এই নাটকে নাট্যকার যেমন দেখাইয়াছেন দ্বন্দ্ব-চেতনা, তেমন দেখাইয়াছেন সহৃদয়তা। তাই প্রায় চরিত্রেরই মন ও হৃদয় বেশ সংলক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে।

রাণা রাজসিংহ : রাণা রাজসিংহের মধ্যে রাণা-সত্তা এবং জনক-সত্তা পরিস্ফুট স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চরিত্রটীকে সুতীব্র ভাবাবেগে প্রাণবান্ করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার দুই সত্তার দ্বন্দ্ব, আপাতবিরুদ্ধ উক্তির মধ্যেই আত্মপ্রকাশের উপায় করিয়া লইয়াছে। অন্তর্ব্বিরোধেরই

* দ্রষ্টব্য : অভিনয়ে সময় সংক্ষেপের প্রয়োজন হইলে *[ ]* অংশগুলি ও চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য পরিত্যাগ করিলে মূল নাটকের সৌন্দর্য্য বা রসহানি ঘটিবে না।

প্রতিফলন ঘটিয়াছে বিরোধাভাসিত বচনভঙ্গীতে। চরিত্রটীর 'অনুভাব' মাত্রা (emotional core) খুবই প্রশংসনীয়। কল্পনা-শক্তিও কম প্রশংসনীয় নহে—অনুভাবের গতির বেগ ও বৈচিত্র্য উপযুক্ত বাচনিক বন্ধেই প্রকাশিত হইয়াছে।

বীরাবাঈ : বীরাবাঈ রাঠোর কন্যা; বীরাঙ্গনা—মহারাণা রাজসিংহের যোগ্যতমা ধর্ম্মপত্নী ; এই পরিচয় অপেক্ষাও বীরাবাঈর আরো একটী বড় পরিচয়—বীরাবাঈ স্নেহময়ী মাতা। সাধারণ মানুষের মোহে তিনি যে ভুল করিয়াছিলেন মায়ের স্নেহের সর্ব্বত্যাগী সাধনা দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। তাঁহার নিজের উক্তিই বড় দিগ্‌দর্শক—"প্রাচীন দেওয়ান! মাথার দিক দিয়ে চেয়ো না। যদি পার একবার হৃদয়ের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। ভীমসিংহকে রাজ্যাধিকারী করতে হয়ত এখনও আমি ইতস্ততঃ করতে পারি, এমন কি বাধা দিতে পারি। কিন্তু যাকে শৈশবে বুকে তুলে স্তন্যদান করেছি, আঠারো বৎসর মাতৃস্নেহে পালন করেছি, দয়াল সা, তার অদর্শনক্লেশ আমি মুহূর্ত্তের জন্য সহ্য করতে পাচ্ছি না।"

চরিত্রটী মাঝে মাঝে অতিমাত্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেও একথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে চরিত্রটীর গুরুত্ব সন্তোষজনক এবং আন্তর চেহারা একহারা নহে। দোষে-গুণে স্বাভাবিকতার গণ্ডীর মধ্যেই উহা রহিয়াছে।.

আলমগীর : তারপর, কেন্দ্রীয় চরিত্র—আলমগীর। চরিত্রটীর পরিকল্পনায় নতুনত্বের মাত্রা খুবই লক্ষণীয়। অন্তর্দ্বন্দ্বে ও বহির্দ্বন্দ্বে চরিত্রটী খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে এবং 'দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব মন্দ ফুটে নাই' (সু-সেন)। কিন্তু মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে আসল-নকলের দ্বন্দ্বটী খুব সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ মানসিক বিক্রিয়ার স্থায়িত্ব ঐরূপ হইতে পারে কিনা এ বিষয়ে প্রশ্নের

অবকাশ আছে। তবে রঙ্গমঞ্চের পক্ষে বিক্রিয়াটুকু খুবই উদ্দীপক এবং শক্তিশালী হইয়াছে—মনস্তত্ত্বের হিসাবে যে ভুলই উহাতে থাকুক। দ্বিতীয়তঃ ঔরংজীবের হিন্দুবিদ্বেষের যে ব্যাখ্যাটী নাট্যকার উদিপুরীর মুখে দিয়াছেন তাহার নতুনত্বের আকর্ষণও কম নহে। উদিপুরীর উক্তিতে—"তাই সে স্বপ্ন-স্মৃতি জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায়! সূক্ষ্ম জলের রেখার মত তার যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তারই আতঙ্কে আপনি কি করবেন কিছু ঠিক করতে না পেরে, সমস্ত ভিন্নধর্ম্মীদের উপর অত্যাচার করেন। মনে করেন—তারা কাফের। তাদের উৎপীড়ন করতে পারলেই আপনি এই আতঙ্কের হাত থেকে নিস্তার পাবেন"—। কাফের উৎপীড়নের যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা অভিনব এবং সেই হিসাবে উহা নাট্যকারের সমীক্ষণ শক্তিরই পরিচায়ক। সচেতন-অবচেতন মনের ক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য সংযোগে ব্যক্তি-চরিত্রের পরিকল্পনায়—ব্যক্তি-চরিত্রকে সচেতন-অবচেতন মানসিক ক্রিয়ার একক ক্ষেত্রে পরিণত করায়—চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতাই নির্দ্দেশিত করে। 'আলমগীর' ক্ষীরোদপ্রসাদের সৃষ্টি-প্রতিভার অপূর্ব্ব নিদর্শন। বাস্তবিক, ব্যক্তিত্বের জটিল রূপ অবধারণ করিবার, চরিত্রে অনুভাব প্রাণ-সঞ্চার করিবার এবং প্রকাশনে কল্পনা-সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার ক্ষমতায় ক্ষীরোদপ্রসাদ অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

তবে নাটকখানির মধ্যে যে যে ত্রুটী পাওয়া যায় তাহাও কম নিন্দনীয় নহে। গঠন-পরিপাট্যের দৈন্য বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ ত্রুটী ছাড়াও নাটকখানির বড় আর একটী ত্রুটী —ঘটনা-বিন্যাসের অযৌক্তিকতা বা অনৌচিত্য। চমক সৃষ্টির দিকে অত্যধিক ঝোঁক থাকায় ঘটনা-বিন্যাসে কার্য্য-কারণ-বাঁধুনি বার বার ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে—স্থান-কাল-পাত্রের ঔচিত্য খুবই উপেক্ষিত হইয়াছে। আর একটী বিষয়ও উল্লেখনীয়—চরিত্রের ভাষায় দুই একস্থলে কৃত্রিম

কল্পনার উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে এবং কয়েকটী চরিত্র নিছক 'ভাবে-ভরা ফানুস' হইয়া পড়িয়াছে—চরিত্রের আচরণে উৎকল্পনার অতিরঞ্জন প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। বিয়োগান্ত হইলে নাটকখানি মেলোড্রামার পর্য্যায়েই স্থান পাইত।

উপসংহারে এ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, ক্ষীরোদপ্রসাদ আর কোন নাটক না লিখিয়া কেবল 'আলমগীর' লিখিলেই নাট্যকার হিসাবে স্মরণীয় হইতে পারিতেন। আর, ত্রুটিবিহীন রচনা যখন এ পর্য্যন্ত একখানিও হইয়াছে কি না সন্দেহ, শেক্সপীয়রের সুবিখ্যাত ট্র্যাজেডিগুলিতেও যখন বহু আপত্তিকর খুঁত রহিয়াছে, তখন উল্লিখিত ত্রুটিগুলির জন্য 'আলমগীর' নাটককে অতি হেয় বলিবার কোন কারণ নাই। এমন অনেক সমালোচকও আছেন যাঁহারা বাংলা সাহিত্যে একখানিও নাটকের মত নাটক চোখে দেখেন না এবং উন্নাসিকের মত বলেন—'বাংলায় নাটক কোথায়?—বাংলায় নাটক একখানিও লেখা হয়নি'। * এই সকল মোহগ্রস্ত দিঙনাগ সমালোচকদের উপেক্ষা করিয়া বাংলার উল্লেখযোগ্য নাটকের তালিকায় 'আলমগীর'কে সসম্মানে স্থান দেওয়া যাইতে পারে এবং এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিবর্ত্তনের ইতিহাসে 'আলমগীর' নাটকের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

* জনৈক বিখ্যাত সমালোচকের সহিত মৌখিক আলাপের অভিজ্ঞতা।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র

(ক) জন্মকাল: ১৮৪৪ খ্রীঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী। (পুরাতন ও নূতনের যুগসন্ধি)।

(খ) পারিবারিক প্রভাব: ( ) মাতার ভাবপ্রবণতা হইতে ভাবপ্রবণতা; (২) খুল্লপিতামহীর প্রভাব হইতে পুরাণাদির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি এবং পুরাণ-কথা শুনিতে শুনিতে হৃদয়ের স্পর্শকাতরতা।

(গ) শিক্ষা-দীক্ষা: (১) "ইংরাজী বিদ্যালয়ের উন্নত শিক্ষা লাভ করা গিরিশের অদৃষ্টে ঘটে নাই। স্কুলের পর স্কুল ঘুরিয়া প্রবেশিকার দ্বার পর্যন্তও যখন পৌঁছিতে পারিলেন না, তখন তিনি পড়াশুনা ছাড়িয়া গৃহে আসিয়া বসিতেই বাধ্য হইলেন"। (২) কিন্তু পরে— "যেমন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শসম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, আর একদিকে তেমনি সেক্স্পিয়র, মোলিয়ার, মার্লো, মিলটন, বেকন, মিল প্রভৃতি কবি, নাট্যকার, সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণের গ্রন্থপাঠ করিয়া পাশ্চাত্য ভাবধারার সহিতও তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন।"

(ঘ) সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল (১৮৫৮ হইতে ১৮৭৭, অর্থাৎ ১৪ বৎসর হইতে সাহিত্যিক জীবনারম্ভ অবধি):—'

সমসাময়িক সাহিত্যিক

(নাটকে)

(১) রামনারায়ণ তর্করত্ন—(১২-১৩ খানি নাটক-প্রহসন) (১৮৫৪ হইতে)

(২) কালীপ্রসন্ন সিংহ—(সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ) (১৮৫৩)
(১৮৪০-৭০)

(৩) মধুসূদন— (নাটক, কাব্যাদি) (১৮৫৯)
(১৮২৪-৭২)

(৪) দীনবন্ধু— (নাটকাদি) (১৮৬০)
(১৮৩৪-৭৩)

(৫) মনোমোহন বসু— (৪ খানি পৌরাণিক নাটক)
(১৮৩১-৬৭)

(৬) হরলাল রায়— (৫ খানি নাটক) (১৮৭৩-৭৫)

(৭) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১৮৭২ হইতে) ২খানি প্রহসন
(১৮৪৮—১৯২৫) ২ " নাটক

(৮) উপেন্দ্রনাথ দাস— (সুরেন্দ্রবিনোদিনী, শরৎ সরোজিনী, দাদা ও আমি)

আরো অনেক অখ্যাত নাট্যকার—

(কাব্যে)

(১) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়— (১৮২৭—১৮৮৭)
- পদ্মিনী—(১৮৫৮)
- কর্ম্মদেবী—(১৮৬২)
- শূরসুন্দরী—(১৮৬৮)
- কাঞ্চী-কাবেরী—(১৮৭৭)

(২) মাইকেল মধুসূদন দত্ত— তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য (১৮৬০)
মেঘনাদ বধ—১ম খণ্ড (১৮৬১)
" ২য় " (১৮৬১)
বীরাঙ্গনা কাব্য—(১৮৬২)
চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী—(১৮৬৬)

(৩) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— (১৮৩৮-১৯০৩)

- চিন্তাতরঙ্গিনী (১৮৬১)
- বীরবাহু কাব্য (১৮৬৪)
- বৃত্রসংহার—(১ম) (১৮৭৫)
- " (২য়) (১৮৭৭)

(৪) নবীনচন্দ্র সেন—(১৮৪৬—১৯০৯)

- অবকাশ রঞ্জিনী (১ম) (১৮৭১)
- " (২য়) (১৮৭৮)
- পলাশীর যুদ্ধ— (১৮৭৫)
- রৈবতক—(১৮৮৬)
- কুরুক্ষেত্র—(১৮৯৩)
- প্রভাস—(১৮৯৬)

(৫) বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী—

- সঙ্গীত শতক ( )
- বন্ধুবিয়োগ—(১৮৭০)
- প্রেম প্রবাহিনী—(১৮৭০)
- নিসর্গ সন্দর্শন—(১৮৭০)
- সারদামঙ্গল— (১৮৭৯)

(গল্পে-উপন্যাসে)

(১) বঙ্কিমচন্দ্র—

- দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)
- কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)
- মৃণালিনী (১৮৬৯)
- চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)
- রজনী (১৮৭৭)
- কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)
- ইত্যাদি

(২) প্রতাপচন্দ্র ঘোষ— বঙ্গাধিপ পরাজয় (১৮৬৯)

(৩) রমেশচন্দ্র দত্ত— (১৮৪৮-১৯০৯)

- বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪)
- সংসার (১৮৭৫)

মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭)
জীবনপ্রভাত (১৮৭৮)
জীবন-সন্ধ্যা (১৮৭৯)
সমাজ (১৮৯৪)

(৪) স্বর্ণকুমারী দেবী— দীপ-নির্ব্বাণ (১৮৭৬)
(১৮৫৫-১৯৩২) কোরকে কীট (১৮৭৭)
(প্রভৃতি) ইত্যাদি

(রচনা-সাহিত্য-জীবনী)

(১) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর— ব্রাহ্মধর্ম্ম (১৮৫২)
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (১৮৬১)

(২) রাজনারায়ণ বসু— ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (১৮৬১)
সেকাল আর একাল (১৮৭৪)
বক্তৃতা (১৮৭০)

(৩) রামদাস সেন- ঐতিহাসিক রহস্য (১৮৭৪-৭৬)
(১৮৪৫-৮৭) ভারতরহস্য (১২৯২)

(৪) শ্রীকৃষ্ণ দাস— সভ্যতার ইতিহাস (১৮৭৬)
('জ্ঞানাঙ্কুর'সম্পাদক)

(৫) রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০) সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস (১৮৭৬)

(৬) যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ— জন ষ্টুয়ার্ট মিলের
("আর্য্যদর্শন" প্রতিষ্ঠাতা)
জীবনবৃত্ত (১৮৭৭)
প্রভৃতি

(৭) কালীপ্রসন্ন ঘোষ— নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৬৯)
(১৮৪৩-১৯১৭) প্রভাত-চিন্তা (১৮৭৭)
প্রভৃতি

আরো অনেকে এবং অনেক বিষয়ে—

অভিনয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান (১৮৫৮-১৮৭৭)

১। আশুতোষ দেবের বাড়ীতে—'শকুন্তলা'—১৮৫৭
২। কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে — ১৮৫৭
৩। বেলগাছিয়া থিয়েটার — 'রত্নাবলী'—১৮৫৮
(স্থায়ী নাট্যশালা)
৪। গোপাল পাল মল্লিকের বাড়ীতে—বিধবা-বিবাহ—১
(সিঁদুরিয়া বাটীতে)
৫। পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার—.৮৬৫-১৮৮৪
৬। জোড়াসাঁকো থিয়েটার —১৮৬৬
৭। শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটার—১৮৬৫
৮। গিরিশচন্দ্রের প্রথম অভিনয়—'সধবার একাদশী'—১৮৬৯-৭০
৯। বহুবাজার নাট্যসমাজ—১৮৬৮
১০। ন্যাশন্যাল থিয়েটার (অবৈতনিক)—১৮৭১
১১। ন্যাশন্যাল থিয়েটার (পাবলিক)—১৮৭২
(জোড়াসাঁকো –মধুসূদন সান্যালের বাড়ী)
১২। ন্যাশন্যাল—(১৮৭৩)
১৩। গ্রেট ন্যাশন্যাল (৬ বীডন ষ্ট্রীটে পাকা স্টেজ) (১৮৭৩-১৮৭৬)
১৪। বেঙ্গল থিয়েটার—

সামাজিক পরিবেষ্টনীর বৈশিষ্ট্য (১৮৫৮-১৯১২)

ধর্ম্মদর্শন—"আমাদের পঠদ্দশায় যাঁহারা Young Bengal নামে অভিহিত হইতেন, তাঁহারাই সমাজে গণ্যমান্য ও বিদ্বান বলিয়া পরিগণিত ছিলেন।…তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, অল্পসংখ্যক ক্রিশ্চিয়ান হইয়া গিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা তাঁহাদের মধ্যে

প্রায় কাহারও ছিল না বলিলেও বলা যায়। সমাজে যাহারা হিন্দু ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ, শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চলে এবং বৈষ্ণব সমাজ এমন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত যে পরস্পর পরস্পরের প্রতিবাদী। ইহা ব্যতীত অন্যান্য মতও প্রচলিত ছিল।...... ইহার উপর অনেক যাজক ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচার হইয়াছেন। সত্যনারায়ণের পুঁথি লইয়া শ্রাদ্ধ করেন, মেটে দেওয়ালে পায়খানার ঘটী হইতে জল দিয়া গলামৃত্তিকার ফোঁটা ধারণ করেন।...আবার জড়বাদীরা বুদ্ধিবিদ্যায় সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, ঈশ্বর না মানা বিদ্যার পরিচয়... এ অবস্থায় স্ব-ধর্মের প্রতি আস্থা কিছুমাত্র রহিল না; কিন্তু মাঝে মাঝে ঈশ্বর লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত তর্ক-বিতর্কও চলে, আদি-সমাজেও কখনও কখনও যাওয়া আসা করি।......নানা তর্ক-বিতর্ক করিয়া কিছু স্থির হইল না, ইহাতে মনের অশান্তি হইতে লাগিল। ...ভাবিলাম ধর্ম্মের আন্দোলন বৃথা।......(পরে দুদ্দিনে তারকনাথের শরণাপন্ন হইবার পরে)...আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল দেবতা মিথ্যা নয়...ক্রমে দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল।" *

নব চেতনা—ক্রমশঃ আইরিশ ও ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা, স্পেন্সার-শিলার-হেগেলের তত্ত্ব ও ম্যাৎসিনী-গ্যারিবলদীর বীরত্বকাহিনী এবং টড্ লিখিত স্বদেশী রাজস্থান গাথা ও অল্পকাল পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত সিপাহী অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া বাঙ্গালী মানসে চিন্তার বিপ্লব আনে। কিন্তু ধর্ম্মান্দোলনের মধ্য দিয়াই প্রথমদিকে বাঙালী তথা ভারতবাসী আত্মস্থ হইবার উদ্যম করে। একদিকে রামমোহন, দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন প্রভৃতির ব্রাহ্মধর্ম্মান্দোলন এবং কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি ও বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম্ম বিশ্লেষণ

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ—গিরিশচন্দ্র ("জন্মভূমি" পত্রিকা, ১১শ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৬ প্রকাশিত)।

পরমহংসদেবের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের চেষ্টা, বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন, উত্তরভারতে দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য্যধর্ম্ম প্রচার ও দক্ষিণ ভারতে কর্ণেল অলকট মাদাম ব্লাভাটস্কীর ব্রহ্মবিদ্যা আন্দোলন, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মণীষীর ভাষা ও সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলন ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজজীবনে বৈপ্লবিক আলোড়ন সৃষ্টি-করে। বস্তুতঃ ধর্ম্মান্দোলনের সহিত সমাজসংস্কার আন্দোলনও অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের সহিত রাজ-নীতিও শাসনসংস্কারের প্রতিও চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ঘটনা

(ক) 'জাতীয় গৌরব সভা'—প্রতিষ্ঠাতা রাজনারায়ণ বসু

(খ) হিন্দুমেলা—(১৮৬৭) (নব গোপাল মিত্র প্রমুখ নেতা)
(১৮৮০-পর্য্যন্ত নিয়মিত অনুষ্ঠান)

(গ) ইণ্ডিয়ান লীগ—(১৮৭৫)—শিশির কুমার ঘোষ

(ঘ) ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ (ভারত সভা)—(১৮৭৬)
সম্পাদক—আনন্দমোহন বসু

(ছাত্র সভা—১৮৭৬)

(ঙ) কংগ্রেস—(রাষ্ট্রীয় মহাসভা)—১৮৮৫
(২৮শে ডিসেম্বর, বোম্বাই)

গণপতি উৎসব—(১৮৯৩)
শিবাজী " —(১৮৯৫) } লোকমান্য তিলক

(ছ) ডন সোসাইটি—(১৯০৩)—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(জ) অনুশীলন সমিতি (এই সময়েই)—প্রমথনাথ মিত্র

(ঝ) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তথা জাতীয় জাগরণ

"সাহিত্য, শিল্প ও রাজনীতির মরাগাঙে ভাব ও কর্ম্মের জোয়ার আসিয়া জাতীয় জীবনের দুকূল ছাপাইয়া ফেলে। কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে ও ব্রতকথায় বাঙালীর মর্ম্মকথা ব্যক্ত হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ, কান্তকবি রজনীকান্ত, কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ কবিতা ও গানে, বিপিনচন্দ্র পাল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অক্ষয় মৈত্রেয়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি দেশাত্মবোধক প্রবন্ধে, রাজকুমার বানার্জি, হেম সেন, কানাই গোস্বামী প্রমুখ স্বদেশী সঙ্গীতে, সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, অশ্বিনী দত্ত ও মনোরঞ্জন-গুহঠাকুরতা প্রভৃতি বক্তৃতায় দেশবাসীকে অভীঃ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে থাকেন।" ('ভারতের মুক্তি সংগ্রাম')।

ইহা ছাড়াও দেশের আভ্যন্তরীন সমাজনৈতিক, নৈতিক, অর্থ-নৈতিক সংস্থার বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। পুরাতন সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরিয়াছিল। ব্যবসায়, শিল্প এবং চাকরীর কেন্দ্রগত আকর্ষণে যৌথ-পরিবার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছিল—ব্যক্তি-স্বার্থের ভার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং 'ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-চেতনা'র চাপে যৌথ চেতনা ক্রমেই সঙ্কুচিত হইতেছিল। 'যৌথ-চেতনা'র সহিত 'ব্যক্তি-চেতনা'র দ্বন্দ্বে পারিবারিক জীবন তখন অশান্ত, বিক্ষুব্ধ। অধিকন্তু সমাজ-শক্তির অক্ষমতার ফলে 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অনুকরণের পথে এবং ব্যবসায়-তান্ত্রিক রাষ্ট্র-বিধানের প্রশ্রয়ে বাঙলার নাগরিক জীবনে দুর্নীতির তখন অবাধ প্রবেশ। মদ্যাসক্তি, বেশ্যাসক্তি, এমনি বহু আসক্তি এবং আনুষঙ্গিক অনাচারের আবর্জ্জনার দুর্গন্ধ তখন খোলা-মুখ নর্দ্দমার মতই সমাজের আবহাওয়াকে দূষিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার ফলে নারীহরণ, ধর্ষণ, হত্যা, জাল-জুয়াচুরি পারিবারিক শান্তির সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিঘ্ন হইয়া

উঠিয়াছিল। (গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে এই সমাজই প্রধানতঃ প্রতিফলিত)।

উল্লিখিত পরিবেষ্টনী-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রাখিয়া গিরিশচন্দ্রকে দেখিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে গিরিশচন্দ্র কি ভাবে এবং কেন কোন কোন যুগপ্রবণতার সহিত নিজের আভিমানিক যোগ স্থাপন করিয়াছেন। কারণ উল্লিখিত সংস্থাই গিরিশচন্দ্রের সম্ভাব্য প্রেরণা-উৎস। এই প্রেরণা-ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র যে কোণে অবস্থান করিয়াছেন এবং যে যে চাহিদার পূরণ করিয়াছেন—স্বেচ্ছায় এবং পরেচ্ছায়ও বটে,—তাহাদের একটা মোটামুটি পরিচয় পাইলেই গিরিশচন্দ্রের সৃষ্টির "কেন" অনেকখানি জানা যাইবে।

গিরিশচন্দ্রের রচনা

গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনকে পাঁচটী অধ্যায়ে ভাগ করা যায়—

(ক) প্রথম অধ্যায়—১৮৭৭-১৮৮১ পর্য্যন্ত, (খ) দ্বিতীয় অধ্যায়—১৮৮১-১৮৮৪, (গ) তৃতীয় অধ্যায়—১৮৮৪-১৮৮৯, (ঘ) চতুর্থ অধ্যায়—১৮৮৯-১৯০৫, এবং (ঙ) পঞ্চম অধ্যায়—১৯০৫-১৯১১।

(ক) প্রথম অধ্যায়—অনুবাদ ও গীতিনাট্যের যুগ

১৮৭৭—আগমনী (৬ই অক্টোবর অভিনীত)—গীতিনাট্য

অকাল বোধন (১০ই অক্টোবর) ,,

মেঘনাদ বধ (মধুসূদন)—(১লা ডিসেম্বর)—নাট্যরূপদান

১৮৭৮—দোললীলা—(৪ঠা মার্চ্চ)—গীতিনাট্য

বিষবৃক্ষ (বঙ্কিমচন্দ্রের)—(৯ই মার্চ্চ)—নাট্য রূপদান

দুর্গেশনন্দিনী (ঐ)—২২শে জুন—

(খ) দ্বিতীয় যুগ—(১৮৮১—১৮৮৪)

(১৮৮১—রাসলীলা—(১২ই জানুয়ারী)—গীতিনাট্য

শিবের বিবাহ— (১৫ই জানুয়ারী)—গীতিনাট্য
মায়াতরু— (২২শে ,,)— ,,
মোহিনী-প্রতিমা—(১৬ই এপ্রিল)
আলাদিন— (,,)
আনন্দ রহো— ২১শে মে —ঐতিহাসিক
রাবণবধ— ৩০শে জুলাই —পৌরাণিক
সীতার বনবাস —১৭ই সেপ্টেম্বর— ,,
অভিমন্যুবধ— ২৬শে নভেম্বর— ,,
লক্ষ্মণ-বর্জ্জন— ৩১শে ডিসেম্বর— ,,
১৮৮২—সীতার বিবাহ—১১ই এপ্রিল —(গীতিমূলক)
—রামের বনবাস— ১৫ই এপ্রিল —পৌরাণিক

১৮৮২—	সীতাহরণ	২২শে জুলাই	পৌরাণিক
	ভোটমঙ্গল	৭ই অক্টোবর	প্রহসন
	মলিনমালা	২৮শে অক্টোবর	
১৮৮৩—	পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	৩রা ফেব্রুয়ারী	পৌরাণিক
	দক্ষযজ্ঞ	২১শে জুলাই	,,
	ধ্রুবচরিত্র	১১ই আগষ্ট	,,
	নলদময়ন্তী	১৫ই ডিসেম্বর	,,
১৮৮৪—	কমলে কামিনী	২৯শে মার্চ্চ	,,
	বৃষকেতু	২৬শে এপ্রিল	,,
	হীরার ফুল		প্রহসন
	শ্রীবৎসচিন্তা	৭ই জুন	পৌরাণিক
	চৈতন্য-লীলা	২রা আগষ্ট	অবতার-বিষয়ক
	প্রহ্লাদচরিত্র	২২শে নভেম্বর	পৌরাণিক
১৮৮৫—	নিমাই সন্ন্যাস	১০ই জানুয়ারী	অবতার

	প্রভাস-যজ্ঞ	৯ই মে	পৌরাণিক
	বুদ্ধদেব চরিত	১৯শে সেপ্টেম্বর	অবতার
১৮৮৬—	বিল্বমঙ্গল	১১ই জুন	ভক্ত-পুরুষ
	বেল্লিক বাজার	২৫শে ডিসেম্বর	প্রহসন
১৮৮৭—	রূপ সনাতন	২১শে জুন	ভক্ত
১৮৮৮—	পূর্ণচন্দ্র	১৭ই মার্চ্চ	গোরক্ষনাথ
	বিষাদ	৫ই অক্টোবর	বিয়োগান্ত নাটক
	নসীরাম	২৫শে মে	,,
১৮৮৯—	প্রফুল্ল	২৭শে এপ্রিল	,,
(স্টার)	হারানিধি	৭ই সেপ্টেম্বর	,,
১৮৯০—	চণ্ড	২৬শে জুলাই	ইতিকথা-মূলক
	মলিনা-বিকাশ	১৩ই সেপ্টেম্বর	গীতিনাট্য
	মহাপূজা	২৪শে ডিসেম্বর	রূপকনাট্য
১৮৯৩—	ম্যাক্‌বেথ্	২৮শে জানুযারী	
(মিনার্ভা)	মুকুলমুঞ্জরা	৪ঠা ফেব্রুয়ারী	
	আবুহোসেন	২৫শে মার্চ্চ	
	সপ্তমীতে বিসর্জ্জন	১১ই অক্টোবর	
	জনা	২৩শে ডিসেম্বর	
	বড়দিনের বখ্‌শিস্	২৪শে ,,	
১৮৯৪—	স্বপ্নের ফুল	১৭ই নভেম্বর	
	সভ্যতার পাণ্ডা	২৫শে ডিসেম্বর	
১৮৯৫—	করমেতিবাঈ	১৮ই মে	
	ফণীর মণি	২৫শে ডিসেম্বর	
১৮৯৬—	কালাপাহাড়	২৬শে ডিসেম্বর	
	পাঁচ ক'নে	১লা জানুয়ারী	

১৮৯৭—	হীরক জুবিলি	২২শে জুন	
	পারস্য-প্রসূন	১১ই সেপ্টেম্বর	
	মায়াবসান	১১ই সেপ্টেম্বর	
১৮৯৯—	দেলদার	১০ই জুন	
১৯০০—	পাণ্ডব গৌরব	১৭ই ফেব্রুয়ারী	(পৌরাণিক)
	মণিহরণ	২২শে জুলাই	গীতিনাট্য
	নন্দদুলাল	১৫ই আগষ্ট	ঐ
১৯০১—	অশ্রুধারা	২৬শে জানুয়ারী	
	মনের মতন	২০শে এপ্রিল	
	অভিশাপ	২৮শে সেপ্টেম্বর	গীতিনাট্য
১৯০২—	শাস্তি	(৯ই জুন, বুয়র যুদ্ধাবসানে)	
	ভ্রান্তি	১৯শে জুলাই	
	আয়না	২৫শে ডিসেম্বর	
১৯০৪—	সৎনাম	৩০শে এপ্রিল (রচিত ১৯০২ ?)	
১৯০৫—	হরগৌরী	৪ঠা মার্চ্চ	
	বলিদান	৮ই এপ্রিল	
	সিরাজদ্দৌলা	৭ই সেপ্টেম্বর	ঐতিহাসিক
	বাসর	২০শে ডিসেম্বর	
১৯০৬—	মিরকাসিম	১৬ই জুন	ঐতিহাসিক
	য্যায়সা ক্বা ত্যায়সা	২৫শে ডিসেম্বর	প্রহসন
১৯০৭—	ছত্রপতি শিবাজী	১৭ই আগষ্ট	
১৯০৮—	শাস্তি কি শান্তি	৭ই নভেম্বর	
১৯০৯—	শঙ্করাচার্য্য	”	
১৯১০—	রাজা অশোক	৩রা ডিসেম্বর	
১৯১১—	তপোবল	১৮ই নভেম্বর	

গিরিশচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্য

নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের নাট্য-রচনা-প্রবাহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই একটী পুরাতন সত্যকেই নূতন করিয়া উপলব্ধি করা যায় এবং সে সত্যটী এই—সাহিত্য-স্রষ্টার সৃষ্টি যুগ-চেতনার ও রসপিপাসুর দাবীর এবং ব্যক্তিমানসের নূতন প্রবণতা দ্বারা অতি নিগূঢ়ভাবেই নিয়ন্ত্রিত। গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার বিবর্ত্তন অনুসরণ করিতে যাইয়া প্রথমেই দেখা যায়—পৌরাণিক নাটকের এবং ধর্ম্মমূলক নাটকের বাহুল্য। এই বাহুল্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রধানতঃ তিনটী কারণ চোখে পড়ে—এক, নাট্যকারের পুরাণ-প্রিয়তা (শৈশব-শিক্ষার সংস্কার); দুই, যুগচেতনার প্রেরণা (ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া জাতির আত্মসংবিদ ফিরিয়া পাইবার সাধনা); তিন, জনকামনা-নিয়ন্ত্রিত নাটমঞ্চ-স্বত্বাধিকারীগণের 'লাভ'-শিকারী বুদ্ধির চাহিদা। ১৮৮১খ্রীঃ ন্যাশন্যাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র যখন ১৫০৲ বেতনের চাকুরী ছাড়িয়া ১০০৲ টাকায় থিয়েটারের ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করেন তখন যাঁহার স্বত্বাধিকারিতার অধীনে তাঁহাকে কাজ করিতে হইয়াছিল তাঁহার নাম প্রতাপ জহুরী। জহুরী মহাশয় জাত-জহুরী—যুগের নাড়ী-জ্ঞান তাঁহার টন্‌টনেই ছিল। তারপর, স্টারের গুর্ম্মুখ রায় স্বত্বাধিকারী মহাশয়ও কম ঝানু ছিলেন না। মোটকথা, যুগের হাওয়ায় পাল তুলিয়া চলিতে তখন কেহই কার্পণ্য করেন নাই—কি নাট্যকার, কি রঙ্গমঞ্চ-অধিকারী। (কোন যুগেই কেহ কার্পণ্য করে না) তবে নাট্যকারের ব্যক্তি-মানসের প্রকৃতিতে এই দিকে বিশেষ ঝোঁক রহিয়াছে এবং তাঁহার দৃষ্টিকোণ এই: "ধর্ম্ম হিন্দু জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, হিন্দুকে জাগাইতে ও তাহার জীবন উন্নত করিতে হইলে ধর্ম্মের দ্বারাই হইবে। ধর্ম্ম হইতে তাহার জাতীয়জীবন পৃথক করিলে

চলিবে না।" এখানেই স্মরণে রাখিতে হইবে যে গিরিশচন্দ্রের ভিত্তি-স্থানীয় সংস্কার উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের চেতনা দ্বারাই বিশেষ ভাবে গঠিত এবং সেই চেতনা ধর্ম্ম-জাগরণের লক্ষ্যে অভিমুখী ছিল। (গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তি-মানসের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়)।

রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে গিরিশচন্দ্রের জীবন-দর্শন ভগবদ্ভক্তির ভূমিতে স্থির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং অহেতুক ভক্তি ও ভগবানের অযাচিত কৃপার প্রতি অশেষ আস্থা জন্মিয়াছিল। এই আধ্যাত্মিক দর্শনের নিদর্শন রামকৃষ্ণ সংস্পর্শের পরবর্ত্তী নাটকগুলিতে * বিশেষভাবে পরিস্ফুট। এক কথায় বলা যায়, গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তি-মানসের অধ্যাত্ম-প্রবণতা তথা ভক্তিরস-বিহ্বলতা তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলিকে ভক্তিরসময় করিয়া তুলিয়াছে, তবে রসাধিক্যের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই চরিত্র নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে—নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্প্রাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ('পাণ্ডব-গৌরব' দৃষ্টান্ত স্থল)।

সামাজিক নাট্যগুলিকে নাট্যকার সহৃদয়তাবলে হৃদয়বান বা ভাবাবেগময় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, চরিত্রগুলি সে দিক দিয়া চিত্তাকর্ষকও হইয়াছে, কিন্তু চরিত্রে নানাসত্তার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অর্থাৎ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জটিল গতিবিভঙ্গ প্রশংসনীয় মাত্রায় পাওয়া যায় না। চরিত্রগুলি অনুভাবাদি প্রকাশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু আত্ম-সচেতন হওয়ার ফলে যে-ধরণের ভাবোপলব্ধি প্রকাশ পায়, তাহার নিদর্শন সন্তোষজনক নহে। চরিত্র অনেকক্ষেত্রেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াময় না হইয়া বিশেষ ধরণের উদাহরণ হইয়া উঠিয়াছে—'টিপিকাল' হইয়া পড়িয়াছে।

* চৈতন্যলীলার অভিনয়-প্রশংসা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেব অভিনয় দেখিতে থিয়েটারে পদধূলি দেন এবং গিরিশচন্দ্র নূতন জীবনের আস্বাদ লাভ করেন।

তারপর, সামাজিক নাটকে যে সমাজ প্রতিফলিত হইয়াছে সে সমাজের সাধারণ পরিচয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কলিকাতার মধ্যবিত্ত সমাজ। আর এই সমাজের বিশেষ পরিচয়ের আভাস গিরিশচন্দ্রেরই ভাষায়—"দোষের মধ্যে বড় জোর নাবালককে ঠকাইয়াছে, কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, ...লাম্পট্য দোষের বিবরণ—দুই একটা বেশ্যা রাখিয়াছে, কেহ বা পরিবারস্থ থাকিয়া কুলাঙ্গনাকে বাহির করিয়াছে, কেহ বা পড়সীর কুলাঙ্গনা বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে।" বাস্তবিক এই সমাজের বিশেষ বিবরণ মাত্র এইটুকু নহে—পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা, মদ্যপান, বেশ্যাসক্তি, জাল-জুয়াচুরি, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা প্রভৃতি নানা দোষ বর্তমান ছিল।

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের ঘটনা-বিন্যাস-ক্ষেত্রের চৌহদ্দি উক্ত সমাজের সংস্থা দ্বারা পরিনিয়ন্ত্রিত। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার-সেন মহাশয় গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের বিশেষত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে যে কয়টী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে সমাজের মোটামুটি পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। তাঁহার মতে—(১) প্রথম বিশেষত্ব—কলিকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ জীবনের কাহিনী মাত্র স্থান পাইয়াছে। (২) দ্বিতীয় বিশেষত্ব—ব্যাঙ্ক ফেল, ঋণের দায়ে ডিক্রি জারি, চাকরি-হানি, গৃহ-বিক্রয়, চুরির অভিযোগ, কন্যার পতি বিয়োগ ইত্যাদি। (৩) মূলীভূত চক্রান্তের স্রষ্টা—নায়কের ভ্রাতা, বাল্যবন্ধু অথবা ভ্রাতৃস্থানীয় স্নেহাস্পদ ব্যক্তি। তাহার সঙ্গে উকিল-এটর্ণি-দালালের যোগ। (৪) নাটকের শেষে আত্মহত্যা, হত্যা এবং "পতন ও মৃত্যু"। গিরিশচন্দ্র তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ সহৃদয়তা দিয়া এই সমাজকে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সক্ষমও হইয়াছিলেন। বাস্তব জীবনের রূপ উপস্থাপনার প্রেরণাকে গিরিশচন্দ্র প্রশংসনীয় রূপেই কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

এই সামাজিক চেতনা এবং ধর্ম্মনৈতিক চেতনার পাশেই আর একটা চেতনাও আসিয়া স্থান অধিকার করিয়াছিল। উনবিংশ-শতাব্দীর শেষাশেষি রাজনৈতিক চেতনায় সমাজ-দেহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র এই চেতনাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই; স্বাধীনতা-কামনা-যজ্ঞের আয়োজনে অংশ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রেরণা এই চেতনারই ক্রম-পরিণতি। (ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের উক্তি—"গিরিশচন্দ্র কোন প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক লিখেন নাই"—সত্য নহে)। সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম ও ছত্রপতি শিবাজী ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নাটক গুলিতে গিরিশচন্দ্র যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সিরাজদ্দৌলা নাটকে ব্রিটিশ নীতির বিশ্লেষণ, জাতির মঙ্গলের উপায় নির্দ্দেশ এমন ভাবে করা হইয়াছে যাহা সত্যই প্রশংসনীয়। সিরাজের একটা স্মরণীয় উক্তি— "যদি কখনও সুদিন হয়, যদি কখনো জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চ স্বার্থে চালিত হ'য়ে সাধারণের মঙ্গল যদি আপন মঙ্গলের সহিত বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, নীচ প্রবৃত্তি দলিত ক'রে স্বদেশবাসীর অপমানে আপনার অপমান জ্ঞান করে, যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খড়্গহস্ত হয়—এই দুর্দ্দম ফিরিঙ্গি দমন তখন সম্ভব।" সিরাজদ্দৌলার করিমচাচা—বাস্তবিক একজন 'বিজ্ঞতম বোকা' (wisest fool) এবং চমৎকার সৃষ্টির নিদর্শন। বিংশশতাব্দীর নূতন পরিবেশ, পর্য্যবেক্ষণশীলতা এবং বিশ্লেষণ-প্রবণতার ছোঁয়াচে গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের প্রকাশ-শক্তি

'প্রকাশ' বলিতে, রচনা কৌশল বলিতে, ভাবানুভব এবং ভাব প্রকাশের শক্তি উভয়ই বুঝায়। এই দুইটী অনেক পরিমাণে অবিচ্ছেদ্য হইলেও এমন ক্ষেত্রও দেখা যায় যেখানে ভাবানুভবের তীব্রতা কম না থাকিলেও ভাব-বিস্তাবের ব্যাপকতা ও গভীরতা কম থাকে। গিরিশচন্দ্রে ভাবানুভব আছে, কিন্তু ভাব-বিস্তার কম। তাঁহার রচিত চরিত্রগুলি যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে তাহা অনুভাব-গর্ভ বটে, কিন্তু ভাব-কল্পনার কারুকার্য্যে মহিমময় নহে। (দ্বিজেন্দ্র-লালের সহিত এই বিষয়ে তাঁহার পার্থক্য এবং বড় পার্থক্য)। পৌরাণিক এবং ভক্তিমূলক নাটকে গিরিশচন্দ্র 'গৈরিশী ছন্দের' মাধ্যমে ভাবানুভব বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু প্রকাশ-মহিমার হিসাবে উহারা গতানুগতিকতার মাত্রা সামান্যই অতিক্রম করিয়াছে। তারপর সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র প্রকাশে স্বাভাবিকতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ভাষাকে যথাসম্ভব নিরাভরণ করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু "কাব্যজীবিত" বক্রোক্তির সন্ধান, আবেগ-চঞ্চল মুহূর্ত্তের উচ্ছ্বাসময় বাগ্‌ভঙ্গিমার সন্ধান, গিরিশচন্দ্রের ভাষায় পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক নাটক ব্যাতিক্রমস্থল হইয়াছে—অবশ্য সামান্য ভাবে। ঐতিহাসিক নাটকের ভাষায় ব্যঞ্জনা এবং বক্রোক্তির নিদর্শন যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়া গেলেও, একেবারে না পাওয়া যায় এমন নহে। (সিরাজদ্দৌলার নাটকের করিম চাচা, সিরাজ প্রভৃতি চরিত্র দ্রষ্টব্য)। ইহার মূল কারণ অবশ্য গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা অনুশীলনাদির বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

গিরিশচন্দ্র ইংরেজী নাটক নভেলাদি না পড়িয়াছিলেন এমন

নহে, কিন্তু, গিরিশচন্দ্রের কনিষ্ঠ সমসাময়িকদের মধ্যে পাশ্চাত্য কাব্যানুশীলনের মাত্রা অনেক বেশী ছিল এবং অভ্যাসবশে তাঁহারা প্রতীচ্য কবিদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকিয়া ভাব ও কল্পনার সহিত অন্তরঙ্গ যোগে সংযুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির বাচন-ভঙ্গীর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য শিক্ষানুশীলনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই পাওয়া যায়।

বাঙলা নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের স্থান

বাঙলা রঙ্গমঞ্চের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা গিরিশচন্দ্র শুধু অভিনেতা হিসাবেই যে যুগন্ধর ছিলেন তাহা নহে, নাট্যকার রূপেও তিনি তাঁহার যুগের 'কেন্দ্র-পুরুষ' ছিলেন—যুগকে ধারণ করিয়াছিলেন। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র একাদিক্রমে ৩২।৩৩ খানি পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটক, ৫।৬ খানি সামাজিক নাটক এবং কয়েকখানি প্রহসন লিখিয়া বাঙলা নাটকের সংখ্যা-দৈন্য দূর করিতে যে চেষ্টা করিয়াছেন, সে-জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞচিত্তে বাঙালী চিরদিন স্মরণ করিবেই। কিন্তু সংখ্যা-দৈন্য দূর করার কৃতিত্বই গিরিশচন্দ্রের একমাত্র প্রাপ্য নহে। ভাব সঞ্চারণের ক্ষমতার (Power of Communication) দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে গিরিশচন্দ্র একজন শক্তিমান নাট্যকার—তাঁহার নাটকের দ্বারা বাঙলা নাটকের সংখ্যাপূর্ত্তিই কেবল ঘটে নাই,—গুণস্ফূর্ত্তিও ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে, আমার মনে হয়, সমালোচকগণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। এমন সমালোচক আছেন যিনি গিরিশচন্দ্রকে শেক্‌সপিয়রের সমান মর্য্যাদা দিতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করেন না; আবার এমন কেহ কেহও আছেন যিনি গিরিশচন্দ্রকে একেবারে "তৃতীয় শ্রেণী"তে স্থান দিতে চাহেন এবং ভুলিয়া যান

যে নাটক দৃশ্যকাব্য—ইহাতে দৃশ্যত্বের গুণও যত আবশ্যক, কাব্যত্বও তত আবশ্যক—কেবল 'কাব্যত্ব' আর কেবল 'দৃশ্যত্ব' যে কোন নাটকের পক্ষে ধর্ম্ম-বিচ্যুতি।

গিরিশচন্দ্রের নাটকের মঞ্চসাফল্য (Stage Success) অবিসংবাদিত বলিয়া গ্রহণ করিলে এবং রসোত্তীর্ণতার মাত্রা বিচার করিলে এ কথা না বলিয়া উপায় নাই যে গিরিশচন্দ্রের রচনা রসনিষ্পত্তির দিক দিয়া সার্থক হইয়া উঠিয়াছে—আত্মিক শক্তিতে নাটক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার্য্য যে বাস্তবিক 'সাহিত্যিক সাফল্য' (Literary Success) বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়—গিরিশচন্দ্রের অনেক নাটকেই তাহার মাত্রা খুব সন্তোষজনক নহে। কিন্তু ভাবানুলেখন হইতে ভাবপ্রকাশের মহিমাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া বিচার করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব ও সঙ্গত নহে এ কথা মনে রাখিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে গিরিশচন্দ্রের নাটক "নিষ্প্রদীপ আসরে নাটকের বিচার-সভায়" একেবারে অপদস্থ হইবে না এবং গিরিশচন্দ্রকেও 'তৃতীয় শ্রেণীতে' আসন দেওয়া যুক্তি-যুক্ত হইবে না। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার সৃষ্টি শুধু গণনায়ই অগ্রগণ্য নহে, গুণেও সকলের অগ্রে আসন না পাইলেও, একেবারে পিছনে আসন পাইবার মত নহে। তাঁহার রচনায় যে ব্যাপ্তি ও গভীরতা রহিয়াছে, বিস্মৃতির হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে তাহা চিরদিন সক্ষম থাকিবে বলিয়াই মনে হয়।

প্রফুল্লের সাধারণ আলোচনা

(ক) রচনা বা অভিনয় কালঃ—গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনে পাঁচটী অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায় ১৮৭৭ হইতে ১৮৮১, দ্বিতীয় ১৮৮১ হইতে ১৮৮৩, তৃতীয় ১৮৮৪ হইতে ১৮৮৯, চতুর্থ ১৯৮১ হইতে ১৯০০ এবং পঞ্চম ১৯০৫ হইতে ১৯১১। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম নাটক প্রফুল্ল এবং নাটকখানির প্রথম অভিনয় ১৬ই বৈশাখ, ১২৯৮ সাল (শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের মতে), কিন্তু প্রফুল্ল নাটকের (অভিনব সংস্করণ, অষ্টম প্রচার) প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "১৬ই বৈশাখ ১২৯৬ সাল, স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।" এই সালটীর (১২৯৬) সহিত শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত (সংগৃহীত) প্রণীত "ভারতীয় নাট্যমঞ্চ" গ্রন্থে লিখিত "২৭ এপ্রিল ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের" ঐক্য পাওয়া যায়। (যোগেশের ভূমিকায় অমৃত মিত্র এবং রমেশের ভূমিকায় অমৃত বসু)।

(খ) শ্রেণী-পরিচয়ঃ—'প্রফুল্ল' করুণ রসাত্মক একখানি পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক। একটি যৌথ পরিবারের শোচনীয় বিচ্ছেদের কাহিনী—একজন সদাশয় ব্যক্তির সারা জীবনের সঞ্চিত ধন এবং সেই ধন অপেক্ষাও প্রিয়তর সুনাম ও ধর্ম্ম হারাইবার তথা আত্মহারা হইবার করুণ কাহিনী—একটী সাজানো বাগানের শুকাইয়া যাইবার কথা। এই সদাশয় ব্যক্তি যোগেশ—করুণ রসের প্রধান আলম্বন বিভাব—সাজানো বাগানের সর্ব্বসুখী মালিক আর শুকানো বাগানের সর্ব্বহারা

সাক্ষী। জ্ঞানদা, উমাসুন্দরী এবং প্রফুল্ল—এই তিনজনেরও জীবনে শোকাবহ পরিণাম ঘটিয়াছে এবং সেই হিসাবে প্রত্যেকেই করুণরসের নিমিত্ত কারণ বটে, কিন্তু তাঁদের কেহই কেন্দ্রীয় বা মুখ্য চরিত্রের মর্য্যাদার অধিকারী নহে—বস্তুতঃ নাটকখানি যোগেশেরই সাজানো বাগানের শুকাইয়া যাওয়ার কথা-চিত্র। প্রফুল্ল এই সাজানো বাগানেরই অন্যতম ফুল্ল ও সুরভিত কুসুম—অন্তরের উদার সৌন্দর্য্য-রসের সঞ্জীবনীশক্তি দিয়া শয়তানী রসশোষণের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া, প্রাণপণে যুঝিয়া বাগানটীর লুপ্ত রসধারাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সৌন্দর্য্য-সুরভি লইয়া অকালেই তাঁহাকে ঝরিয়া যাইতে হইয়াছিল—তাঁহার সহিত সাজানো বাগানের শেষ সবুজিমা শুকানো বাগানের করুণ ম্লানিমাকে গাঢ়তর করিয়া মৃত্যুর পাণ্ডুরতায় মিশিয়া গেল। প্রফুল্লের মহিমময় আত্মবিসর্জ্জনে অসার্থককাম সংগ্রামের চিত্র মর্ম্মস্পর্শী করুণ, কিন্তু তবুও প্রফুল্ল নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র নহে। কারণ প্রফুল্ল যোগেশেরই সাজানো বাগানের অন্যতম উপাদান এবং যোগেশের সাজানো বাগান শুকাইয়া যাওয়ার বেদনা-বিক্ষোভ দেখানো—যে খানি নাটকের মূল লক্ষ্য,—সেখানে উহা ঐ মূল লক্ষ্যের অন্যতম উপলক্ষ্য মাত্র (এই কারণেই নাটকখানির নামকরণ বিষয়ে আপত্তি তুলিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে)।

প্রফুল্লকে ট্র্যাজেডি-করুণ নাটক বলা চলে কি ?

রসবিচারের পন্থায় অনায়াসেই আমার নাটকখানির শ্রেণীপরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছি,—এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে নাটকখানি করুণ রসাত্মক এবং সেই রসের প্রধান আলম্বন-বিভাব যোগেশ। কিন্তু ইংরেজী মতে অত সহজে সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হয় না। কারণ দুঃখময় বা বিষাদময়—এককথায় করুণ রসাত্মক

নাটকের মধ্যেও সেখানে আবার উপবিভাগ কল্পিত হইয়াছে। করুণ রসাত্মক নাটক দুই শ্রেণীর হইতে পারে, এক ট্র্যাজেডি এবং দুই 'মেলোড্রামা'। সুতরাং প্রশ্ন উঠে—প্রফুল্ল ট্র্যাজেডি না মেলোড্রামা ?

এই স্থলে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতের আলোকে প্রফুল্লকে দেখা যাক্
(ক) শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের মতে—"প্রফুল্ল নাটকও এইরূপ একটী মর্ম্মভেদী tragedy এবং এই ট্র্যাজেডির বীজ যোগেশের হৃদয়েই অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল, বাহিরের ঘটনার প্রতিঘাতে উহা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।...যোগেশের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা—তাহার সুনাম সুযশের আকাঙ্ক্ষাই প্রফুল্ল নাটকে tragedy'র কারণ"। সুতরাং দেখা যায়, শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত মহাশয় প্রফুল্লকে রীতিমত একখানি ট্র্যাজেডি বলিয়াই মনে করিয়াছেন এবং যোগেশকেই "কেন্দ্র পুরুষ" বলিয়াছেন।

(খ) অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে—"প্রফুল্ল গিরিশচন্দ্রের আদর্শ ট্র্যাজেডি।......শ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণাঙ্গ বিয়োগান্ত নাটক।"...তবে "অতিরিক্ত রঙ-ফলানো না হইলে নাটকটী একটী প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাজেডি হইতে পারিত"। ডাঃ সেন মহাশয়ের মন্তব্যের তাৎপর্য্য এই—প্রফুল্ল ট্র্যাজেডি, তবে "প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাজেডি" নহে।

(গ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভাস রায়চৌধুরী মহাশয়, "নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা" নামক গ্রন্থে 'নাটকের শ্রেণী-বিভাগ' অধ্যায়ে —প্রফুল্ল নাটক সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, গ্রন্থখানি পাঠ্য বলিয়াই তাহা উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী মহাশয়, অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডির তালিকায় যেমন প্রফুল্লকে স্থান দিয়াছেন আবার মেলোড্রামার চূড়ান্ত উদাহরণরূপেও প্রফুল্লকে তেমনি দাঁড় করাইয়াছেন। ফলে 'প্রফুল্ল' সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়

না। অধ্যাপক রায়চৌধুরী মহাশয় প্রফুল্লকে ট্র্যাজেডির উল্লেখ-যোগ্য উদাহরণের মধ্যে উল্লেখ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে মেলোড্রামার চূড়ান্ত উদাহরণ রূপেও প্রফুল্লের উল্লেখ করিয়া 'প্রফুল্ল' সম্পর্কে একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছেন।

(ঘ) বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ মহাশয় 'প্রফুল্ল' সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা এই—"আকস্মিক মৃত্যু দেখাইলেই ট্র্যাজেডি হইল না। ঘটনার টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়া ট্র্যাজেডিকে বুনিয়া দিতে হইবে এবং তবেই মৃত্যু অস্বাভাবিক হইবে না। প্রত্যেক ঘটনার পিছনে যথেষ্ট শক্তিশালী এবং বিশ্বাস্য কারণ না থাকিলে তাহা ট্র্যাজেডির অঙ্গীভূত হইতে পারে না···যোগেশ চরিত্রকে খুবই ট্র্যাজিক করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ট্র্যাজিক চরিত্রের কোন ধর্ম্মই ইহাতে নাই। ট্র্যাজেডির নায়ক নিশ্চয়ই এমন কোন কাজ করিয়াছে, অথবা মারাত্মক কোন ভুল করিয়াছে, যাহাতে তাহার ট্র্যাজেডি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। কিন্তু যোগেশের চরিত্রে এমন কোন ট্র্যাজেডির বীজ নাই···এইরূপ নিক্রিয় নিশ্চেষ্ট পুরুষ কখনো ট্র্যাজেডির নায়ক হইতে পারে না"।

অধ্যাপক ঘোষের মন্তব্যের 'অতএব' এই যে—প্রফুল্ল নাটকখানি ট্র্যাজেডি নহে। কারণ, (ক) কেন্দ্রীয় চরিত্র যোগেশের মধ্যে ট্র্যাজেডির কোন ধর্ম্মই নাই, না আছে উত্থান-পতন ও ক্রমবিকাশ, না আছে চরিত্রে অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা ও তজ্জনিত 'মারাত্মক ভুল', এবং চরিত্রটী তদুপরি নিষ্ক্রিয়। দ্বিতীয়তঃ (খ) "প্রত্যেক ঘটনার পিছনে যথেষ্ট শক্তি-শালী ও বিশ্বাস্য কারণ" নাই।

এখন উল্লিখিত মন্তব্যাদি হইতে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যাইতেছে :—

(১) শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—ট্র্যাজেডি—মর্ম্মভেদী ট্র্যাজেডি।

(২) শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন—ট্র্যাজেডি—তবে 'প্রথম শ্রেণীর' নহে।
(৩) শ্রীযুক্ত বিভাস রায়চৌধুরী—'ট্র্যাজেডি'—এবং 'মেলোড্রামা'।
(৪) শ্রীযুক্ত অজিতকুমার ঘোষ—ট্র্যাজেডি নহে—তবে (কি তাহা বলেন নাই)।

এইবার, সমালোচকগণের মত ও যুক্তিগুলি (এক অজিতবাবুই যুক্তি দিয়াছেন) পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্, কারণ ইঁহাদের মত পরীক্ষা করা আর নাটকখানিকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা একই কথা।

প্রথমেই ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটী ধরা যাউক। শ্রদ্ধেয় ডাঃ সেন নাটকখানিকে ট্র্যাজেডি বলিয়াছেন বটে, কিন্তু পক্ষে কোন যুক্তি দেন নাই এবং "অতিরিক্ত রঙ-ফলানো" থাকিলেও মেলোড্রামার স্তরে নাটকখানিকে নামাইয়া দেন নাই—শুধু 'প্রথম শ্রেণীতে' স্থান দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ সেন খুবই স্পষ্টভাবে 'প্রফুল্ল' সম্বন্ধে রায় দিয়াছেন, অতিরিক্ত রঙ ফলানো সত্ত্বেও, ট্র্যাজেডির শ্রেণীর মধ্যে স্থান দিয়াছেন। তবে 'অতিরিক্ত রঙ ফলানো' কথাটীর যথার্থ তাৎপর্য্য অনির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া নাটকখানির যথার্থ পরিচয় পাইয়াও যেন পাওয়া যায় না। কারণ অতিরিক্ত রঙ ফলানো মেলোড্রামার মধ্যেই সাধারণতঃ দেখা যায় এবং সেই হিসাবে,—নাটকখানির পরিচয় বিষয়ে সামান্য একটু 'কিন্তু' থাকিয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভাস রায়চৌধুরী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া প্রথমেই এই কথা আসে যে, অধ্যাপক রায়চৌধুরী মহাশয় হয় ট্র্যাজেডি এবং মেলোড্রামাকে দুইটী ভিন্ন শ্রেণী বলিয়া মনে করেন না, না হয় প্রফুল্ল নাটকের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে মত স্থির করিতে পারেন নাই।

সন্দেহের কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে—প্রথমতঃ 'প্রফুল্ল'-কে তিনি "অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডি" গণনায় অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, আবার মেলোড্রামার লক্ষণ নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গেও প্রফুল্লকে "চূড়ান্ত উদাহরণ" বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অসঙ্গতি এত স্পষ্ট যে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী মহাশয় বলিতে পারেন যে, ট্র্যাজেডির লক্ষণ-নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডির তালিকায় প্রফুল্লের নাম উল্লেখ করিলেও তিনি "কিন্তু" জোর করিয়া একথাও বলিয়াছেন—"এই সকল নাটকের মধ্যে অধিকাংশ Tragic না হইয়া হইয়াছে Pathetic"; অর্থাৎ তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য স্পষ্ট না হইলেও—প্রফুল্ল "ট্র্যাজেডি" হইলেও আসলে "প্যাথেটিক"—এই বলাতে মূল দোষ একটুও না কমিলেও আর একটী দোষ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সে দোষটীকে সংক্ষেপে স্বতোবিরোধ বলা যায়। যাহা 'ট্র্যাজিক' হইয়া উঠে নাই, তাহা 'ট্র্যাজেডি' নামের যোগ্য হইতে পারে কি? নিশ্চয়ই অধ্যাপক রায়চৌধুরী মহাশয় এইরূপ বলিতে চাহেন না যে নাটকখানি ট্র্যাজেডি, তবে ট্র্যাজেডির যাহা ধর্ম্ম তাহা ইহাতে নাই।

আর একটী কথাও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা উচিত। অধ্যাপক রায়চৌধুরী মহাশয় 'Pathetic' এবং 'Tragic'-এর যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা যেমন অনির্দ্দেশ্য, তেমনি অসার্থক হইয়াছে। করুণরসের প্রাচুর্য্য Pathetic-এর লক্ষণ, এই পর্য্যন্ত বোধগম্য, কিন্তু "আনন্দময় প্রোজ্জ্বলতা"কে ট্র্যাজেডির লক্ষণ বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করায় অস্পষ্টার্থক শব্দন্যাসই করা হইয়াছে। তারপর করুণরসের প্রাচুর্য্য থাকিলে কোন নাটক ট্র্যাজেডি হইতে পারে কিনা এ সম্বন্ধে আশানুরূপ বিচার না করায় অধ্যাপক রায়চৌধুরীর

আলোচনা ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া আছে। প্যাথেটিক ও ট্র্যাজিক পরস্পর বিরুদ্ধ কি না—করুণ রসাত্মক ঘটনার প্রাচুর্য্য থাকিলে নাটক ট্র্যাজেডি হইতে পারে কি-না—এ সম্বন্ধে আরো স্পষ্ট আলোচনা না করিয়া মন্তব্য ছুড়িয়া মারা অনুচিত কার্য্য। এই প্রসঙ্গে *'Tragedy'* গ্রন্থলেখক W. MacNeile Dixon মহাশয়ের মন্তব্য স্মরণ করা যাইতে পারে—"Naked Tragedy overlooks shades of character. Its essence is that such moving things happened to a man, a human being like ourselves. Its power lies in the events and as the primitive stories and ballads of all races give evidence, it is enough however undifferentiated the characters, if the situation stirs in us the extremes of pity and alarm." লক্ষ্য করিবার বিষয় যে— "extremes of pity and alarm" উদ্রিক্ত করাই ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য। ট্র্যাজেডির প্রথম সূত্রকার আরিষ্টটলও pity এবং fear—এই দুইটী আবেগের উদ্রেক ও মোক্ষণকেই ট্র্যাজেডির মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়াছেন; যদিও সমালোচক 'নিকল' মহাশয় *Theory of Drama* গ্রন্থে ট্র্যাজেডির রস সম্বন্ধে নূতন মত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ট্র্যাজেডি আসলে বিস্ময়-ভাবকেই (emotions of awe) জাগাইতে চাহে; কিন্তু শেক্স্‌পীয়রের 'King Lear'কে লইয়া নিকল সাহেব খুবই মুসকিলে পড়িয়াছেন এবং স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে নাটকখানিতে 'প্যাথেটিক' দৃশ্য রহিয়াছে * এবং 'sensational and

* With Shakespeare we do sometimes descend to pathetie scenes and it is exceedingly difficult to determine whether this is due to that spirit existing in the early seventeenth century which gave rise about 1603 to the romantic tragi-comedies of Beaument and

melodramatic incident'ও নাটকে কম নাই ইহাও দেখান চলে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের প্রভাব বড় প্রভাব। শেক্‌সপীয়রের 'King Lear'কে (শেক্‌সপীয়রের ত্রি-মূর্ত্তি ট্র্যাজেডির অন্যতম—ম্যাক্‌বেথ, হ্যাম্‌লেট্ ও কিঙ লিয়র) করুণরসের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও—এমন কি রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ সত্ত্বেও—বিখ্যাত ট্র্যাজেডির আসনখানিই দেওয়া হইয়াছে। অতএব, এ সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে যে করুণরসের প্রাচুর্য্য থাকিলেই কোন নাটকের পক্ষে ট্র্যাজেডি হওয়া অসম্ভব —এ কথা সত্য নহে।

এইবার, অধ্যাপক অজিতবাবুর মত বিশ্লেষণ ও বিচার করা যাইতেছে। অধ্যাপক ঘোষের আপত্তি :—

(ক) যোগেশের মধ্যে ট্র্যাজিক চরিত্রের কোন ধর্ম্মই নাই—

(১) উত্থান-পতন—ক্রমবিকাশ নাই।

(২) "এমন কোন কাজ" অথবা "মারাত্মক ভুল" যাহাতে ট্র্যাজেডি অবশ্যম্ভাবী হয়—নাই।

(৩) নায়ক নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট পুরুষ।

(খ) ঘটনার পিছনে যথেষ্ট শক্তিশালী এবং বিশ্বাস্য কারণ নাই।

সুতরাং প্রথম আলোচ্য—যোগেশের মধ্যে ট্র্যাজিক চরিত্রের কোন ধর্ম্ম আছে কিনা ?

প্রথমেই দেখা যাক্, যোগেশের ট্র্যাজেডির নায়ক হইবার ব্যক্তিগত যোগ্যতা আছে কি-না ?

এ সম্বন্ধে যে সাধারণ নির্দ্দেশ আছে তাহা এই যে, ট্র্যাজেডির নায়ক অতিশয় ধার্ম্মিক বা অতিশয় ন্যায়নিষ্ঠ হইবেন এমন নহে, আবার অতিশয় মন্দ লোক হইবেন তাহাও নহে (a man not

Fletcher or whether it is because Shakespeare felt the necessity of pathos both as a species of relief from too high tension and as a kind of contrast to the genuine tragic sternness.

pre-eminently virtuous and just .)। এ সম্বন্ধে ডিক্‌সন্ সাহেব লিখিয়াছেন, "Yet on the other hand, if we are to sympathise with him, good in some sense the hero of tragedy must be"—অর্থাৎ নায়ক মোটামুটি ভাল লোক—"good in some sense" হইবেন।

এই হিসাবে যোগেশের মধ্যে নায়কের যোগ্যতা নিশ্চয়ই আছে। যোগেশ অতিশয় সাধু না হইলেও "অসাধু ব্যক্তি" নহেন। মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃবাৎসল্য, ন্যায়নিষ্ঠা, উদার মনোবৃত্তি এইরূপ নানা সদ্‌গুণের আকর্ষণের কেন্দ্র তাঁহার চরিত্র। সুতরাং একটী বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল যে, যোগেশের ট্র্যাজেডির নায়ক হইবার ব্যক্তিগত যোগ্যতা আছে। দ্বিতীয়তঃ, লক্ষণীয়—যোগেশের চরিত্রে ট্র্যাজিক চরিত্রের প্রধান লক্ষণ "radical defect in his character" অথবা "error of judgement" পাওয়া যায় কি না। কারণ সমালোচকরা বলেন যে, ট্র্যাজেডির নায়কের পতন বা শোচনীয় পরিণাম ঘটিবে চরিত্রের কোন অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা বা প্রবণতার জন্য অথবা কোন মারাত্মক হিসাবের ভুলের জন্য। সমালোচক ব্র্যাড্‌লের মতে—"no suffering that does not spring in great part from human agency and in some degree from the agency of the sufferer is tragic"···। কিন্তু যে বিষয়টী বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে সে এই যে, কেবলমাত্র 'এমন কোন কাজ' এবং 'মারাত্মক ভুল'ই ট্র্যাজেডি ঘটাইয়া থাকে এমন নহে, চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা বা প্রবণতা—কোন একটী বিষয়ে অত্যধিক প্রসক্তিও (fixation) ট্র্যাজেডি ঘটাইতে পারে। ম্যাক্‌বেথ্‌ 'এমন কোন কাজ' দ্বারা, কিঙ্‌ লিয়র মারাত্মক ভুল করিয়া আর হ্যামলেট অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতার ফলে শোচনীয় পরিণাম অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং

দেখা যাইতেছে যে, ট্র্যাজিক চরিত্রে শুধু 'মারাত্মক ভুল' অথবা 'এমন কোন কাজ' (ম্যাকবেথ নাটকে হত্যা) থাকিবে তাহাই নহে— 'অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা বা প্রবণতা'ও থাকিতে পারে। (অজিতবাবু 'মারাত্মক ভুল' এবং 'এমন কোন কাজ' এই দুইটী বিষয়েই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন, 'অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা'র প্রতি দৃষ্টি পড়িলে অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতেন।)

এখনকার প্রশ্ন—যোগেশ চরিত্রে এমন কোন 'অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা' কি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? যোগেশ যে ধাপে ধাপে শোচনীয়তার গভীরতার দিকে নামিয়া গিয়াছেন তাহার কারণ স্বরূপে কোন একটী বিশেষ ঝোঁককে কি দায়ী করা চলে না? ইহা তো সত্য কথা—যোগেশ যদি গণেশ-পাল্টানো ব্যবসায়ী হইতেন, জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি শয়তানী সদ্‌গুণগুলি যদি কোন অবস্থাতেই তাঁহার কাছে অপ্রীতিকর ও অরুচিকর না হইত, তাহা হইলে ব্যাঙ্কে বাতি জ্বালিয়া তাঁহার যত বড় ক্ষতিই করুক, তাঁহাকে কেন্দ্রচ্যুত করিতে পারিত না, 'আর এক যোগেশ' করিয়া ফেলিতে পারিত না। হ্যামলেটের জননী হ্যামলেটের খুল্লতাতকে পতিত্বে বরণ করিয়া হ্যামলেটকে যেমন একটী নূতন পরিবেশের সম্মুখীন করিয়াছিল মাত্র, তেমনি ব্যাঙ্ক বাতি জ্বালিয়া যোগেশকেও নূতন এক পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছিল মাত্র। কিন্তু হ্যামলেট যেমন নিজের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতার জন্য—বিশিষ্ট মানসিক গঠনের জন্য—আগত অবস্থার সহিত সুস্থভাবে অভিযোজন করিতে পারে নাই, তেমনি যোগেশও নূতন পরিস্থিতির সহিত বিশিষ্ট মানসিক প্রবণতার জন্য প্রকৃতিস্থভাবে বুঝাপড়া করিতে পারেন নাই। ব্যাঙ্ক বাতি জ্বালিয়া যোগেশকে যে মহাসমস্যার সম্মুখে দাঁড় করাইয়াছিল, যোগেশ সে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারেন নাই এবং পারেন নাই বলিয়াই

অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িলেন—আঘাতের পর আঘাত খাইয়া একেবারেই 'আর এক যোগেশ' হইয়া উঠিলেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের অন্তর্দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া দেখা যায়—"যোগেশের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা—তাঁহার সুনাম-সুযশের আকাঙ্ক্ষাই 'প্রফুল্ল' নাটকে ট্র্যাজেডির কারণ।……সুনাম-রূপ একটা abstraction এর উপাসক যোগেশকে সংযমভ্রষ্ট করিয়া নাটকখানিকে ট্র্যাজেডিতে পরিণত করিয়াছে।" অতএব দেখা যাইতেছে যে, যোগেশ চরিত্রে ট্র্যাজিক চরিত্রের বড় একটী উপাদান—'radical defect'ও রহিয়াছে। যোগেশ "এমন কোন কাজ" বা "মারাত্মক ভুল" না করিলেও শুধু 'অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা'র জন্যই নায়কত্ব দাবী করিতে পারেন। প্রসঙ্গত ইহাও স্মরণীয় যে, ট্র্যাজেডি মাত্রেই এক ধরণের নহে। সমালোচক ব্রাড্‌লে দেখাইয়াছেন, ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ও তজ্জনিত ক্লেশের মূলে যদি মানুষের ঘটানো ঘটনার এবং আত্মকৃত ব্যাপারের প্রেরণা থাকে, তাহা হইলে ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যের মধ্যে পতন এবং আনুষঙ্গিক দুঃখভোগও ট্র্যাজেডি-করুণ হইয়া উঠিবে।

তৃতীয়ত :, নায়কের চরিত্রে উত্থান-পতন ও ক্রমবিকাশের প্রশ্ন—নিষ্ক্রিয়তা-নিশ্চেষ্টতার প্রশ্ন।

এই প্রশ্নটীর পরিপাটি আলোচনা 'ট্র্যাজেডির প্রকার বা ধরণ' আলোচনার অপেক্ষা রাখে। উত্থান-পতন, ক্রমবিকাশ, নিষ্ক্রিয়তা-সক্রিয়তা, এই সকল শব্দগুলির তাৎপর্য্য অবধারিত না থাকায় আলোচনা-ক্ষেত্রে ইহারা অনেক অনর্থের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এখন উত্থান-পতন বলিতে যদি এইরূপ বুঝানো হয় যে নায়ক তৎকালীন বর্ত্তমান অবস্থা হইতে প্রথমে অভ্যুদয়ের দিকে অগ্রসর হইবেন এবং পরে ধীরে ধীরে পতনের অভিমুখে নামিতে থাকিবেন তাহা হইলে দেখা যাইবে যে অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত ট্র্যাজেডির নায়কের

মধ্যে উত্থান ঘটে নাই। ‘কিঙ্‌ লিয়র’ নাটকের বা হ্যামলেট নাটকের মত অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির নায়কেও সুস্পষ্ট উত্থান-পর্য্যায় পাওয়া যায় না—আর উক্ত নাটকের নায়ক-চরিত্রে ক্রম-বিকাশ অপেক্ষা ক্রম-অনুবৃত্তিই দেখা যায়, দেখা যায় নানা অবকাশে একই ভাবের নানারূপ প্রকাশ। আর উত্থান-পতন বা ক্রমবিকাশ বলিতে যদি এমন বুঝানো হয় যে নায়কের মধ্যে নানা ভাবের দ্বন্দ্ব চলিবে, কখনও একটী প্রধান হইয়া অন্যটীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে,—এইরূপ পরিবর্ত্তনশীলতাই অবিরাম চলিতে থাকিবে, তাহা হইলে যোগেশের চরিত্রে উত্থান-পতন একেবারে নাই, এ কথা বলা চলে না। যোগেশের মধ্যে ক্রিয়াশীলতা নাই এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে—যোগেশ, সদাশয় যোগেশ—সুখী পরিবারের মধ্যমণি যোগেশ—ব্যাঙ্কের বাতি জ্বালার অসহ্য জ্বালায় এবং নৈরাশ্যের তাড়নায়, বিস্মৃতির ঐকান্তিক কামনায় মদ খাইয়া ঢলাঢলি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেজন্য তাঁহার মধ্যে লজ্জা ও অনুতাপ কম আসে নাই। এই অনুতাপের সহিত সর্ব্বনাশের নৈরাশ্যের এবং বেদনার তাপের বুঝাপড়াও কম হয় নাই। কিন্তু আঘাতের পর প্রথম আঘাত আসিল—সুরেশের চোর হওয়ার সংবাদ। এই সংবাদ যোগেশের কাছে কম ‘সর্ব্বনাশ’ নহে। যোগেশ হাল ছাড়িয়া দিলেন—মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন—“চেষ্টায় কোন কার্য্যই হয় না।” ইহার পরেও যোগেশ সামলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ডাক্তাররূপী কাঙালী যখন রমেশকে নির্দ্দেশ দিলেন……“একটু মাইলড্‌ ডোজে খেতে দিন”, যোগেশ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন—“না, মদ আর ছোব না”। “কিন্তু গুণধর ভাই শয়তান রমেশ ঔষধ বলিয়া সদাশয় দাদাকে ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া বেশ একটু নেশাগ্রস্ত করিয়া-ছিল আর শুধু তাহাতেই ক্ষান্ত না হইয়া যে দাদা পিতার অধিক

স্নেহে ছোট দুই ভাইকে এক রকম বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, সেই স্নেহময় শিবতুল্য দাদাকে চরমতম আঘাত দিয়া বসিল—রমেশ সুরেশের জবানিতে যোগেশকে মুখের উপরেই জোচ্চোর প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল। লোকে জোচ্চোর বলিবে ভয়ে যে যোগেশ সম্পত্তি বেনামী করার নামে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই যোগেশকে সেই জোচ্চোর নামই দিল রমেশ—তাঁহারই সহোদর ভাই —সন্তান-স্নেহে লালিত-পালিত রমেশ। যোগেশের মত দাদার কাছে উহা বাস্তবিকই—"the most unkindest out of all". যোগেশ নির্বাক স্তব্ধ বিক্ষোভে একটীমাত্র "হুঁ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া বোধ হয় বিষের বদলেই মদ খাইয়া নিজেকে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহারা করিতে চেষ্টা করিলেন। এই আগুনেই আহুতি পড়িল যখন তিনি শুনিলেন—মর্টগেজ তিনি সই করিয়া দিয়াছেন—বাহিরেও জোচ্চোর নাম রটিয়া গিয়াছে। ঘরে বাহিরে জোচ্চোর নাম রটিয়া যাওয়ার চেয়ে কোন বড় সর্ব্বনাশ যোগেশের আর কি হইতে পারে? যাহারা বেনামী করিয়া সম্পত্তি বাঁচাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন— মা উমাসুন্দরী, পত্নী জ্ঞানদা—সকলেরই প্রতি তাঁহার নিদারুণ অভিমান দেখা দিল, যোগেশ নিজেকে একেবারেই নিঃসঙ্গ করিয়া তুলিলেন—আপনাকেই হারাইয়া ফেলিলেন; সুতরাং এ কথা কোন মতেই বলা চলে না—অন্ততঃ যুক্তির ধার ধারিলে—যে যোগেশের চরিত্র একেবারে নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চেষ্ট চরিত্র। যোগেশের চরিত্রে 'the sight of losing struggle' (Wood Bridge) একেবারে দেখা যায় না এমন নহে। অতএব শ্রীযুক্ত ঘোষের অভিযোগটী অমূলক।

অধিকন্তু এ কথাও স্মরণীয় যে, 'passive' হইলেই ট্র্যাজেডির নায়ক হওয়া চলে না এমন কোন কথা নাই। এমন অনেক ট্র্যাজেডি

আছে যেখানে sufferingই মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয় হয় এবং নায়ক হয় "the hero (যিনি) is more acted upon than acting". * যেমন, "*Hamlet* is peculiar in having but one figure of tragic magnitude ; *Othello* in being formed on a peculiar plan and in dealing largely with intrigue, *Lear* in reverting technically to the cronicle-history tradition and in adopting an actionless hero ; and *Mackbeth* in transforming a villain into a hero."—*The Theory of Drama*—Page 171.) সুতরাং এ কথা বলা যাইতে পারে যে যোগেশের চরিত্রে ট্র্যাজেডি-চরিত্রের ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অজিতবাবু যে আপত্তি তুলিয়াছেন তাহা সমর্থনযোগ্য নহে।

তারপর বিচার্য্য—প্রত্যেক ঘটনার মূলে যথেষ্ট শক্তিশালী ও বিশ্বাস্য কারণ আছে কি না।

তত্ত্বতঃ যাহাই হউক, কার্য্যতঃ প্রত্যেক ঘটনার যথেষ্ট শক্তিশালী কারণ সর্ব্বদা পাওয়া যায় না, আর পাওয়া গেলেও নিক্তির ওজনে উহার যথেষ্টতা পরিমাপ করা যায় না। শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যেও এমন সব ঘটনার অস্তিত্ব পাওয়া যায় যাহার মূলে যথেষ্ট শক্তিশালী ও বিশ্বাস্য কারণ পাওয়া যায় না—যাহাকে এক কথায় ধরিয়া লওয়া বলা চলে। শেক্সপীয়রের 'কিঙ্ লিয়র' নাটকখানির কথাই ধরা যাক : প্রথমেই যে ঘটনাটী ঘটানো হইয়াছে তাহার ঔচিত্য খুবই প্রশ্নাধীন—পিতৃভক্তির অনুপাত অনুযায়ী রাজ্যবিভাগ যদিই বা সম্ভাব্য বলিয়া মনে করা যায় (সত্যই যাহা মনে করা যায় না), এই কারণে কনিষ্ঠা কন্যাকে ত্যাজ্যকন্যা করা এবং তদুপরি অভিসম্পাতাদি দেওয়া যথেষ্ট 'কিন্তু'-জনক ব্যাপার। ঘটনাটীকে স্বতঃসিদ্ধের মত গ্রহণ

* 'সাজাহান নাটকের আলোচনা দ্রষ্টব্য—"নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার", প্রথম খণ্ড।

করিলেই নাটকের পরবর্ত্তী ঘটনার আবেদন কার্য্যকরী হইয়া থাকে। তেমনি ম্যাক্‌বেথ নাটকেও স্ত্রী ম্যাকবেথের অমানুষিক হিংস্রপ্রবৃত্তি এবং স্নায়ুশক্তি ধরিয়া-লওয়া-বিষয়—যেমন প্রফুল্ল নাটকের রমেশ চরিত্রটী একটী ধরিয়া-লওয়া শয়তান চরিত্র। এইরূপ 'ধরিয়া-লওয়া' বৈশিষ্ট্যের ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিচার করিতে যাওয়া এক হিসাবে নিষ্ফল চেষ্টা। রমেশকে সম্পত্তিলোভী কুটিল এবং নিষ্ঠুররূপে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। রমেশ অমানুষিক হইয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং তাঁহার পক্ষে বলিবারও কিছু নাই, কিন্তু কেহ যদি বলেন রমেশকে অত অমানুষিক করা উচিত কার্য্য হয় নাই বা রমেশকে অত লোভী, কুটিল ও নিষ্ঠুর করা অন্যায় হইয়াছে, তাহা হইলে নাট্যকারের পক্ষ হইতে এই কথাই বলা চলে—এই ধরণের মন্তব্য করা ব্যক্তিগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করা ছাড়া আর কিছুই নহে।

যাহাই হউক, এইবার ঘটনার মূলে বিশ্বাস্য কারণ আছে কি-না বিচার করা যাউক। দেখা যাউক প্রফুল্ল নাটকের প্রধান প্রধান ঘটনা (অজিতবাবুর মনে-ধরা ঘটনাগুলি) ঘটিতে পারে কিনা—ঘটিলে সম্ভাব্যের মাত্রা ক্ষুণ্ণ হয় কি না।

(১) নাটকের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ব্যাঙ্কের বাতি জ্বলা। এই ঘটনার সম্ভাব্যতা প্রশ্নাধীন করিলে, কোনও মীমাংসাতেই পৌছান যাইবে না। তবে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, 'ব্যাঙ্কের বাতি জ্বালা' ব্যাপারটী তদানীন্তন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অসম্ভব ঘটনা নহে; অতএব ঘটনাটীর সম্ভাব্যতা প্রশ্নাধীন হইতে পারে না।

(২) দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা—যোগেশের মদ খাওয়া। যোগেশ যে যুগের লোক—যে-সমাজের লোক, সে-যুগে—সে-সমাজে মদ প্রায়—যাহাকে বলে 'ডালভাত' হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জ্ঞানদার ভাষায় বলা যায়—'সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ির দোকান, কিনে

খেলেই হল।' এই সময়ে মেয়েলোকের পক্ষে 'ভাতার-পুত' সামলানো মহাসমস্যাগুলির অন্যতম ছিল। এমন কি যাঁহারা গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ছিলেন তাঁহারাও পরিমিত মাত্রায় পান করিতেন—ক্লান্তি-প্রশমন ঔষধ হিসাবেই। এইরূপ অবস্থার পটভূমিতেই যোগেশকে দেখিতে হইবে এবং দেখিলে ইহাই দেখা যাইবে যে যোগেশের প্রথম মদ খাওয়া মাতালের মদ খাওয়া নহে এবং শেষের মদ খাওয়াও বাস্তবিকই শোচনীয়।

(৩) তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা—জ্ঞানদার পথে পড়িয়া মরা। জ্ঞানদার মৃত্যু অতি মর্ম্মস্পর্শী তীব্র ঘটনা এবং পথে পড়িয়া মরা ঘটনা-পরম্পরা-নিয়ন্ত্রিত হইলেও মনে হয় যেন চাঞ্চল্যকর কোন কিছু ঘটাইবার জন্যই আয়োজিত হইয়াছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই যে, নাট্যকার জ্ঞানদার পথে পড়িয়া মরার জন্য উদ্যোগ কম করেন নাই।

যোগেশ জ্ঞানদার বুকে লাথি মারিয়া টাকা কাড়িয়া লইয়াছিলেন—জ্ঞানদার দুঃখ-যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট ভাঙ্গা বুক লাথির আঘাতে যথার্থই ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন—মুখ দিয়া রক্ত বাহির হওয়ায় বস্তির অধিকারিণী স্বাভাবিক নির্ম্মমতায় এবং স্বার্থবুদ্ধিতেই বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। এইভাবে জ্ঞানদা পথে আসিয়া দাঁড়াইলেও, একথা মনে না আসিয়া যেন যায় না যে, শেষ পর্য্যন্ত 'পথে পড়িয়া মরা'য় জ্ঞানদার কোন হাত না থাকিলেও, নাট্যকারের বেশ খানিকটা হাত আছে—তবে এ হাত থাকিবেই। জলাভূমির পাশে ঝড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া রাজা লিয়রের চুল ছিঁড়িয়া যে আর্ত্তনাদ ও অভিশাপ করিয়াছিলেন তাহার মূলে শেক্সপীয়রের হাতই বেশি চোখে পড়ে। তাহা সত্ত্বেও উক্ত ঘটনাটী 'কিঙ লিয়র' নাটকখানিকে 'মেলোড্রামা' করিয়া তুলে নাই। সেইরূপ, ঘটনাটী আমাদের কাছে যত অপ্রীতিকরই হউক, সম্ভাব্য

উদ্দীপক (stimulus) হিসাবে উহার কার্য্যকারিতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অধিকন্তু জ্ঞানদার মৃত্যুকে নাট্যকার ঘটনার টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়া বুনিয়া দিয়াছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের মন 'কিন্তু' 'কিন্তু' করিলে নাট্যকার নিরুপায়।

(৪) চতুর্থ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—প্রফুল্লের মৃত্যু। রমেশ যে-ধরণের নির্ম্মম শয়তান, সে-ধরণের শয়তানের হস্তে প্রফুল্লের মৃত্যু একটুও অস্বাভাবিক নহে। পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় মত্ত হইয়া রমেশ ভ্রাতুষ্পুত্র যাদবকে বিষপ্রয়োগে হত্যার জন্য যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, প্রফুল্ল সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিতে অটুটভাবে বদ্ধপরিকর হইয়া-ছিলেন; ফলে সমগ্র আক্রোশের জ্বালামুখ প্রফুল্লের দিকেই উৎক্ষিপ্ত হইল। প্রফুল্ল যেমন তীব্র প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, রমেশ তেমনি তীব্র প্রতিক্রিয়া লইয়া প্রফুল্লকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই হিসাবে প্রফুল্লের মৃত্যু সম্ভাব্যের গণ্ডীর বাহিরে নহে, আকস্মিকও নহে, এমনকি অস্বাভাবিকও নহে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে,—জ্ঞানদার কি প্রফুল্লের কাহারও মৃত্যুকে যথার্থ 'আকস্মিক মৃত্যু' বলা চলে না এবং উল্লিখিত ঘটনার পিছনে বিশ্বাস্য কারণ নাই এমন কথাও বলা চলে না। এইরূপ অবস্থায় শ্রীযুক্ত ঘোষের মন্তব্য সমর্থনীয় নহে বলাই বাহুল্য।

অধিকন্তু আর একটী কথাও এখানে স্মরণীয় যে, যোগেশ জাতীয় নায়ক অবলম্বনে ট্যাজেডি না হইয়াছে বা না হইতে পারে এমন নহে। '*The Theory of Drama*'-গ্রন্থে Tragic Hero অধ্যায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় নিকল সাহেব লিখিয়াছেন—"Finally there is perhaps one other species of hero that might be considered, again a subdivistion of the wrongly acting character. In this type the hero

accepts a life of crime not because of some flaw in his being, but because of circumstances which operate harshly against him and in his crimes he remains honest and pure-souled." যোগেশ চরিত্রে যে এই ধরণের ছাপ আছে, আশা করি, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের সিদ্ধান্ত

'প্রফুল্ল' নাটকের নায়ককে ট্র্যাজেডি-করুণ না বলিবার পক্ষে যে যে যুক্তি দেখান হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিবার পরে এবং যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিবার পরে এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারা যায় যে, 'প্রফুল্ল' একখানি সামাজিক ট্র্যাজেডি-করুণ নাটক এবং ইহার কেন্দ্রীয় চরিত্র যোগেশে 'radical defect' ছাড়াও "the flaw arising from circumstances" রহিয়াছে। কিন্তু নাটকখানির গঠনে পরিপাট্যের দৈন্য এবং কয়েকটী ঘটনায় অতিরঞ্জনের আভাস এবং ভাবের ঐশ্বর্য্য কম থাকায় নাটকখানি প্রথম শ্রেণীর কবিকর্ম্মে পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া নাটকখানিকে মেলোড্রামার স্তরে নামাইয়া দেওয়া চলে না, কারণ, যদিও নাটকের কাহিনীতে হ্যামলেট নাটকের কাহিনীর মত melodramatic or sensational elements in the plot না রহিয়াছে এমন নহে, তবু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যেরূপ inwardness থাকিলে universality নামক গুণ প্রকাশ পায় সেইরূপ inwardness প্রফুল্ল নাটকে আছে। *

আর ঐ অন্তর্মুখিনতা (inwardness) আছে বলিয়াই নাটক-

* দ্রষ্টব্য: 'Even a high tragedy such as Hamlet, may have decidedly melodramatic or sensational elements in the plot.'

খানিকে "মেলোড্রামা" বলা চলে না। অধিকন্তু যে ধরণের ঘটনার আকস্মিকতা এবং অসঙ্গতি থাকিলে নাটক মেলোড্রামায় অবনত হইয়া যায়, সে ধরণের আকস্মিকতা ও অসঙ্গতি নাটকের ঘটনায় নাই। ফলে নাটকখানিকে ট্র্যাজেডির শ্রেণীতেই স্থান দেওয়া যুক্তিযুক্ত। কারণ নাটকখানির মধ্যে inward appeal আছে —একথা স্বীকার করিতে হইবে। *

নাটকের নায়ক ও নামকরণ

প্রফুল্ল নাটকের নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং নাটকের নামকরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং উঠিবার যথেষ্ট অবকাশও আছে। নাট্যকার নারী-চরিত্র 'প্রফুল্ল'র নামানুসারে নামকরণ করিয়াছেন এবং সেই হিসাবে নাটকখানির কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্য্যাদা প্রফুল্লেরই পাওয়া উচিত (অবশ্য ন্যায়তঃ) আর নাটকখানি "She tragedy" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সমস্যা এই যে নাটকে প্রফুল্লকে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্য্যাদা দেওয়া সম্ভব নহে · যদিও প্রফুল্লের জীবনেও শোচনীয় পরিণাম দেখা দিয়াছে। গঠনের দিক দিয়া এবং প্রাধান্যের হিসাবে এই নাটকে যোগেশই "কেন্দ্রীয় পুরুষ" এবং যোগেশের "ট্র্যাজেডি"ই নাটকে মুখ্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অতএব প্রশ্ন এই—নাট্যকার নামকরণে প্রফুল্লের প্রাধান্য কেন দিলেন? আমরা দেখি—কেবলমাত্র পঞ্চম অঙ্কেই প্রফুল্লের উপরে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে এবং এখানেই প্রফুল্লকে কিছুটা প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, আর অন্যান্য

* Farce and Melodrama will be found to be distinguished from fine comedy and from high tragedy in that they have nothing or practically nothing that makes an inward appeal although on the other hand, even a high tragedy such as Hamlet, may have decidedly melodramatic or sensational elements in the plot,………"

চরিত্রের মুখেও (মদন, ভজহরি) প্রফুল্লের মাহাত্ম্য-খ্যাতি শোনানো হইয়াছে। অধিকন্তু প্রফুল্লের মুখেও স্বকীয় প্রাধান্যের স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে—"আমি তোমায় মাকড়ী দিয়েই সর্ব্বনাশ করেছিলাম"। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সমগ্র নাটকের আবয়বিক সংস্থানের হিসাবে প্রফুল্ল সর্ব্বাধিক প্রাধান্য দাবী করিতে পারে না এবং বিশেষতঃ ট্র্যাজেডির আঙ্গিক ও ভাবিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া প্রফুল্লের দাবী গ্রাহ্য হইতে পারে না। তবে 'প্রফুল্ল' নাম কেন দেওয়া হইল?—শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু মহাশয় "বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" গ্রন্থে 'প্রফুল্ল' নামকরণের একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কারণটী এই—"বস্তুতঃ আমাদের প্রেমপূর্ণ প্রাচীন সংসারের আদর্শ ফিরাইয়া আনিবার জন্য স্নেহময়ী প্রফুল্লর আত্মবির্জ্জনই এই নাটকটীর মেরুদণ্ড এবং সেইজন্যই নাট্যকার ইহার নাম দিয়াছেন—"প্রফুল্ল"। কেবল যোগেশের অধঃপতন ও তাহার শোচনীয় পরিণাম দেখানই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে জ্ঞানদার মৃত্যু বা হত্যার সহিতই নাটক শেষ হইত—কাহিনীটীকে এতদূর টানিয়া আনিবার সার্থকতা থাকিত না। অধিকন্তু 'বংশরক্ষা'র জন্য পাগল মদন ঘোষের চরিত্র সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়িত।" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের সিদ্ধান্ত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নাট্যকারের উদ্দেশ্য—অন্ততঃ নৈতিক উদ্দেশ্য যে শ্রীযুক্ত অধ্যাপক আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু শৈল্পিক উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে—শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়ের মন্তব্যে এই আপত্তি করা যাইতে পারে যে, যোগেশের শোচনীয় পরিণাম দেখানো নাটকখানির উদ্দেশ্য হইলে জ্ঞানদার মৃত্যু বা হত্যার সহিতই নাটক শেষ হইবে—এ কথা বলা চলে না। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে 'প্রফুল্ল' নাটক যোগেশের সাজানো বাগানের শুকাইয়া

যাওয়ার করুণ কাহিনী এবং সেই বাগানে রমেশের স্থানও কম নহে। "কাহিনীটাকে এতদূর টানিয়া আনিবার সার্থকতা" ইহাই যে—জ্ঞানদার মৃত্যুর পরে প্রফুল্লের মৃত্যু, রমেশের পরিণাম এবং অন্যান্য ঘটনা—সাজানো বাগানের শুকাইয়া যাওয়ারই চরম দৃশ্য। এই কারণেই শেষ দৃশ্যের শেষাংশে যোগেশ প্রবেশ করিয়াছেন এবং অনির্ব্বচনীয় অন্তর্ব্বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বলিয়াছেন—"আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল!" বাস্তবিক এক হিসাবে নাটকটী যেমন যোগেশেরই সাজানো বাগানের শুকাইয়া যাওয়ার ট্র্যাজেডি, অন্য হিসাবে ইহাকে একটী সমগ্র পরিবারের ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবার—একটী সুখী পরিবারের নিদারুণ পরিণামের আবর্ত্তে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবার ট্র্যাজেডিও বলা যাইতে পারে। এই হিসাবে প্রফুল্লকে পারিবারিক সংহতির ধারণী শক্তির প্রতীকরূপে দেখা যাইতে পারে—এবং বলা যাইতে পারে যে পরিবারের বিপর্য্যস্ত হওয়া প্রফুল্লেরই ট্র্যাজেডি, অতএব নামকরণ অন্যায় হয় নাই। আর একটু অগ্রসর হইয়া কেহ হয়ত বলিবেন—ইহাকে "heroless tragedy" বলাই সঙ্গত—অর্থাৎ ইহাকে ব্যক্তিবিশেষের (যোগেশের) ট্র্যাজেডি না বলিয়া একটা নৈতিক সংস্থার ট্র্যাজেডি বলাই সঙ্গত এবং একাধিক চরিত্রের সমবায়ে ঐ ভাবটীকে অভিব্যক্ত বা নিদর্শিত করা হইয়াছে। অতএব নাটকের ভাবগত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নাটকখানির নামকরণ করা হইয়াছে এবং এইরূপ নামকরণ অন্যায় ব্যাপার নহে। * এই পক্ষের হইয়া এইরূপ বলা যাইতে পারে যে,

* In none of these plays (Galsworthy's 'Strife', 'Justice,' Mr. O. Casey's 'Silver Jassie') does one single figure or one single pair of figures, loom up sufficiently large to take dominating importance

প্রফুল্ল নাটকে কেবল যোগেশের জীবনেই শোচনীয় পরিণাম ঘটে নাই,—উমাসুন্দরী, জ্ঞানদা, প্রফুল্ল সকলের জীবনেই বিপত্তি-পরিণাম ঘটিয়াছে এবং এক হিসাবে রমেশও রেহাই পায় নাই। এই ধরণের খণ্ড খণ্ড বিপত্তি-পরিণাম চরিত্রের সমবায়ে "প্রফুল্ল" এক অখণ্ড বিষাদময় নাটক। এই অখণ্ড বিষাদময়তায় যোগেশের যেমন অংশ আছে প্রফুল্লের এবং অন্যান্য চরিত্রেরও অংশ আছে—তবে বেশী আর কম। অতএব "প্রফুল্ল" নামকরণে আপত্তি করা অনুচিত।

কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নাটকে যোগেশের চরিত্র যতখানি গুরুত্ব লাভ করিয়াছে তাহাতে চরিত্রটীকে dominating importanceএর চরিত্র বলা যাইতে পারে এবং ইহাও দেখানো যাইতে পারে যে যোগেশকে কেন্দ্র করিয়াই ট্র্যাজেডিকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে—আর অন্যান্য প্রত্যেকটী চরিত্রের ট্র্যাজেডি শেষ পর্য্যন্ত যোগেশের ট্র্যাজেডিকেই তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে। অতএব নাটকে যোগেশকেই 'কেন্দ্রীয় পুরুষ'এর মর্য্যাদা দেওয়া উচিত এবং কেন্দ্রীয় পুরুষের নামানুসারে নাটকের নাম করা বিধেয় হইলে নামকরণে ত্রুটি ঘটিয়াছে বলিতে হইবে।

তবে নামকরণের খুব ধরাবাধা নিয়ম নাই বলিয়া খুব নিশ্চিত ভাবে এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নহে। প্রধান চরিত্র, প্রধান উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু প্রভৃতি নানা হিসাবে নামকরণ করা যখন সম্ভব, তখন 'প্রফুল্ল' নামকরণের সার্থকতা একেবারে নাই এমন কথা বলা চলে না ; কারণ পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে এবং দেখানো হইয়াছে যে, নাটকের নৈতিক উদ্দেশ্য অনুযায়ী নামকরণ করিতে চেষ্টা করিলে

in our minds, and we have therefore, no hero or heroes in the older sense of the word, yet each of those plays definitely summons something of a tragic impression.—The Theory of Drama—P 154.

'প্রফুল্ল' নামটী একেবারে অসার্থক নহে। অবশ্য একথাও অবশ্য স্মরণীয় যে, কেন্দ্রীয়ত্বের হিসাবে নাটকের গঠনগত বৈশিষ্ট্য-বিচারে 'প্রফুল্ল' নামকরণ সমর্থনযোগ্য নহে ; কারণ নাট্যকার নাটকীয় চরিত্র হিসাবে প্রফুল্লকে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্য্যাদায় উন্নীত করিতে পারেন নাই—প্রফুল্লের নৈতিক ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার যতই লক্ষ্য থাকুক, এবং প্রফুল্ল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্যের পতাকা হইলেও, প্রফুল্ল নাটকের আঙ্গিক ও ভাবিক পরিণতির প্রধান আলম্বন নহে।

নাটকের সাধারণ সমালোচনা

'প্রফুল্ল' নাটক একখানি সামাজিক ট্র্যাজেডি-করুণ নাটক—যোগেশ নামক একজন সদাশয় উত্তমবিত্ত ব্যবসায়ীর সাজানো বাগানের শুকাইয়া যাওয়ার কথাচিত্র—একটী সুখী পরিবারের একজন কুলাঙ্গারের শয়তানী প্রবৃত্তির ফলে ছিন্নভিন্ন তথা বিপর্য্যস্ত হওয়ার করুণ কাহিনীর নাট্যরূপ।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের অন্যতম বিখ্যাত নাটক এই 'প্রফুল্ল' অন্তর্নিহিত আকর্ষণ-শক্তির বলে বাঙলার নাট্যামোদীদিগের চিত্ত আজন্ম আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে এবং আজও তাহার আকর্ষণ কম লক্ষণীয় নহে। এই আকর্ষণের প্রধান কারণ এই যে, নাটকখানির আবেগ-গতিবেগ (emotional core) এত তীব্র ও সংলক্ষ্য যে দর্শকদিগের চিত্তকে ইহা সহজেই আলোড়িত করিয়া থাকে। এই শক্তিই নাটকখানির জীবনীশক্তি এবং এই শক্তিবলেই নাটকখানি এখনও জীবিত, (চিরজীবী হইবে কি না তাহা ভবিতব্য বলিতে পারে)—প্রাণবত্তাই প্রফুল্ল নাটকের বড় বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু এই প্রাণবত্তার অনুপাতে নাটকে মননশীলতা আশানুরূপ প্রকাশ পায় নাই। সুতরাং 'তস্য হি জীবিতং শ্রেয়ঃ মননেন

ছি জীবন্তি'—এ কথাটী প্রফুল্ল নাটকের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। জীবনের অনুভূতি-পরম্পরাকে মনের চোখে প্রতিভাত করিয়া তোলার—এক কথায়, পরিস্থিতিগত অনুভাব-বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করা বা প্রত্যক্ষ করার জন্য যে পরিমাণ সহৃদয়তার আবশ্যক নাটকখানিতে সেইরূপ সহৃদয়তার নিদর্শন খুবই আছে। কিন্তু অনুভাবকে ভাব-কল্পনায় বিকশিত করিয়া ভাব-সমুজ্জলতা সৃষ্টির মধ্যে শিল্পীর যে প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে, সে বৈশিষ্ট্যের দৈন্য নাটকে সুস্পষ্ট। নাটকখানি অনুভাব-সংবেদক কিন্তু ভাব-সমৃদ্ধ নহে। নাটকীয় চরিত্রগুলিতে বাগ্‌-বিস্তারের অপেক্ষা হৃদস্পন্দনের মাত্রাই অধিক পরিস্ফুট—আবেগ-সমৃদ্ধির অনুপাতে চরিত্রগুলি বাক্‌-কৃপণ; এক কথায় বলা চলে—চরিত্রগুলির হৃদয়বত্তা আছে, মনস্বিতা নাই।

এই কবিত্বহীনতা নাটকখানিকে একটী নিরাভরণ বাস্তবতার ছাপ দিয়াছে সত্য, কিন্তু নাটকের শৈল্পিক মর্য্যাদাও যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। নাটকখানির ভাবিক আকর্ষণ যাহাই বা যতই থাক্, এ কথা অবশ্য-স্বীকার্য্যই বলিতে হইবে যে, নাটকখানির কল্পনা-সুষমা ও মহিমা চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে নাই।

অধিকন্তু অবয়ব-সংস্থানেও 'ভার-সাম্য' ব্যাহত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। নামকরণ-সার্থকতা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখানো হইয়াছে যে নাটকখানির নামচরিত্র নাটকের যথার্থ কেন্দ্রীয় চরিত্র নহে এবং নাটকে তিনটী দিকে ভাব সৃষ্টির চেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র যোগেশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাধান্যের অধিকারী হইলেও শেষ-দিকে প্রফুল্লের প্রতি নাট্যকার আলোকপাত করিতে বেশী চেষ্টা করিয়াছেন এবং সমগ্র পরিবারটীর ট্র্যাজেডি ঘটানোর প্রতিও নাট্যকার লক্ষ্য কম প্রকাশ পায় নাই। এই কারণেই, তিনটী প্রবণতার ফলে নাটকের বক্তব্যটী গো-পুচ্ছাগ্রের মত সঙ্গতিময় হইয়া উঠে নাই।

আর একটী ত্রুটিও উল্লেখযোগ্য। ঘটনার কার্য্যকরী শক্তিকে অসামান্য করিয়া তুলিতে নাট্যকার কয়েক স্থলে "আতিশয্য' ঘটাইয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীমান্ যাদবের উক্তি (যোগেশের পুত্র) মাঝে মাঝে পাকামি এবং গ্যাকামির স্তরে চলিয়া গিয়াছে এবং প্রফুল্লের সরল আন্তরিকতার অভিব্যক্তির মধ্যেও ছেলেমানুষির ছাঁদ বেশ আছে। ইহা ছাড়াও দুই একটী ঘটনা আছে যাহাকে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক বলা চলে না বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলিয়া মনে হয়।

এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও 'প্রফুল্ল' সামাজিক নাট্যসাহিত্যের আসরে এখনও সমাদৃত এবং সামগ্রিক আবেদনের গুরুত্বে এখনও চিত্তাকর্ষক ও জনপ্রিয়। যোগেশ চরিত্রে ভাবাবেগের গভীরতা তথা তীব্রতা এত লক্ষণীয় হইয়াছে যে চরিত্রটীর আবেদন অনেক পরিমাণে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ ও সার্ব্বজনীন হইয়া উঠিয়াছে। করুণ রসের উদ্দীপক হিসাবে যোগেশ এবং তাঁহার সহযোগী চরিত্রগুলি খুবই শক্তিমান এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তারপর, নাটকে চরিত্রের সৃজন অপেক্ষা চরিত্রের প্রদর্শনেরই পরিচয় বেশী পাওয়া যায়। এক যোগেশ ছাড়া প্রায় চরিত্রই একছায়া এবং বিকাশ-বিহীন। শেষ পর্য্যন্ত দুই একজনের চরিত্রে পরিবর্ত্তন আসিলেও তাহার কোন চমৎকারিত্ব প্রকাশ পায় নাই। তবে প্রায় প্রত্যেক চরিত্রেই স্বাভাবিকতার একটা আকর্ষণ আছে।

উপসংহারে এই কথা বলা চলে যে, 'প্রফুল্ল' নাটকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কলিকাতা-জীবনের পটভূমিকায় যে সামাজিক ট্র্যাজেডি উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে উল্লেখযোগ্য হইলেও উৎকৃষ্ট শিল্প-রচনা বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ

"জগতে আজ পর্য্যন্ত অতিবড়ো সাহিত্যিক এমন কেউ জন্মান নি, অনুরাগবঞ্চিত পরুষ চিত্ত নিয়ে যাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাকেও বিদ্রূপ করা, তার কদর্থ করা, তার প্রতি অশোভন মুখবিকৃতি করা যে-কোনো মানুষ না পারে। প্রীতির প্রসন্নতাই সেই সহজ ভূমিকা যার উপরে কবির সৃষ্টি সমগ্র হয়ে সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশমান হয়।"—আত্মপরিচয়

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পরিবেশ-ক্রোড়ে যে শিশুটী ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাঁহার ললাটে যে-কোন অল্পগণিতজ্ঞ বিধাতা-পুরুষ বিশেষ গণনার মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও, অতিনির্ভাবনায় অন্ততঃ এইটুকু লিখিয়া যাইতে পারিতেন—কালক্রমে এই শিশুর অনেক কিছু হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়ঃ বিদ্যালয়ে না গেলেও বা বিদ্যালয় হইতে পালাইলেও বিদ্যার অভাব ইহার ঘটিবে না—বিদ্যাকে ছাড়িতে চেষ্টা করিলেও বিদ্যা ইহাকে ছাড়িবে না, আইন পড়িয়া ব্যারিস্টারের স্বাধীন ব্যবসায়ে মন না দিলে, অথবা ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয়-অগ্রজের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রাজসেবায় দেহমন সমর্পণ না করিলে, অথবা পিতৃদেবের বৈরাগ্য সংক্রামিত হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অকালে গৃহত্যাগ না করাইলে, শিশুটী কেবলমাত্র জমিদার হইয়া জীবন-যাপন করিতে পারিবে না,—ললিতকলার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিবেই এবং বড় একটা কিছু সৃষ্টি করিতে না পারিলেও অন্ততঃ 'তত্ত্ববোধিনী'র মত কোন একটা পত্রিকার সম্পাদক হইয়া সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হইয়া উঠিবে।

বাস্তবিক, বিনা গণনাতেই রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য সম্বন্ধে এই ধরণের একটা অনুমান করা, যে কোনও জ্যোতিষীর পক্ষে সম্ভব ছিল এবং নিম্নলিখিত কারণেই সম্ভব ছিল।

তখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই-ই বাঁধা এবং আশ্চর্য্যকর উভয়ের সম্প্রীতি। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু যে একজন বড় জমিদার ছিলেন তাহাই নহে, একদিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় পুরুষ,—ব্রহ্মের ছিলেন একনিষ্ঠ সাধক, ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার শ্রীতে তাঁহার অন্তরাত্মা ছিল বিমণ্ডিত; অন্যদিকে তিনি ছিলেন সর্ব্ববিধ সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নায়ক—জ্ঞানে ও কর্ম্মে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার মহাব্রতে সুদীক্ষিত ব্রতচারী। অধিকন্তু তিনি ছিলেন —"প্রিন্স" দ্বারকানাথের পুত্র: সেই ঐতিহ্যের ধারাক্রমে তাঁহার পুত্ররা (দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র প্রভৃতি) প্রতীচ্য মানস-অঙ্গনেই লালিত-পালিত। তাঁহার পরিবারের বহিরঙ্গনে প্রতীচ্য পরিবেশ। সত্যই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের এক অদ্ভুত সমন্বয় এবং "যস্মিন্ জীবতি বহবো জীবন্তি" সেই ধরণের এক যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব।

ধর্ম্মান্দোলনের প্রধান কেন্দ্র এই ঠাকুর পরিবার, সামাজিক আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক এই পরিবার, শিল্প সাধনার সাধনপীঠ এই পরিবার, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের "জ্ঞান-ধর্ম্ম কত কাব্য কাহিনীর" সাগর-সঙ্গম এই পরিবার—এক কথায় জ্ঞানের, ভাবের ও কর্ম্মের এক মহা-প্রেরণাক্ষেত্র এই পরিবার।—এই প্রেরণাময় পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম—রবীন্দ্রনাথের দেহ-মনের পুষ্টি ও বৃদ্ধি।

এই পরিবেশের প্রভাবে—বাল্যকালীন দেহ-মনের অভ্যাস-অনু-শীলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয়ের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানসের

সাধারণ-সত্তার পরিচয় রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন—'সেই সকল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা'—

"বাহির হইতে দেখো না এমন করে
আমায় দেখো না বাহিরে
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছে যেথায় সেথা সে নাহিরে।

... ...

মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে
যাহারে কাঁপায় স্তুতি-নিন্দার জ্বরে
কবিরে খুঁজিছ তাহারি জীবন-চরিতে?

কিন্তু জীবন-চরিতকে সূক্ষ্মদর্শী বিশ্লেষণালোকের রশ্মি দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে কবিকে একাধারে খুঁজিয়া না পাওয়া যায় এমন নহে। একথা যদি আপাততঃ স্বীকার করাও যায় যে "কবিকে উপলক্ষ্য করিয়া বীণাপাণি বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশশক্তি, আপনাকে কোন্ আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই দেখিবার বিষয়"—তবুও একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে প্রকাশ-ব্যাপারটী নিরাশ্রয়-নিরালম্ব নহে—প্রকাশের উপাদান ও আকার বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র-সাপেক্ষ। এই সাপেক্ষতার প্রকৃত পরিচয়ের মধ্যেই ব্যক্তিমানসের বৈশিষ্ট্য অন্তর্নিহিত।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানসের প্রকৃতিতে তাঁহার শৈশব এবং বাল্য

শিক্ষাভ্যাসের প্রভাব,—এক কথায় বলা চলে—অসামান্য এবং অপরিহার্য্যরূপে উল্লেখযোগ্য। এই শৈশব এবং বাল্যপরিবেশের সাধারণ পরিচয়, রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় দেওয়া যাক্—

(ক) "সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই"—যদিও "আমাদের ভাষায় একটা কিছু ভঙ্গী ছিল কলকাতার লোক যাকে ইশারা করে বলত ঠাকুরবাড়ীর ভাষা। পুরুষ ও মেয়েদের বেশভূষাতেও তাই চালচলনেও"। (খ) "আমাদের বাড়ীতে আর একটা সমাবেশ হইয়াছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্-পৌরাণিক যুগে ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক"। (গ) "অন্যদিগে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ীর হাওয়া শেক্সপীয়রের নাট্যরস সম্ভোগে আন্দোলিত, স্যার ওয়াল্‌টার স্কটের প্রভাবও প্রবল।" (ঘ) "সন্ধ্যা বেলায় জলতো তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ী দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা। এই নিস্তব্ধপ্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ, লাজুক নীরব নিশ্চল।" (ঙ) "আমি ইস্কুল পালানো ছেলে, পরীক্ষা দিই নি, পাস করি নি, মাস্টার আমার ভাবীকাল সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুল ঘরের বাইরে যে আকাশটা বাধাহীন সেইখানে আমার মন হাঘরেদের মতো বেরিয়ে পড়েছিল…" (চ) "ইতিপূর্ব্বেই কোন একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম লোকে যাকে বলে কবিতা সেই ছন্দ মেলানো মিলকরা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে।…… পয়ার ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকার-বোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম।……এই লেখাগুলি যেমনি হোক

এর পেছনে একটি ভূমিকা আছে—সে হচ্ছে একটী বালক, সে কুণো, সে একলা, সে একঘরে, তার খেলা নিজের মনে।" (আত্মপরিচয়)

(ছ) 'আমার অতি বাল্যকালেই মা মারা গিয়াছিলেন—তখন বোধহয় আমার বয়স ১১।১২ বৎসর হইবে। তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া অমৃতসর হইয়া ড্যালহৌসী পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে যান।.........সেই ভ্রমণটি আমার রচনার মধ্যে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সেই তিন মাস পিতৃদেবের সহিত একত্র সহবাসকালে তাঁহার নিকট হইতে ইংরেজী ও সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতাম এবং মুখে মুখে জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা ও নক্ষত্র পরিচয়ে অনেক সময় কাটিত। এই যে স্কুলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে তিন মাস স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছিলাম, ইহাতেই ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যালয়ের সহিত আমার সংস্রব বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।" (শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র)

(জ) তারপর "ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি (গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) কোনমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্যপথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমার-সম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাক্‌বেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জ্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন"।

(ঝ) "গান গাহিতে......কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না; তখন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর, সংগীতের অবিরল বিগলিত ঝরণা ঝরিয়া তাহার শতকর বর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রং ছড়াইয়া দিতেছে।" *

* "এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি প্রতিভার জন্ম হইল।" (রবীন্দ্রনাথ কেন "গীতিকবি" হইয়াছিলেন সেই "কেন" এখানে পাওয়া যায়)।

উল্লিখিত বিষয় কয়টি চোখের উপর থাকিলে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-মানসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উৎস-পরিচয় স্পষ্টভাবেই পাওয়া যাইবে। বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত এবং ইংরেজী সাহিত্যের শব্দসম্ভারের তথা প্রকাশক্ষমতার উপর অধিকার এবং ধ্বনিতরঙ্গের বা ছন্দের সহিত হৃদয়ের যোগের ফলে ছন্দসংস্কার, বাল্যকালেই কাব্য-রচনার প্রেরণা এবং কল্পনা-প্রবণতা—এক কথায় ভাবুকতা, বিশ্বের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের চেতনা—সমগ্র বিশ্বসত্তার সহিত নিজের অন্তরঙ্গ যোগের উপলব্ধি—এই সকল বৈশিষ্ট্যের কারণ দেখা যাইবে রবীন্দ্রনাথের শৈশব শিক্ষাভ্যাসের মধ্যেই—বাল্যকালের অবস্থার মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে।

এই অবস্থাগুলির প্রভাবের অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণের ঐতিহাসিক পটভূমি হইতে রবীন্দ্রনাথকে বিচ্ছিন্ন করিয়া না দেখিলে দেখা যাইবে যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার জন্মভূমি অলৌকিক জগতে নহে, রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভার উপাদান সম্পূর্ণই ইহলৌকিক এবং প্রতিভার উন্মেষ ঘটিয়াছে লৌকিক কার্য্যকারণতত্ত্বের নিয়ন্ত্রনাধীনেই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রভাবের পূর্ণ পরিচয় লইলে দেখা যাইবে যে রবীন্দ্রনাথের ভাব ভাষা কল্পনা বিষয়, এক কথায় তাঁহার সাহিত্যের বিষয় (Content) এবং আকার (Form) অলৌকিক প্রেরণার ফল নহে এবং তাঁহার রচনার কালক্রমিক বিকাশও বাহ্য পরিবেষ্টনীর আকর্ষণের ফলেই প্রধানতঃ ঘটিয়াছে। নিম্নলিখিত পত্রখানি (শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র—আত্মপরিচয়ে উদ্ধৃত) পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে কবিকেও অবস্থার দাসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে—"আমার জন্মের তারিখ ৬ই মে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ। বাল্যকালে ইস্কুল পালাইয়াই কাটাইয়াছি। নিতান্তই লেখার বাতিক ছিল বলিয়া শিশুকাল হইতে কেবল লিখিতেছি। যখন আমার বয়স ১৬ সেই সময় ভারতী পত্রিকা

বাহির হয়। **প্রধানতঃ এই পত্রিকাতেই আমার গল্প লেখা অভ্যস্ত হয়।** আমার ১৭ বছর বয়সে মেজ দাদার সঙ্গে বিলাত যাই—এই সুযোগে ইংরাজি শিক্ষার সুবিধা হইয়াছিল। লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপক হেনরি মর্লির ক্লাসে ইংরাজি সাহিত্য চর্চ্চা করিয়াছিলাম······সোনার তরীর কবিতাগুলি প্রায় সাধনা পত্রিকাতে লিখিতে হইয়াছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন—চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণ ভার আমাকে লইতে হইয়াছিল। **সাধনা পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরিপরিমাণে ছিল।** এই সময়েই বিষয়কর্ম্মের ভার আমার প্রতি অর্পিত হওয়াতে সর্ব্বদাই আমাকে জলপথে ও স্থলপথে পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে হইত—**কতকটা সেই অভিজ্ঞতার উৎসাহে আমাকে ছোট গল্প রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল।**

সাধনা বাহির হইবার পূর্ব্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। যাঁহারা ইহার জন্মদাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকমলবাবু, সুরেন্দ্রবাবু, নবীনচন্দ্র বড়ালই প্রধান ছিল। কৃষ্ণকমলবাবুও সম্পাদক ছিলেন, সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটগল্প, সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত এইখানেই। ছয় সপ্তাহ কাল লিখিয়াছিলাম, সাধনা চারি বৎসর চলিয়াছিল। বন্ধ হওয়ার কিছুদিন পরে একবৎসর ভারতীর সম্পাদক ছিলাম, **এই উপলক্ষ্যেও গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ কতকগুলি লিখিত হয়।**

আমার পরলোকগত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বিশেষ অনুরোধে বঙ্গদর্শন পত্র পুনরুজ্জীবিত করিয়া তাহার সম্পাদনভার গ্রহণ করি। **এই উপলক্ষ্যে বড় উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হই।** তরুণ বয়সে

ভারতীতে বৌঠাকুরাণীর হাট লিখিয়াছিলাম, ইহাই আমার প্রথম বড় গল্প। ··· ইতি ২৮শে ভাদ্র, ১৩১৭।"

এই পত্রখানির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য এই যে ইহাতে রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনার প্রেরণার সন্ধান পাওয়া যায় এবং ইহাও সঙ্গে সঙ্গে জানা যায় যে পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করায় এবং অন্যান্য পত্রিকার তাগিদেই রবীন্দ্রনাথ রচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। রচনা প্রবৃত্তির মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখী তথা কল্পনাপ্রবণ (introvert) ব্যক্তিসত্তার আত্মপ্রকাশের চেষ্টার এবং উহার বৈশিষ্ট্যের মাত্রা যাহাই থাকুক, বাহ্য পরিবেশের চাহিদার মাত্রাও কম নহে ; এবং এই কথাই বলা সঙ্গত যে বাহ্য পরিবেশের চাহিদার প্রেরণায়ই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আন্তর অনুভূতিকে—তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতির প্রবণতাকে রূপায়িত করিবার উদ্দীপনা এবং সুযোগ পাইয়াছেন এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারও করিয়াছেন। সুতরাং, রবীন্দ্র-কাব্যের প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে হইলে,—প্রথমেই জানিয়া লইতে হইবে তাঁহার ব্যক্তি-মানসের প্রকৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে জানিতে হইবে রচনাকালীন যুগ-প্রভাবের বৈশিষ্ট্য এবং সেই প্রভাবের প্রতি ব্যক্তি-মানসের স্বভাবগত আসক্তি বা অনাসক্তি—অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গী।

এই আলোচনার পরে সহজেই এখন আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-মানসের বৈশিষ্ট্যের কারণ নির্দেশ করিতে পারি। কেন তিনি শৈশব কালেই ভাবুক বা কল্পনা-বিলাসী হইয়াছিলেন, কেন তিনি স্বেচ্ছায় এবং অনেকক্ষেত্রে অনিচ্ছায়ও বটে কাব্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কেন বাল্যকালেই শব্দে ছন্দে ও ভাবে তাঁহার কবিতা বিশিষ্টতার দিকে আগাইয়া গিয়াছিল—এবং কেন বাল্যকাল হইতেই বিশ্বরহস্যের ধ্যানে তাঁহার মন একাগ্র হইয়া উঠিয়াছিল—এই সকল 'কেন''র সন্তোষজনক উত্তর রবীন্দ্র-

নাথ নিজেই সুন্দরভাবে দিয়া গিয়াছেন (জীবন-স্মৃতি, আত্মপরিচয় এবং চিঠি-পত্রাদি দ্রষ্টব্য)। আমরাও এ সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি এবং ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছি যে বাল্যকালের শিক্ষাভ্যাসের এবং পারিবারিক সংস্কার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির অনেকখানি জুড়িয়া রহিয়াছে। সামান্য একটী দৃষ্টান্ত দিলেই এই প্রভাবের গুরুত্ব উপলব্ধ হইবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে—সীমার সহিত অসীমের মিলনের কথাই তাঁহার কাব্যের প্রধান কথা, আবার এ কথাও নিজেই বলিয়াছেন —"আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্ব-ব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে"। এই স্বীকৃতির মূল্য রবীন্দ্রকাব্যালোচনায় যে কত বড় তাহা এইটুকু স্মরণ রাখিলেই বুঝা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানার মধ্যেই প্রকাশিত। বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের আদ্যন্ত ব্যাপিয়া এই বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে নানা ভাবে এবং নব নব রূপে আস্বাদন; রবীন্দ্রনাথের চরম দার্শনিক মুহূর্তে এই "বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতা"রই অখণ্ড অনুভূতি এবং তাঁহার মধ্যে ভাবদ্বন্দ্বের যে অভিব্যক্তি পাওয়া যায় তাহা এই অখণ্ড অনুভূতির সহিত খণ্ড অনুভূতির দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন—এমন কি, সামান্য কোন গ্রাহ্য বিষয়কেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতার দার্শনিকরসে রসিত না করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অতিশৈশবেই উপনিষদের আবহাওয়ায় এবং ব্রাহ্মীয় সাধন-ভজনার পরিবেশে লালিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বৈদান্তিক অনুভূতি ও দর্শন এমন ওতপ্রোতভাবে স্বভাবের সহিত জড়াইয়া গিয়াছিল যে, উহার ফলে তাঁহার চিত্ত বিশ্বের অণু-পরমাণুর মধ্যেও নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়া আত্মোপলব্ধির চেষ্টা করিয়াছে এবং

সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মসত্তার—চৈতন্যস্বরূপের "লীলাকৈবল্য" ছাড়া আর-কোন সত্যকে স্বীকার করিতে চাহে নাই—পারেও নাই। এই সংস্কারবশেই রবীন্দ্রনাথে ভাব-সর্ব্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গী—ভাব-সত্যের প্রতি অত্যধিক আসক্তি (এবং ঐ আসক্তির চরম পরিণতি—'রূপক' সৃষ্টিতে)। বস্তু-সত্যের প্রতি উপেক্ষা শিল্পী রবীন্দ্রনাথে ভাব-সত্যের প্রতি অনুরাগের রূপে এবং দেশ-কালের সীমার-মধ্যে-আবদ্ধ খণ্ড-প্রকাশের পারস্পরিক সম্বন্ধের বাস্তব রূপের ও উহার যাথার্থ্যের প্রতি অবজ্ঞার রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ফলে, দেশ-কাল-সম্বন্ধ-নিরপেক্ষ ভাবের মাহাত্ম্য প্রকাশের প্রতি অধিকতর ঝোঁক—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কৃতির সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিয়াছে এবং এই প্রবণতার ফলেই, রবীন্দ্রনাথের হাতে উপন্যাস "শেষের কবিতা"য় পরিণত হইয়াছে এবং নাটক-রচনার চেষ্টা প্রহসনের ক্ষেত্রে কিছুটা বস্তু-ভার-সংযত থাকিলেও গীতিনাট্যের ভাব মুখ্য নাট্যের এবং রূপক নাট্যের পথে ভাব-মণ্ডলে যাইয়া উপনীত হইয়াছে। এই "বিশেষ মনোভঙ্গী"র চাবিকাঠি দিয়াই রবীন্দ্রনাথে প্রবেশ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের নিজের-দেওয়া নির্দ্দেশই এখানে বড় শরণ্য — "সৃষ্টি আছে প্রত্যক্ষ, এই সৃষ্টির একটি অতীত ক্ষেত্র আছে অপ্রত্যক্ষ। বস্তু-পুঞ্জকে উত্তীর্ণ হয়ে সেই মহা অবকাশ না থাকলে অনির্বচনীয়কে পেতুম কোনখানে। ......অত্যন্ত কাছের সংস্রবে কাব্যকে পাইনে, কাব্য আছে রূপকে, ধ্বনিকে পেরিয়ে যেখানে আছে স্রষ্টার সেই অর্ধেক যা বস্তুতে আবদ্ধ নয়।......ব্যক্তের বীণাযন্ত্র আপন বাণী পাঠায় অব্যক্তে। ...... সংসারেরনিয়মকে জেনেছি, তাকে মানতেও হ'য়েছে, মূঢ়ের মতো তাকে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় বিকৃত করে দেখিনি, কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের মাঝখান দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার মন যুক্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে যেখানে সৃষ্টি গেছে সৃষ্টির অতীতে। এই যোগে সার্থক হয়েছে আমার জীবন।"

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকৃতি

১।		১৮৮১	বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য, পৃঃ ১৩
২।	২৫শে জুন	”	রুদ্রচণ্ড নাটিকা, পৃঃ ৫৩
৩।		১৮৮২	কালমৃগয়া গীতিনাট্য পৃঃ ৩৮ (বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে অভিনয়ার্থ রচিত। জোড়াসাঁকো ভবনে অভিনীত—২৩শে ডিসেম্বর ১৮৮২)
৪।	২৯শে এপ্রিল, ১৮৮৪		প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যকাব্য পৃঃ ৮১
৫।		”	নলিনী নাটিকা পৃঃ ৩৬
৬।		১৮৮৮	মায়ার-খেলা গীতিনাট্য পৃঃ।৵০ + ৬৪ * [সখি সমিতির মহিলা শিল্প মেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষে··· আমার পূর্ব্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটিকার (নলিনী) সহিত এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে—রবীন্দ্র]
৭।		১৮৮৯	
	২৫শে শ্রাবণ	১২৯৬	রাজা ও রাণী নাটক পৃঃ ১৪৯
৮।		১৮৯০	
	২রা জ্যৈষ্ঠ	১২৯৭	বিসর্জ্জন নাটক পৃঃ ১৫৪ (রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে নাট্যাকারে রচিত)
৯।		১৮৯২	
	৩১শে ভাদ্র, ১২৯৯		গোড়ায় গলদ প্রহসন পৃঃ ১৩৬
১০।		১৮৯৭	

চৈত্র	১৩০৩	বৈকুণ্ঠের খাতা প্রহসন	পৃঃ ৫৫
১১।	১৯০৭	হাস্যকৌতুক (কৌতুক নাট্য) *("য়ুরোপে শারাড (charade) নামক এক প্রকার নাট্য লেখা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়")	
১২।	১৯০৭	ব্যঙ্গকৌতুক (ব্যঙ্গকৌতুকপূর্ণ প্রবন্ধ ও নাট্যের সংগ্রহ)	
১৩।	১৯০৮	মুকুট নাটিকা *(ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে 'বালক' পত্রে (১২৯২) প্রকাশিত 'মুকুট' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত)	পৃঃ ৬০
১৪।	১৯০৯	প্রায়শ্চিত্ত ঐতিহাসিক নাটক ("বৌ-ঠাকুরাণীর হাট নামক উপন্যাস হইতে এই প্রায়শ্চিত্ত গ্রন্থখানি নাট্যীকৃত হইল"।)	পৃঃ ১১৬ ;
১৫।	১৯১০	রাজা নাটক (রূপক)	পৃঃ ১২৮
১৬।	১৯১২	ডাকঘর নাটক (রূপক)	পৃঃ ৬৯
১৭।	”	মালিনী নাটিকা	পৃঃ ৪৯
১৮।	”	বিদায় অভিশাপ নাট্যকাব্য	পৃঃ ২০
১৯।	”	অচলায়তন নাটক (রূপক)	পৃঃ ১৩৮
২০।	১৯১৬	ফাল্গুনী নাট্যকাব্য (রূপক)	পৃঃ ৮৪
২১।	১৯১৮	গুরু রূপক নাটক (অচলায়তনের অভিনয়যোগ্য সংস্করণ)	পৃঃ ৫১

২২।	১৯২০	অরূপ রতন নাটক (রূপক) (এই নাট্যরূপকটি 'রাজা' নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত)	পৃঃ ৭৩
২৩।	১৯২১	ঋণশোধ নাটিকা (শারদোৎসবের অভিনয়যোগ্য সংস্করণ)	পৃঃ ৯৬
২৪।	১৯২২	মুক্তধারা রূপক নাটক (মুক্তধারা নূতন নাটক হইলেও ইহার একটি প্রধান চরিত্র—প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী; সেইজন্য ইহার কথোপকথনের কিয়দংশ এবং কয়েকটি গান 'প্রায়শ্চিত্ত' হইতে গৃহীত)	পৃঃ ১১৬
২৫।	১৯২৩	বসন্ত গীতিনাট্য	পৃঃ ৩
২৬।	১৯২৫	গৃহপ্রবেশ নাটক (গল্পসপ্তক পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত 'শেষের রাত্রি' গল্পের নাট্যরূপ)	পৃঃ ১০২
২৭।	১৯২৬	চিরকুমার সভা নাটক	পৃঃ ২২০
২৮।	”	শোধবোধ নাটিকা (কর্মফল গল্পের নাট্যরূপ)	পৃঃ ৮২
২৯।	”	নটীর পূজা নাটিকা ['পূজারিণী' কবিতার গল্পাংশ পরিবর্ত্তিত আকারে (ঋতু উৎসবে—নাট্যসংগ্রহ) —নাট্যীকৃত]	পৃঃ ৮২
৩০।	”	রক্তকবরী নাটক	পৃঃ ১০৩
৩১।	১০২৭	ঋতুরঙ্গ গীতিনাট্য	

৩২।	১৯২৮	শেষরক্ষা প্রহসন	পৃঃ ১৩৩
		(গোড়ায় গলদ-এর অভিনয়যোগ্য সংস্করণ)	
৩৩।	১৯২৯	পরিত্রাণ নাটক	পৃঃ ১৪১
		(প্রায়শ্চিত্ত নাটকের নূতন পরিবর্ত্তিত সংস্করণ)	
৩৪।	১৯২৯	তপতী নাটক পৃঃ ১৮৫ + পরিশিষ্ট ৩	
		(রাজা ও রাণী নাটকের গল্পাংশ পরিবর্ত্তিত আকারে নূতন করিয়া নাট্যীকৃত)	
৩৫।	১৯৩১	নবীন গীতিনাট্য	পৃঃ ২৮
৩৬।	১৯৩২	কালের যাত্রা নাট্য	পৃঃ ৩৯
		সূচী :—(১) রথের রশি (২)কবির দীক্ষা	
৩৭।	১৯৩৩	চণ্ডালিকা নাটিকা	পৃঃ ৪৫
৩৮।	”	তাসের দেশ নাটিকা	পৃঃ ৬৯
৩৯।	”	বাঁশরী নাটক	পৃঃ ১৩০
৪০।	১৯৩৬	চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য	পৃঃ ৩৩
৪১।	১৯৩৮	চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য	পৃঃ ৩১
৪২।	১৯৩৯	শ্যামা নৃত্যনাট্য	পৃঃ ৯২

রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিশ্বতোমুখ—সার্বভৌম ও অসামান্য ; একাধারে তিনি কবি-গল্পলেখক-ঔপন্যাসিক-নাট্যকার-সমালোচক-প্রবন্ধকার-সম্পাদক,—এক কথায় 'কি-নহেন' এবং সর্বক্ষেত্রেই তিনি 'একাই-একশো' ; সত্যই, তাঁহার একমাত্র এবং অতিসঙ্গত উপাধি—বিশ্বকবি। এই বিশ্বকবির অন্যতম নাট্যকার-ব্যক্তিত্বটি নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি এবং কতরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে, এস্থলে

তাহাই আমাদের প্রধান আলোচ্য—অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্য-সাহিত্যে কি কি দান করিয়াছেন এবং সে দানের মর্য্যাদা কি ?

প্রথমে দেখা যাউক—রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ভাণ্ডারে কি পরিমাণ দান করিয়াছেন। তাঁহার দানের সামান্য পরিচয় এই—নাট্যকাব্য, গীতিনাট্য, নাটক-নাটিকা-প্রহসন, ব্যঙ্গ-কৌতুক-সংগ্রহ, এবং রূপক প্রভৃতি জড়াইয়া তাহা মোট সংখ্যায় বিয়াল্লিশ। ইহাদের মধ্যে নাট্যকাব্য = ৪, গীতি-নাট্য = ৬, নৃত্যনাট্য = ৩, নাটক = ৭, নাটিকা = ৯, প্রহসন = ৩ ('চির-কুমার-সভা'কে কমেডি নাটক বলিলে), ব্যঙ্গনাটিকা সংগ্রহ = ২, রূপক নাটক-নাটিকা = ৮ ; এই মোট সংখ্যা হইতে নাট্যকাব্য, নৃত্যনাট্য এবং ব্যঙ্গকৌতুকাদি বাদ দিলে অবশিষ্ট পাওয়া যায়—সাতখানি নাটক (অবশ্য ছোট আকার), নয়খানি নাটিকা (আরো ছোট আকার), তিনখানি প্রহসন এবং আটখানি রূপক নাটক-নাটিকা। †

এই হিসাব হইতে প্রথমেই যে বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা এই যে, রবীন্দ্রনাথ নূতন এক জাতীয় নাট্য-সাহিত্য প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—রূপক-নাটক-নাটিকার দানে বাংলা নাট্য-সাহিত্যে নূতন সম্পদ সৃষ্টি করিয়াছেন। নাট্যসাহিত্যের এই রীতি বাংলায় রবীন্দ্রনাথই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। (অবশ্য গিরিশচন্দ্রের 'মহাপূজা'কে

---

† নাটক :—(১) রাজা ও রাণী, (২) বিসর্জ্জন, (৩) তপতী, (৪) প্রায়শ্চিত্ত, (৫) পরিত্রাণ, (৬) গৃহপ্রবেশ, (৭) চিরকুমার সভা।

নাটিকা :—(১) মুকুট, (২) মালিনী, (৩) ঋণশোধ, (৪) শোধবোধ, (৫) নটীর পূজা, (৬) চণ্ডালিকা, (৭) তাসের দেশ, (৮) কালের যাত্রা (দু'খানি ক্ষুদ্র নাটিকা), (৯) রুদ্রচণ্ড।

প্রহসন :—(১) গোড়ায় গলদ, (২) বৈকুণ্ঠের খাতা, (৩) শেষরক্ষা।

রূপক নাটক-নাটিকা :—(১) রাজা, (২) ডাকঘর, (৩) অচলায়তন, (৪) ফাল্গুনী, (৫) গুরু ,(৬) অরূপ-রতন, (৭) মুক্তধারা, (৮) রক্তকরবী।

—১৮৯০ খ্রীঃ ২৪ শে ডিসেম্বর, ষ্টারে অভিনীত—রূপক নাটকের প্রথম নিদর্শন রূপে করিলে--অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের মতে "রূপক নাট্য"—সিদ্ধান্তটির পুনর্বিচার আবশ্যক হইতে পারে, কারণ রবীন্দ্রনাথের 'রূপক' নাটকের প্রথম আবির্ভাব ঘটে—১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। এই উক্তিটি পড়িয়া কেহ যেন মনে না করেন যে গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 'রূপক নাটক' লেখক হিসাবে একই পর্য্যায়ের লোক। আমার বক্তব্য এই—রূপক-রীতিটির স্খলিত-পদক্ষেপ গিরিশচন্দ্রে প্রথম দেখা যায়)। এই রূপক নাটকগুলি রবীন্দ্রনাথের নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির অক্ষয় সৃষ্টি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং ইহাদের জনক রূপে রবীন্দ্রনাথ 'প্রবর্ত্তকের' মর্য্যাদার অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে একথাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে রবীন্দ্রনাথ রূপক নাটক নাটিকা রচনার পথে বাংলা নাট্য-সাহিত্যে একটি নূতন ধারা সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য, তবে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের অন্যান্য ধারা তাঁহার হস্তে আশানুরূপ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই—ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ পূর্বগামীদের প্রতিভাকে ম্লান করিয়া দিতে পারেন নাই। খাঁটি ঐতিহাসিক এবং খাঁটি সামাজিক নাটক বলিতে যাহা বুঝায়, রবীন্দ্রনাথ তাহা লেখেন নাই এবং যাহা লিখিয়াছেন তাহা বাস্তবতাশূন্য এবং বলা চলে—ভাবকে কোন রকম একটা রূপের মধ্যে অঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা। তাঁহার "রাজা ও রাণী", "বিসর্জ্জন", "প্রায়শ্চিত্ত" প্রভৃতিকে পরমোৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক নাটক বলা যেমন সঙ্গত নহে, তেমনি "গৃহপ্রবেশ," "শোধবোধ" প্রভৃতিকেও উচ্চাঙ্গের সামাজিক নাটক বলাও যুক্তিসঙ্গত বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্য সাহিত্যে গীতিনাট্যকার হিসাবে অতুলনীয়, রূপক-নাট্যকার রূপে অদ্বিতীয়, কিন্তু সামাজিক এবং

ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তাঁহার দান এবং স্থান অতুলনীয় নহে। গীতিকাব্যে বাস্তবতার বিচার অবাঞ্ছনীয় হইতে পারে, 'রূপক' নাটকে বাস্তবতার প্রশ্ন অবান্তর হইতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকে বাস্তবতার প্রশ্ন অপরিহার্য্য এবং এই প্রশ্নের মুখে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটক—'এঁ্যা-উঁ' করিতে বাধ্য; তবে 'প্রকৃত নাটক'এর লক্ষণ হইতে ঔচিত্য-অনৌচিত্যের সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যের, বাস্তব-অবাস্তবের হিসাবের অংশগুলি বাদ দিয়া—কেবলমাত্র প্রকাশের অংশ ধরিয়া বিচার করিতে গেলে সিদ্ধান্ত অন্যরূপ হইবে বলাই বাহুল্য। †

রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যে ভাবরস ও রূপরস

রবীন্দ্রনাথ সর্বক্ষেত্রেই একই কাজ করিয়াছেন — ভাবকে রূপের মাঝারে অঙ্গ দিতে যেটুকু আবশ্যক তদপেক্ষা রূপের আর কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নাই — 'ভাব-সত্য'কে প্রকাশ করাই তাঁহার মুখ্য কাম্য ও উদ্দেশ্য হইয়াছে। ফলে রূপ-সত্যের মধ্যে যে

† ডাঃ নীহার রঞ্জন রায় মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন—

"সেইজন্য নাটক বলিতে সাধারণতঃ যে ঘটনা-বহুল, বৈচিত্র্য-বহুল সাহিত্যের রূপ আমরা বুঝিয়া থাকি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সে-নাটকের সৃষ্টি নাই।............ কিন্তু ঘটনার লীলাবৈচিত্র্যই যাহার প্রাণ, যেমন সাধারণ নাট্য ও উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেইখানে সার্থক হইতে পারে নাই।"—(রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা ১০৪ পৃ)

স্বর্গীয় অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়কেও স্মরণ করা যাইতে পারে—

"রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, ছোটগল্পে, উপন্যাসে য়ুরোপীয় সাহিত্যের যে মূল সুর তাহার বিচিত্র খেলা আছে,............তবে তাঁর মানব-সৃষ্টিতে সেই বৈচিত্র্য কোথায়, সে বাস্তবতা কোথায়, সে অভিজ্ঞতার স্তরপর্য্যায় কোথায়, সে উত্থানপতনের তরঙ্গমালা কোথায়, সে পাপপুণ্যের ঘাতপ্রতিঘাত কোথায়, যাহা সমুদ্রের মত য়ুরোপীয় সাহিত্যকে সংক্ষুব্ধ করিয়াছে। এই জন্য লিরিক কাব্যে যেখানে বস্তুর বালাই নাই, শুধু ভাবের লীলা সঙ্গীতে তিনি

বাস্তবতা, সে বাস্তবতা তাঁহার নাটকে পাওয়া যায় খুব কমই। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে 'রস' শব্দটি প্রয়োগ করিলে বলা চলে— রবীন্দ্রনাথে রচনা-রস অতুলনীয়, 'ভাব'-রস অসামান্য, কিন্তু 'রূপ'-রস সন্তোষজনক নহে। এই 'রূপ'-রস হীনতা রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্যের একটা বড় লক্ষণ এবং ইহার কারণ রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের স্বভাব—'ভাব'কে অদ্বৈত সত্য বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করার ফলে ভাবের প্রতি একাগ্র অভিনিবেশ বা প্রসক্তি (fixation)। এই স্বভাবেরই প্রেরণাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা হইতে কাব্যিক নাটকের স্ফূর্ত্তি (Poetic Drama)।

বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের নাটকের পরিপাটি বিচার করিবার পূর্ব্বে কাব্যিক নাটকের নাটকত্ব* যাচাই করিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। অন্যথা মত-বিশৃঙ্খলা অনিবার্য্য (অবস্থাও তাহাই)। এমন কি রবীন্দ্রনাথেও এ বিষয়ে সংশয়ের দোলা দেখা যায়। বিসর্জ্জন নাটকের উৎসর্গে ক্রিটিকদের 'এক হাত' লইতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথের বিসংবাদের বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন— "কেহ বলে ড্রামাটিক, বলা নাহি যায় ঠিক, লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি" এবং 'রাজা ও রাণী' নাটকের ভূমিকায় (আশ্বিন ১৩৪৬ লিখিত) নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন— "এর নাট্যভূমিতে র'য়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাজমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা শোচনীয়রূপে অসংগত।" সাহিত্য বিচারক্ষেত্রে এই প্রশ্নের আলোচনা কম হয় নাই এবং এখনও

ক্রন্দমান, সেখানে তিনি অতুল। এই জন্য ছোট গল্পে যেখানে ঘটনার চেয়ে ঘটনার মর্মনিহিত সুরটিই রচনার যোগ্য সেখানেও তাঁর তুলনা নাই; কিন্তু নাট্যোপন্যাসে নয়, অবশ্য রূপক নাট্য বাদে।"

এই প্রশ্নকে জীবন্তই বলা চলে। ১৯১২ খ্রীঃ Lascelles Abercrombie মহাশয় '*The Poetry Review*'-পত্রে — 'The Function of Poetry in the Drama" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া নাটকে কাব্যের স্থান নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন—"I think we ought to agree that if thorough imitation is a crucial point, the poetry play does better than the prose play." কারণ — "a prose play can not absolutely imitate life in its conception, in its plan ."

অধিকন্তু অ্যাবারক্রোম্বি মহাশয়ের মতে — "The innermost reality, the one with which art is most dearly concerned, is what is commonly called the spiritual reality" — অর্থাৎ "emotional reality"। আর এই emotional realityকে যথার্থ প্রকাশ করা যায় — কাব্যের ভাষায়ই। সম্প্রতি-নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্ত আধুনিক কবি টি. এস্. এলিয়ট মহাশয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত "Rhetoric and Poetic Drama" প্রবন্ধে এবং ১৯২৮ খ্রীঃ লিখিত A Dialogue on Dramatic poetry নিবন্ধে এই প্রশ্নটিকেই পুনরালোচনা করিয়াছেন। প্রথম প্রবন্ধে তিনি 'লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি'কে বাড়াবাড়ি বলিয়াই নিন্দা করিয়াছেন, তবে কাব্যিক মূহুর্ত্তের কাব্যিকতাকে সমর্থনই করিয়াছেন আর দ্বিতীয় নিবন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছেন — "And is not the question of verse drama versus prose drama a question of degree of form ?" এবং এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিতে চাহিয়াছেন যে "He (অর্থাৎ William Archer) was wrong.........in thinking that drama and

poetry are two different things — আর intensityর জন্য verse rhythmই অধিকতর উপযোগী; তাঁহার মতে — "A continuous hour and a half of *intense* interest is what we need. No intervals, no chocolate-sellers or ignoble trays. The unities do make for intensity, as does verse rhythm."

কিন্তু যাঁহারা বাস্তব-প্রিয় — সমালোচক-রূপে 'রিয়ালিষ্ট'—তাঁহারা এই মতকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে — বাস্তব-নিষ্ঠা নাটকের অন্যতম লক্ষণ এবং কাব্যিক উচ্ছ্বাস — অর্থাৎ কাব্যময়তা বাস্তবতার পরিপন্থী। এই শ্রেণীর কাছে রবীন্দ্রনাথের নাটক খুব উচ্চাঙ্গের নাটক বলিয়া গৃহীত হইবে না, কারণ রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্যে ভাব-জগতের অশরীরী অধিবাসীদের নাগরিকতা যে-পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বস্তু-জগতের আবহাওয়া একেবারেই হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে। এইরূপ "ভাবে ভরা ফানুস" লইয়া খেলা করিতে বাস্তববাদীরা কুণ্ঠা দেখাইবেন এবং অস্বস্তিবোধ করিবেন—অস্বাভাবিক নহে। *

তাই রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্যের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে—রবীন্দ্রনাথের নাটক-নাটিকাদির সাধারণ ধর্ম—ভাবতান্ত্রিকতা এবং কাব্যিকতা বা কবিত্বময়তা। এই বৈশিষ্ট্য ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ দৃশ্য-অঙ্কাদি বিষয়ে গতানুগতিকতার সীমা অতিক্রম করিয়াছেন,—ইহা অপেক্ষাও বড়

* তবে এক্ষেত্রেও 'ভাব-সত্য' এবং 'রূপ-সত্য'এর আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং কাম্যত্ব লইয়া প্রশ্ন তুলিয়া জল অনেক দূর ঘোলাইয়া দেওয়া অসম্ভব নহে। কেহ হয়ত প্রমাণ করিতে পারেন—রূপ-সত্য আসল-সত্য ভাব-সত্যের দেহ মাত্র, এই হিসাবে ভাব-সত্যই আসলে বাস্তব (Real) এবং রবীন্দ্রনাথ খাঁটি বাস্তব।

কথা এই যে রবীন্দ্রনাথ 'ঐক্যের' (unity) বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে অনুগত থাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সর্বক্ষেত্রে তাঁহার সতর্কতা অক্ষুণ্ণ না থাকিলেও এ কথা স্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথ টি.এস্. এলিয়ট-বাঞ্ছিত "more concentration" এর অভিমুখেই অগ্রসর হইতে চাহিয়াছেন। সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের তুলনায় কম ঐক্য-নিষ্ঠ। ঐক্যানুগতা রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

স্বভাবো অতিরিচ্যতে—এ কথাটি সর্বক্ষেত্রেই সত্য, এবং রবীন্দ্রনাথেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ ভাবুক কবি এই কথাটি যত সত্য, তদপেক্ষা অধিকতর সত্য এই যে তিনি ভাববাদী—বিশেষতঃ অধ্যাত্মবাদী কবি। ফলে ভাবকেন্দ্রিকতা বা ভাবতান্ত্রিকতা রবীন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষণ। এই স্বভাবের কেন্দ্রানুগত আকর্ষণের ফলে রবীন্দ্রনাথ কখনও বাস্তব পরিমণ্ডলে নামিয়া যাইয়া মাটিকে মাটি বলিয়া আকড়াইয়া ধরিতে পারেন নাই। বস্তুর টানে রবীন্দ্রনাথ কখনও বাস্তবের উপর আসিয়া দাঁড়ান নাই, ভাসমান ভাবলোককেই "বাস্তু" রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিশেষ মনোভঙ্গীর দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে সহজেই দেখা যাইবে, কেন রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রধান নাটক-নাটিকা লিখিয়াছেন, কেন তিনি রূপক নাটক-নাটিকার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন,—কেন তিনি খাঁটি সাময়িক, বা খাঁটি ঐতিহাসিক লেখার প্রেরণা পান নাই।

এই মনোভঙ্গীর বা প্রবৃত্তির পরে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—বচন-বিন্যাসের মাহাত্ম্য। যেমন শ্লেষ-বক্রোক্তি-উপমা-উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কার প্রয়োগে, তেমনি শব্দের লাক্ষণিক এবং

ব্যঞ্জনা-শক্তির খেলাতেও রবীন্দ্রনাথ সমান সিদ্ধহস্ত। এক কথায় —রবীন্দ্রনাথের ভাষা কবিত্বময়। (ইংরাজিতে বলিতে গেলে— "রোমান্টিক"।)

তৃতীয়তঃ, অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তবে এ বিষয়ে যে তিনি নিখুঁত এবং অদ্বিতীয় তাহা নহে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অজিত কুমার ঘোষ মহাশয়ের কথা—"নাটকের মধ্যে তিনি যে সূক্ষ্ম কলাকৌশল এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সুস্পষ্ট পরিচয় দিলেন তাহা তাঁহার পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই এবং পরেও অনুসৃত হয় নাই"—সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সূক্ষ্ম কলাকৌশল এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় সমসাময়িক নাট্যকার-দিগের দুই এক জনের মধ্যে না পাওয়া যায় এমন নহে। অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবে ও ভাষায় পশ্চাৎপদ আছেন—একথা বলা চলে না। বরং এই কথাই বলা যায় এবং বলা সঙ্গত—দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্রিয়া-তীব্রতা যত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের নাটকে তাহা পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথে এমন অনেক চরিত্র আছে যাহার মধ্যে কোন দ্বিধা নাই, দ্বন্দ্ব নাই সংশয় নাই।—এক কথায় যাহা জীবন্ত নহে।

তারপর চরিত্র সৃষ্টির কথা। অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকে এবং চরিত্র সৃষ্টিকে পৃথকভাবে দেখা অসঙ্গত। কারণ চরিত্র সৃষ্টির মহিমা তখনই সুস্পষ্ট ভাবে অনুভূত হয় যখন অন্তর্দ্বন্দ্বে চরিত্র প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠে। ভাব ও ভাবদ্বন্দ্বকে রবীন্দ্রনাথ কাব্য-রূপ দিতে সক্ষম হইয়াছেন বটে, কিন্তু চরিত্র সৃষ্টি বলিতে বাস্তবিক যাহা বুঝায় তাহা অপেক্ষা ভাবাদর্শের চলা-ফেরার দৃষ্টান্তই তাঁহার নাটকে বেশী। ডাঃ নীহার রঞ্জন রায় মহাশয়ের ভাষার অনুকরণে বলা চলে—"প্রতি মুহূর্ত্তের অনুভবের

নূতনত্বের মধ্যে যে রসের লীলা, মনের মধ্যে সংশয়ের যে দোলায় জীবন্ত চরিত্রের অভিব্যক্তি ,তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথে খুব সুলভ নহে", সেখানে "চরিত্র অপেক্ষা আইডিয়ার রসমূর্ত্তি"র দেখাই বেশী পাওয়া যায়। ভূমিকা-প্রস্তুতির পর্য্যায় ছাড়াইয়া নাটক-নাটিকার বিশেষ সমালোচনাকালে—প্রায় প্রত্যেক সমালোচকই এক-একটি চরিত্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা 'প্রতিকূল ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'বিসর্জ্জন'-এর দুই একটি চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—গোবিন্দমাণিক্য সম্বন্ধে ডাঃ নীহার রঞ্জন রায় মহাশয়ের মন্তব্য—"গোবিন্দ মাণিক্যের চরিত্র মহৎ কিন্তু বিকাশের দিক হইতে তাহা সুন্দর নহে ; তাহার মধ্যে কোন দ্বিধা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, সংশয় নাই, প্রতিমুহূর্ত্তের অনুভবের নূতনত্বের মধ্যে যে রসের লীলা, মনের মধ্যে সংশয়ের যে দোলা গোবিন্দ মাণিক্যের চরিত্রে তাহা নাই।" অধ্যাপক অজিত ঘোষের মন্তব্য : "তাঁহাকে একেবারে নির্দ্বন্দ্ব নিষ্ক্রিয় মনে হয়"। তারপর 'অর্পণা' সম্বন্ধে ডাঃ রায় বলেন—"অর্পণা একটি আইডিয়ার রসমূর্ত্তি, কোনও জীবনের বিকাশ নয়, রক্ত মাংসের একটি মানবকন্যার রূপ তাহার মধ্যে কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই। বন্ধুবর অজিতবাবু ও স্বীকার করিয়াছেন "তাহার চরিত্র আবেগ-চাঞ্চল্যের দ্বারা, ভাবের দ্বন্দ্ব দ্বারা জীবন্ত হইয়া উঠে নাই"। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চরিত্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ অব্যর্থ 'লক্ষ্য-ভেদ'-দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই।

তারপর এ কথাও সত্য নহে যে "রবীন্দ্রনাথ দর্শকের রুচি গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহার নাটকের মধ্য হইতে স্থূল এবং রোমাঞ্চময় ঘটনা একেবারে বাদ দিলেন"। (অজিতবাবু)। 'একেবারে বাদ দিলেন' এর সহিত—"রাজা ও রাণীতে নাট্যকার গতানুগতিক নাট্যধারা একেবারে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, সেই জন্য অনেক

স্থূল ও রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা ইহাতে আছে”—এই উক্তির স্বতোবিরোধ রহিয়াছে। কুমারের কর্তিত শির প্রদর্শন, সুমিত্রার পতন ও মৃত্যু এবং ইলার আকস্মিক আগমন ও মূর্চ্ছা—এই ধরণের মোলাড্রামাটিক ঘটনা রবীন্দ্রনাথের নাটকে যখন দেখা যায়, তখন—“স্থূল এবং রোমাঞ্চময় ঘটনা একেবারে বাদ দিলেন” লেখা যুক্তিযুক্ত হয় নাই (রবীন্দ্রনাথে বাংলা নাট্যসাহিত্যের “Climax” করিতে যাইয়া বন্ধুবর নিজে স্বতোবিরোধের আবর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছেন—‘বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাস’ দ্রষ্টব্য)। মোটকথা রবীন্দ্রনাথ ঘটনা-বিন্যাসে স্থূলতা এবং রোমাঞ্চময়তা একেবারে বাদ দিতে পারেন নাই এবং এ বিষয়ে তিনি একেবারে নিখুঁতও নহেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকে ঘটনা উচিত্য বা সম্ভাব্য-নিয়মিত নহে—ঘটনা তত্ত্ব-নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ ঘটনার সার্থকতা তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার সাফল্যে। এই ব্যবস্থা রোমাঞ্চকর নাটকেই প্রধানতঃ দেখা যায় এবং সে-সব স্থলে ইহা নিন্দনীয়ই হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্মোহনে তাঁহার দোষকে গুণ বলিয়া প্রচার করিয়া তাঁহাকে অসম্মান না করা হয়, এ বিষয়ে সমালোচকদের সতর্ক থাকা উচিত।

সমসাময়িক নাট্যকার ও রবীন্দ্রনাথ

একই যুগে জন্মগ্রহণ করিলেও এবং অনেকটা একই পরিবেশের মধ্যে থাকিলেও, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে কত পার্থক্য হইতে পারে—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের তুলনামূলক আলোচনা করিলেই তাহা সুস্পষ্ট হইবে (নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ দ্রষ্টব্য)। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানসের প্রকৃতি এবং দ্বিজেন্দ্র-লালের ও ক্ষীরোদপ্রসাদের ব্যক্তিমানসের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া পারস্পরিক পার্থক্য নির্দ্ধারণ করিলেই প্রত্যেকেরই বিশেষত্বের ব্যাখ্যা ও পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গেই

মনে পড়ে নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের কিছুদিন আগের এক বক্তৃতার কথা: শ্রীযুক্ত ভাদুড়ী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—রঙ্গমঞ্চের সহিত যোগ না থাকায় রবীন্দ্রনাথ, অনন্যসাধারণ প্রকাশ-ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, বড় নাট্যকার হইতে পারেন নাই; রঙ্গমঞ্চের সহিত যোগ না রাখিয়া রবীন্দ্রনাথ বাংলাকে একজন শেক্সপীয়র হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। বাস্তবিক, ব্রহ্মবাদের কেন্দ্রে আবদ্ধ হইয়া থাকায়, এবং বিশেষতঃ আভিজাত্যের চিলে-কোঠায় নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দী করিয়া রাখায়—সামাজিক হইয়াও অসামাজিক জীবন যাপন করায় রবীন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে ভাব-লোক-বিহারী হইয়া পড়িয়াছিলেন—সামাজিক শক্তির আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমবায়ে যে সামাজিক জীবন সে-জীবনের মাহাত্ম্যকে ঐকান্তিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এইখানেই দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির সহিত তাঁহার লক্ষণীয় পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথকে বলা যাইতে পারে "প্লেটো", আর দ্বিজেন্দ্রলালকে বলা চলে "আরিস্টটল"; রবীন্দ্রনাথ ভাব-কৈবল্যবাদী আর দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বস্তুর জগতেই ভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথে বস্তুজগৎ নিমিত্তমাত্র, দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে বস্তুজগৎ তদ্রূপ নহে—বস্তু এবং ভাব সমান মুখ্য। এই কারণেই বিষয় নির্বাচনের মৌলিক পার্থক্য—বিষয় উপস্থাপনের ভিন্ন রীতি। বিষয় নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথ—বলা যায় "ছিন্নবাধা পলাতক বালক'—শতকর্মে-রত সংসারের সহিত তাঁহার যোগ অন্তরঙ্গ যোগ নহে। সেইজন্য—রবীন্দ্রনাথে "কল্পনার centrifugal force"এর ক্রিয়া যত বিলক্ষণ, "অনুরাগের centripetal force" এর ক্রিয়া তত লক্ষণীয় নহে।*

* (অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Ideal এর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য্য-কল্পনার centrifugal force Ideal এর দিকে Real কে নিয়ে যায় এবং অনুরাগের centripetal force Realএর দিকে Ideal কে আকর্ষণ করে—কাব্যসৃষ্টি

তারপর, প্রকাশশক্তির তারতম্যের কথা। রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক পরিবেশ হইতে এবং শিক্ষাভ্যাস হইতে সংস্কৃত ভাব ও ভাষার যে সঞ্চয় অন্তর্নিহিত করিয়াছিলেন—অধিকন্তু ইংরেজী সাহিত্যের প্রবচন ও বচনভঙ্গীর যে সংস্কার তাহার মধ্যে আহিত হইয়াছিল—তাহার ফলে তাঁহার ভাব কখনও ভাষার ও কল্পনার দৈন্য অনুভব করে নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত এখানেও তাঁহার ঐক্য ও পার্থক্য উভয় আছে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে ভাবে-ভাষায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় কোটিতেই সমান, দ্বিজেন্দ্রলাল যেখানে অধিকতর পরিমাণে প্রতীচ্য-কোটিক। রবীন্দ্রনাথের জিহ্বায় প্রাচ্য সরস্বতীর ভরের পরিমাণ যদি দশ-আনা কি বার-আনা হয় তাহা হইলে দ্বিজেন্দ্রলালে ঐ ভর-পরিমাণ ছয়-আনার মত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাব-ভাষার সঞ্চয়ের আনুপাতিক পরিমাণ-হার অনুসারেই এক একজনের প্রকাশ-শক্তি এক এক ধরণ পাইয়াছে। †

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে—রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ সমসাময়িক গিরিশচন্দ্রে ভাবানুভূতির সহিত শিক্ষাভ্যাসের তেমন যোগ ঘটিতে পারে নাই বলিয়া গিরিশচন্দ্রে না পাওয়া যায় প্রাচ্যের কবি-কল্পনার বা ভাব ঐশ্বর্য্যের ওতপ্রোত অভিব্যক্তি না পাওয়া যায় প্রতীচ্যের কবি-

নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না)।

† সাহিত্য-বিচারে সংখ্যা-বিজ্ঞানের প্রয়োগ অনেকেরই হয়ত মনঃপূত হইবে না। তবে, এ কথা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, কোন কবির মৌলিকত্ব নিরূপণ করিবার আগে, কবির কাব্যে যে যে কল্পনা যে যে অলঙ্কার প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার গোটা হিসাব করিবার পরে, পূর্ববর্ত্তী কবিদের দানের সহিত তুলনা মূলক আলোচনা করা দরকার। এ পর্য্যন্ত এই ধরণের চেষ্টা কোন কবি সম্বন্ধেই করা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ কত রকমের অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন, কতরূপ কল্পনা সৃষ্টি করিয়াছেন, এই অলঙ্কারে এবং কল্পনার কতটি পুরাতন এবং কতটি নূতন উদ্ভাবন—এইরূপ হিসাব আজও হয় নাই। আশা করি, রবীন্দ্র-ভবনের গবেষকগণ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

কল্পনার বৈচিত্র্য ও প্রকাশ-ভঙ্গিমা—তারপর নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদের শিক্ষাভ্যাস থাকিলেও, সহৃদয়তার মাত্রা ছিল কম, তেমনি ছিল না প্রতীচ্যের ভাব-ভাষার উপর সহজ সংস্কারের মত অধিকার। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল এ বিষয়ে ছিলেন বিলক্ষণ দক্ষ। প্রাচ্য কবি-কল্পনার সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকিলেও ভাষার উপর অধিকার ছিল তাঁহার অসাধারণ এবং প্রতীচ্য ভাব ও ভাষা-ভঙ্গিমার সহিত ছিল অন্তরঙ্গ যোগ। এই বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত রবীন্দ্রনাথের লক্ষণীয় ঐক্য দেখা যায়। অবশ্য এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে—দ্বিজেন্দ্রলাল (অকালেই) ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরবিদায় লইয়াছেন আর রবীন্দ্রনাথ ঐ সময়ের পরেও রচনা-শৈলীকে আরো পরিপাটি করিবার অবসর পাইয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালে এবং রবীন্দ্রনাথে, ইংরেজী-অলঙ্কার 'অকসিমোরন', 'সিনেকডকি', 'ট্রান্স্ফার্ড এপিথেট' প্রভৃতি প্রয়োগের প্রাচুর্য্যে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে এবং এই সব বিষয়েই উভয়ের প্রকাশ-শক্তির যথেষ্ট ঐক্য আছে ; কিন্তু শ্লেষ, বক্রোক্তি প্রয়োগ করিয়া wit এবং humour এর যে খেলা রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন এবং রচনাকে যে অসামান্য সরসতা দান করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দ্বিজেন্দ্রলালে খুব কমই দেখা যায়। বক্রোক্তি-বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

উপসংহারে এই কথাই বলিবার আছে যে—রবীন্দ্রনাথের হস্তে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে,—নতুন সম্ভাবনার দিকে সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে, এ কথা খুবই সত্য, কিন্তু এ কথা কোন মতেই স্বীকার্য্য নহে যে—"রবীন্দ্রনাথের নাটকে আমরা বাংলা নাট্যধারার climax লক্ষ্য করিয়াছি" এবং তাঁহার পরেই বাঙ্গালা নাটকের বিশেষ লক্ষ্যণীয় অবনতি ঘটিয়াছে। বরং এই কথাই সত্য যে

রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত রূপক নাট্যের ধারা এবং কাব্যিক নাট্যের ধারা, রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা নাট্যধারার সহিত অন্তরঙ্গ যোগ স্থাপন করিতে সক্ষম হয় নাই বলিয়া, নাটকের আদর্শস্থানীয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে সত্য, কিন্তু এ কথা আংশিক সত্য যে, "রবীন্দ্রনাথের নাটকেই বাঙ্গলা নাট্যধারা বিশ্বনাট্যধারার সহিত যুক্ত হইল।"—ইহার সত্যতা এই পর্য্যন্ত যে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি—তাঁহার আকর্ষণে বাংলা নাট্য-ধারার প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আপতিত হইয়াছে, এবং বিশ্বের নাট্য-সমাজে রবীন্দ্রনাথকে যোগ্য প্রতিনিধি রূপে প্রেরণ করা চলে। কিন্তু বাংলা নাট্যকারদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া আর কাহাকেও যে প্রেরণ করা চলে না, এ কথা সত্য নহে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান চিরস্মরণীয়। ভাব-শিশুকে রবীন্দ্রনাথ ভাষার বন্ধনে সংহত করিয়া যে-রূপ দান করিয়াছেন, তাহার সঞ্চারণ-ক্ষমতা, তাহার আবেদন-শক্তি অসাধারণ।

তবে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিই এ বিষয়ে বড় দিগদর্শনী: "মানুষের চিত্তকে একজন লোক বরাবর জাগিয়ে রাখতে পারে না—সেই জাগিয়ে রাখাটাই আসল কথা, কোন কিছু দান করার মূল্য তেমন বেশি নয়। নূতন শক্তির অভিঘাতে মানুষ জাগে—পুরাতনের বাণী অতি-অভ্যাসে আর মনকে ঠেলা দেয় না। তবে একথাও সঙ্গে সঙ্গে স্মরণীয় যে, "খাঁটি রসাত্মক বাণী ভাবের কথা, প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না"।

রাজা ও রাণী

'রাজা ও রাণী' নাটক ১২৯৬ সালে ২৫শে শ্রাবণ প্রকাশিত এবং "শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়দাদা মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে" উৎসৃষ্ট, আর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর 'এমারেল্ড' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে এইরূপ নাটক রবীন্দ্রনাথের যে কয়খানি—'রাজা ও রাণী' তাহাদের অন্যতম এবং প্রথম (অবশ্য কালানুক্রমের দিক দিয়া)। এই অভিনয় ৩০শে নভেম্বর হইতে বোধ হয় ১২ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, কারণ 'রাজা ও রাণী'র পরে ১৩ই ডিসেম্বর হইতে 'এমারেল্ড'-এ 'গোপীগোষ্ঠ' (অতুল মিত্র) অভিনয় আরম্ভ হয়।

নাটকের বিষয়

রাজা ও রাণী করুণরসাত্মক বিয়োগান্ত এবং বিষাদ-পরিণাম একখানি চতুরঙ্ক নাটক। বিক্রমদেব নামক জনৈক মোহ-স্বভাব রাজার বিপর্য্যস্ত বাসনার শোচনীয় পরিণতি এই নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য। রাজা বিক্রমদেব রাণী সুমিত্রাকে সঙ্কীর্ণ বাসনার আলিঙ্গনে আবদ্ধ রাখিয়া নিঃশেষে ভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই আসঙ্গ-মোহে তিনি আবিষ্ট এবং যত আবিষ্ট তত তাঁহার অন্তর্দৈন্য এবং রাজশ্রীর প্রতি উপেক্ষা—এমন কি বিরাগ। এই মোহই তাঁহাকে রাণীর অন্তঃপুরে স্বেচ্ছাবন্দী করিয়া ফেলিল তথা অন্যান্য সত্তাগুলিকেও নিষ্ক্রিয় ও পঙ্গু করিয়া সম্পূর্ণ ব্যক্তিটিকে করিয়া তুলিল বিকৃত। মোহের বিষম আকর্ষণে রাজার ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গেল, রাজা আসঙ্গ-কামনার দিকে অন্ধ অবেগে ছুটিয়া চলিলেন—'রাজসত্তা' শক্তি

হারাইতে হারাইতে অরাজকতার শেষ সীমায় যাইয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তব্যের যোগে সকলের সহিত যেখানে কল্যাণের যোগ, সেই যোগ হারাইয়া রাজা অকল্যাণের বাহক হইয়া দাঁড়াইলেন। রাণী সুমিত্রা—আপন ব্যক্তিত্বের প্রত্যেকটি অংশ-সত্তার চেতনায় যিনি মহিমময়ী, যিনি প্রকৃতই ধর্মপত্নী—পত্নী ও মহিষী যাঁহার পূর্ণ পরিচয়—রাজার সমগ্র আকর্ষণের লক্ষ্য বা শোষণ-স্থল হইয়া পড়ায় নিজেকে অপরাধী মনে না করিয়া পারিলেন না। রাজার প্রেমেই তিনি একদিন রাজাকে আঘাত দিলেন — রাজাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। মোহগ্রস্ত রাজাকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিরাট সুষমায়—রাজমহিমায়—প্রতিষ্ঠিত করিতে আত্মত্যাগের দুর্গম পথে দুঃসহতম সাধনায় ব্রতী হইলেন। রাজার দুর্বার এবং একাগ্র মোহ আঘাতের বাধা পাইয়া উন্মত্ত হিংসার রূপে সম্ভোগ-মেরু হইতে শক্তি-মেরুতে যাইয়া ভর করিল। বাসনার-ধ্যানের-ধন সুমিত্রাকে না পাওয়ার অবদমিত অনুতাপ এবং অবসাদকে রাজা শক্তির উত্তপ্ত মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়া প্রশমিত করিতে ব্যগ্র হইলেন। রাজমহিমায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইয়া রাজা যুদ্ধের-জন্য-যুদ্ধের স্রোতে ঝাপাইয়া পড়িলেন। উত্তেজনার মদিরা তাঁহার চাইই চাই। এখানেও সেই অন্ধ আবেগ উত্তেজনা-লিপ্সায় অন্ধ আঘাত করিবার আনন্দে উন্মত্ত-অধীর। উদ্যত আঘাতের সম্মুখে তাঁহার আত্ম-পর কোনও বিচারই নাই। যে রাজ-মহিমাকে উপেক্ষা করায় সুমিত্রা তাঁহাকে নিদারুণ আঘাত দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই মহিমার পূর্ণপাত্র এক চুমুকে পান করিতে না পারিলে তাঁহার স্বস্তি নাই; দীপ্ততম রশ্মি-প্রপাত দিয়া কলঙ্কের দূরতম ছায়াকেও তাঁহাকে জ্বালাইয়া দিতে হইবে। এই অন্ধ বিক্ষোভে তিনি আপন শ্যালক কুমারসেনকে শুধু যুদ্ধে হারাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না — পাছে "গিরিরুদ্ধ কাশ্মীরের

বাহিরে পড়িয়া রবে যত অপমান"— সিংহাসনে কলঙ্কের ছাপ কাশ্মীর পর্য্যন্ত ছুটিয়া গেলেন। "জীবিত কি মৃত" কুমারসেনকে তাহার চাইই চাই। কারণ, "রাজার প্রধান কাজ আপনার মান রক্ষা করা"। প্রচণ্ড প্রেমের মতো "অভ্রভেদী সর্বগ্রাসী উদ্দাম উন্মাদ দুর্নিবার" প্রবল জ্বালা লইয়া রাজা বিক্রমদেব বিদ্রোহী কুমারসেনকে বন্দী করিতে ত্রিচূড় রাজ্যে মৃগয়ার ছলে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরাত্মা মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল — "হে বিক্রম, ক্ষান্ত করো এ সংহার-খেলা। এ শ্মশাননৃত্য তব থামাও থামাও, নেবাও এ চিতা"। আর ত্রিচূড় রাজকন্যা ইলা প্রবল প্রেমের মাধুর্য্যের আকর্ষণে রাজাকে প্রেমোন্মুখ করিয়া তুলিল — প্রেমের সম্মোহন স্পর্শে শক্তিমত্ত প্রেমতৃষ্ণার্ত্ত রাজা আবার প্রেমস্বর্গের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্তির আলম্বন সুমিত্রার বিদায়ের সহিত অন্তর্হিত হইয়াছে; অগত্যা পরোক্ষ পরিতৃপ্তি লইয়াই মন সন্তুষ্ট, প্রকৃতিস্থ হইতে চাহিল।

ইলার সহিত কুমারসেনের মিলন ঘটাইয়া মিলনের তথা প্রেমের মাধুর্য্যকে পরোক্ষতঃ উপলব্ধি করিয়া অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিতে অগত্যা চেষ্টা করিলেন। তাঁহার কামনা হইল— "প্রেম-স্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে ধন্য হই"। কিন্তু সংহার-খেলায় মত্ত হইয়া কুমারসেনকে যে পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাণ না দিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার কোন উপায় কুমারসেনের ছিল না। কুমারসেন নিজের শির দিয়া কাশ্মীরের মান ও প্রাণ রক্ষার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। ভগিনী সুমিত্রা শোক-মূর্চ্ছিতা হইলেও কাশ্মীর রাজকন্যা সুমিত্রা শেষ পর্য্যন্ত রাজকুমার যুবরাজ কুমারসেনের 'ছিন্ন শির' বহনের কঠিনতম দায়িত্বভার বহনে সম্মত হইলেন। স্বর্ণথালে ছিন্নমুণ্ড লইয়া সুমিত্রা কাশ্মীর রাজসভায়

প্রবেশ করিলেন ; এদিকে বিক্রমদেব কুমারকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু সুমিত্রার প্রবেশ তাঁহাকে শুধু অপ্রস্তুত ও আশ্চর্য্যান্বিত করিল তাহাই নহে, সুমিত্রা আতিথ্যের যে উপহার স্বর্ণথালে উপস্থিত করিল, তাহা তাহাকে অপরাধের সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ করিয়া দিল — আর সুমিত্রার "পতন ও মৃত্যু" তাহার হারানো স্বর্গকে নাগালের মধ্যে আনিয়াও চিরদিনের জন্য নাগালের বাহিরে অপসারিত করিয়া দিল। রাজা বিক্রমদেব রাণীকে — তাঁহার হৃদয়ের রাণীকে —পাইয়াও হারাইলেন —রাণীর হৃদয় অধিকার করিবার যোগ্যতা যেক্ষণে সম্পূর্ণ অর্জ্জন করিলেন, সেইক্ষণেই প্রেমের প্রতিমার বিসর্জ্জন ঘটিল। অতৃপ্ত কামনার অন্তর্দাহের জ্বালা নিবু নিবু হইতে না হইতেই অনুতাপের অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—চির-অপরাধের 'পুটপাক' তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

নাটকের জাতিপ্রকৃতি

এইরূপ এক ব্যক্তির জীবন-কথা ট্র্যাজেডি নাটকেরই উপযুক্ত বিষয় এবং রাজা বিক্রমদেবের জীবন বাস্তবিক অতি শোচনীয়। অতএব এমন চরিত্র যে-নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সে-নাটককে ট্র্যাজেডি-করুণ নাটক বলা অন্যায় নহে। কিন্তু নাটকখানিকে বিনা আপত্তিতে ট্র্যাজেডি বলিবার উপায় নাই। নাটকখানির ঘটনা-বিন্যাস খুবই আপত্তিকর— এক কথায়, মেলোড্রামাটিক। নাটকের কয়েকটি ঘটনা যেমন অসম্ভাব্য, তেমনি রোমাঞ্চময়।

সুমিত্রা চরিত্রের গতি ও পরিণতি সম্ভব কি না এ প্রশ্নের অবতারণা না করিয়াও কয়েকটি আকস্মিক এবং রোমাঞ্চকর ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বর্ণথালে কুমারের কর্ত্তিত শির প্রদর্শন, সুমিত্রার "পতন ও মৃত্যু" এবং ইলার আকস্মিক আগমন ও মূর্চ্ছা—এই

ঘটনাগুলি অতি নাটকীয় (মেলোড্রামাটিক) এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রশ্ন আসিবে—যে নাটকের কাহিনী অসম্ভাব্য ঘটনার সমবায়ে রচিত, যেখানে আকস্মিক ও অতিনাটকীয় ঘটনা দ্বারা রস সৃষ্টির চেষ্টা পরিস্ফুট, সেই নাটককে "মেলোড্রামা" বলা হইবে না কেন ?

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে 'মেলোড্রামা'-সুলভ ঘটনা থাকিলেই যদি কোন নাটককে মেলোড্রামার শ্রেণীতে নামাইয়া দিতে হয় তাহা হইলে 'রাজা ও রাণী'কে ন্যায়ত মেলোড্রামাই বলিতে হইবে। কিন্তু এখানেই উল্লেখ করিতে হইবে যে—মেলোড্রামা-সুলভ ঘটনা থাকা সত্ত্বেও নাটক ট্রাজেডির মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে এবং পারে বিশেষ একটি গুণের জন্য বা ধর্ম্মের জন্য। এই ধর্ম্মটি—Universality অর্থাৎ "an insistence upon something deeper and more profound than mere outward events"। এই সার্ব্বজনীনতা—গভীরতা এবং মহিমময়তা না থাকিলে কোন নাটকই উচ্চাঙ্গের নাটক হইতে পারে না। সমালোচক এলারডাইস্ নিকল মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"Whenever a tragedy lacks the feeling of universality, whenever it presents merely the temporary and the topical, the detached in time and in place, then it becomes simply sordid or never aspires to rise above melodrama. If we have not this, however well-written the drama may be, however perfect the plot, and however brilliantly delineated the characters, the play will fail". উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডির প্রধান বৈশিষ্ট্য—সার্ব্বজনীনতা, আবেদনের গভীরতা এবং গম্ভীরতা। এই ধর্ম্মটি থাকিলে, রোমাঞ্চকর ঘটনা থাকা সত্ত্বেও নাটক ট্র্যাজেডির মর্য্যাদা

লাভ করিতে পারে। (Even a high tragedy, such as *Hamlet*, may have decidedly melodramatic or sensational elements in the plot.—*The Theory of Drama*— P. 89.)

"রাজা ও রাণী" নাটকে আবেদনের সার্ব্বজনীনতা, গভীরতা এবং গম্ভীরতা এত লক্ষণীয় যে ঐ বিষয়ে কোনরূপই সন্দেহ করা যায় না। এই কারণেই নাটকখানি ট্রাজেডির মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে — নানারূপ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, — সার্ব্বজনীনতা গুণে ট্রাজেডি-গৌরবের অধিকারী হইয়াছে। অর্থাৎ আঙ্গিক-এর দিক দিয়া আপত্তি করা চলিলেও, 'ভাবিক'-এর দিক দিয়া নাটকখানির ট্রাজেডিত্বে আপত্তি করা চলে না। ডাঃ শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় নাটকখানির আঙ্গিক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এ কথা সত্য, 'রাজা ও রাণী' নাটকীয় গঠন ও ঘটনা-বিন্যাসে শিথিল, একটু মেলোড্রামাটিক, চমকপ্রদ ; এবং ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতি কবিকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় নাই।" (কবি 'তপতী' লিখিয়া চিন্তা দূর করিয়াছিলেন সত্য), কিন্তু "রাজা ও রাণী একটু মেলোড্রামাটিক, চমকপ্রদ" এই সিদ্ধান্ত দ্বারা 'রাজা ও রাণী'কে 'মেলোড্রামা'র শ্রেণীতে নামাইয়া দিলেন কি না স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার ঘোষ মহাশয়ও নাটকখানির বিশ্লেষণ করিবার সময় নাটকে "অনেক স্থূল ও রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা" স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু ঐ স্থূল ও রোমাঞ্চকর ঘটনা থাকায় নাটকখানির যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে যে সন্দেহ স্বাভাবিক, সেই সন্দেহের নিরসন করিতে চেষ্টা করেন নাই — অর্থাৎ 'রাজা ও রাণী' ট্রাজেডি কি মেলোড্রামা এ প্রশ্নের মীমাংসা অজিতবাবু করেন নাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও নাটকখানির ত্রুটির দিকে স্পষ্টভাবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন — লিখিয়াছেন, "এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্ব্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি"।

সুতরাং স্পষ্টভাবেই দেখা যাইতেছে যে নাটকখানিতে মেলোড্রামা-সুলভ স্থূল ও রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা আছে, উচ্ছ্বাসময়তা আছে; নাটকখানির আঙ্গিক ত্রুটি বিষয়েও সমালোচকগণ আস্তিক (positive) এবং একমতাবলম্বী; অতএব, নাটকখানি ট্র্যাজেডি কি মেলোড্রামা এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক এবং এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই নাটকের যথার্থ পরিচয় নির্ভর করে। আমরা এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা পূর্ব্বেই যুক্তিসহকারে উপস্থাপিত করিয়াছি এবং সে সিদ্ধান্ত এই যে নাটকখানির মধ্যে মেলোড্রামার লক্ষণ থাকিলেও একটি বিশেষ ধর্ম্মের জন্য—আবেদনের সার্ব্বজনীনতার এবং গভীরতার জন্য নাটকখানি ট্র্যাজেডির শ্রেণীতেই উন্নীত হইয়াছে।

'নাটক-তত্ত্ব' বিচার বিষয়ক ইংরেজী গ্রন্থগুলিতে ট্র্যাজেডি এবং মেলোড্রামার যে লক্ষণাদি নিরূপিত করা হইয়াছে, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত অগত্যা করিতেই হইবে। কারণ, শেষ পর্য্যন্ত আবেদনের সার্ব্বজনীনতা, গভীরতা এবং গম্ভীরতার দ্বারাই ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামার পার্থক্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে—কেবল মাত্র ঘটনার আকস্মিকতা, স্থূলতা, উচ্ছ্বাসময়তা এবং রোমাঞ্চকরতা দ্বারা নহে। †

নাটকের গঠনগত দোষ-গুণ

প্রথমেই নাট্যকারের উপলব্ধিকে বিবৃত করা যাউক: নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখিতেছেন—

---

† নাটকের জাতি-নিরূপণে ট্র্যাজেডি-মেলোড্রামা বিভাগ প্রতীচ্য সাহিত্য-শাস্ত্রের বিধান—সুতরাং প্রতীচ্য মতবাদের সূত্র দ্বারাই বিচার কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু এ কথা না বলিয়া উপায় নাই যে, সূত্রকারগণ অবিসংবাদিত সিদ্ধান্তে আজও পৌঁছাইতে পারেন নাই। বাংলা নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে

"এর নাট্যভূমিতে র'য়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্ব্বল। এ হ'য়েছে কাব্যের জলা-ভূমি, ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা শোচনীয়রূপে অসংগত। এই নাটকে যথার্থ নাট্য-পরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দ্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দ্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী"।

তারপর "তপতী" নাটকের ভূমিকায়ও নাট্যকার বিবৃতি দিয়াছেন—'রাজা ও রাণী' আমার অল্প বয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা"। "সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটা বিরোধ আছে—সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হলো। এইটেই রাজা ও রাণীর মূল কথা।

"রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ ক'রেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হ'য়েছে ভাবগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকেই অন্তিমে কুমারের মৃত্যুর দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে—এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য্য পরিণাম নয় "।

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ও (রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকায়) লিখিয়াছেন—

যাইয়া অনেক সমালোচকই এই অস্পষ্টতার জালে জড়াইয়া মতি স্থির রাখিতে পারেন না। এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

"বিক্রমের বিপুল প্রেমাবেগ প্রতিহত হইয়াছে সুমিত্রার স্থির অবিচল সত্যবুদ্ধি ও প্রেমের কাছে এবং প্রতিহত হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছে দুর্দম হিংসায় ও হিংস্রতায়; যে-প্রেম আঘাত করিতেছিল নিজেকে সে-প্রেম প্রতিহত হইয়া এইবার আঘাত করিল সকলকে; তাহার মধ্যে নাই ক্ষমা, নাই বিচার-বুদ্ধি। নাটকীয় সম্ভাবনা এই রূপান্তরের মধ্যে নিহিত; কিন্তু তাহার পরেই ইলা ও কুমারের সে গীতিকাব্যিক উপাখ্যান নাটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে তাহা যে শুধু জলীয় তাহাই নহে নাটকীয় সম্ভাবনার দিক হইতে অবান্তরও বটে।"

আমার মনে হয়—নাট্যকার এবং ডাঃ রায় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখেন নাই এবং দেখিলে দেখিতে পাইতেন যে নাট্যকারের 'নাট্য-পরিণতি' এবং ডাঃ রায়ের 'নাটকীয় সম্ভাবনা' নাটকের 'গর্ভ-সন্ধি' মাত্র। মধ্যপথকে পথের শেষ মনে করায়, উভয়ের দৃষ্টিই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, ফলে কুমারসেন-ইলা কাহিনী (নাট্যকারের কাছে) "শোচনীয়রূপে অসঙ্গত" এবং (ডাঃ রায়ের কাছে) "নাটকীয় সম্ভাবনার দিক হইতে অবান্তরও বটে" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইলা ও কুমারের গীতিকাব্যিক উপাখ্যান জলীয় কি গাঢ়-রসীয় এই প্রশ্নের আলোচনার মধ্যে এক্ষেত্রে প্রবেশ করা অনাবশ্যক, কিন্তু নাটকীয় উপযোগিতার হিসাবে, কাহিনীটির তাৎপর্য্য উপেক্ষণীয় কিনা—এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা অত্যাবশ্যক। সুতরাং এই অংশে আমাদের প্রথম আলোচ্য—'নাট্য-পরিণতি' বা নাটকীয় সম্ভাবনা এবং দ্বিতীয় আলোচ্য—কুমারসেন-ইলা উপাখ্যানের নাটকীয় উপযোগিতা। এই দুইটি বিষয়ের মীমাংসা না করিলে নাটকখানির প্রকৃত বিচার সম্ভব নহে। গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল যে—নাট্যকারের এবং ডাঃ

রায়ের মতের সহিত আমি এই দুইটি বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি নাই।

প্রথম বিষয়—নাটকের যথার্থ নাট্য-পরিণতি। এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলিলেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না যে "এই নাটকে যথার্থ নাট্য-পরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দ্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দ্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী"। এই নাটকের যে 'বীজ' তাহার একমাত্র এবং স্বাভাবিক পরিণতি—বিশ্বঘাতী হইয়া উঠা নহে। বিক্রমের বিশ্বঘাতী হিংস্রতা চরিত্রটির অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা মাত্র আর এই অবস্থা চরিত্রটির স্বাভাবিক পরিণতির অন্যতম একটি 'পর্য্যায়' হইলেও নাটকীয় পরিণতি নহে। কারণ এই অবস্থাটি—দুর্দ্দান্ত হিংস্রতা—একই বা সমানভাবে অগ্রসর হইয়া চরিত্রটিকে না করিতে পারে আনন্দ-পরিণাম, না করিতে পারে দুঃখ-পরিণাম। এই দুর্দ্দান্ত হিংস্রতা, নিক্ষিপ্ত 'ব্যুমেরাঙে'র মত নিক্ষেপকারীর বুকে আঘাতরূপে ফিরিয়া আসিয়া অথবা অন্য কোনরূপে আপনার গতিবেগ হারাইয়া ফেলিয়া—যুযুধান ব্যক্তিত্বের তীব্র বিরোধের সমাধান সৃষ্টি করিয়া এক শান্ত সমন্বয়ের মধ্যে আত্মপরিণাম তথা নাটকীয় পরিণাম লাভ করিতে পারে—এই কারণেই দুর্দ্দান্ত প্রেম প্রতিহত হইয়া দুর্দ্দান্ত হিংস্রতায় যেখানে পরিণত হইয়াছে, সেখানেই নাট্য-পরিণতি ঘটিয়াছে এ কথা সত্য নহে। সত্য কথা এই যে, দুর্দ্দান্ত প্রেম প্রতিহত হইয়া দুর্দ্দান্ত হিংস্রতায় পরিণত হইয়া, বিশ্বঘাতী হইতে হইতে যেখানে আত্মঘাতী হইয়া পড়িয়াছে, সেখানেই এই নাটকের যথার্থ নাট্য-পরিণতি—যথার্থ ট্র্যাজিক পরিণতি। এই ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটাইতে যাইয়া নাট্যকার চরিত্রটি যে-পরিস্থিতির মধ্যে লইয়া গিয়াছেন, তাহার ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যাইতে

পারে সত্য, কিন্তু ঐ পরিণতি যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত তাহা বলা চলে না। চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঘটনার সম্ভাবনা একেবারে না পাওয়া যায় এমন নহে। যাহাই হউক, নাটকের যথার্থ নাট্য-পরিণতি সম্বন্ধে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ নিজে এবং 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা'-লেখক ডাঃ রায় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে—দুর্দ্দান্ত হিংস্রতা নাটকের 'ভাব-যতি' হইতে পারে, 'রস-যতি' (ছন্দের পরিভাষায় বলিলে) নহে।

দ্বিতীয় আলোচ্য — কুমারসেন-ইলার কাহিনীর নাটকীয় উপযোগিতা। নাট্যকারের নিজের মত এই—"লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ আর সেটা শোচনীয় রূপে অসঙ্গত"। আমার মনে হয়, এই মন্তব্য করিবার সময়ে ভাষ্য-কার রবীন্দ্রনাথ, স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। দুর্দ্দান্ত প্রেমকে প্রতিহত করিয়া দুর্দ্দান্ত হিংস্রতায় পরিণত করার পরে নাট্যকারের সম্মুখে এই সমস্যাই দেখা দিয়াছিল—কি উপায়ে নাটকের কাহিনীটিকে নাট্য-পরিণতি দান করা চলে, বিক্রমদেব-চরিত্রটিকে 'ট্র্যাজিক' করিয়া তোলা চলে। নাটকীয় ঘটনার স্বাভাবিক গতি রাণীর পিত্রালয়ের অভিমুখে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই; কিন্তু সমস্যা এই যে, কিরূপে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করিয়া বিক্রমের জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটানো যায়। ঘটনা এমন হইতে পারিত যে, রাজা কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া নির্ব্বিচার হিংসায় মত্ত হইলেন। —রাণীর পিতৃভূমিতেই পুরুষকারের প্রমাণ দিতে যাইয়া শেষ পর্য্যন্ত রাণীকেই হত্যা করিয়া বসিলেন। ("তপতী" নাটকে এইভাবেই অগ্রসর হইয়াছেন।) তাঁহার অতৃপ্ত কামনা চিরদিনের জন্য অতৃপ্তই রহিয়া গেল। কিন্তু নাট্যকার এইরূপ পরিকল্পনার মধ্যে যান নাই; তিনি রাজাকে আরো জটিল পরিস্থিতির

মধ্যে রাখিয়া পরিণামকে আরো শোচনীয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; দুর্দান্ত হিংস্রতার বশেই রাজাকে চিরক্ষণ রাখেন নাই, রাজার যে মূল-প্রকৃতি সেই প্রকৃতির সহিত সঞ্চারী হিংসা-প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া চরিত্রটিকে আরো গভীর ও দ্বন্দ্বকরুণ করিয়া তুলিয়াছেন। এই প্রয়োজনেই কুমারসেন-ইলার কাহিনী আসিয়াছে। ইলার "প্রবল প্রেম" "প্রেমস্বর্গচ্যুত" রাজাকে আবার প্রেমের স্নিগ্ধ স্পর্শে হিংসামুক্ত করিয়া তুলিয়াছে: রাজার দুর্দান্ত হিংস্রতাকে প্রশমিত করিয়া দিয়াছে; তাই রাজা বলিয়াছেন—"যুদ্ধ নাহি ভাল লাগে"। কিন্তু রাজা যাঁহাকে পাইবার জন্য অশান্ত চিত্তে—'অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ' লইয়া জয়ধ্বজা স্কন্ধে বহিয়া দেশ-দেশান্তরে বেড়াইতেছেন সেই "প্রেমময়ী" কোথায়? তাই তাঁহার কাছে—"শান্তি আরো অসহ্য দ্বিগুণ"। এই শান্তিই তাঁহার আন্তরিক কামনা, এবং এই শান্তি পাওয়ার উপায় সম্মুখে না থাকাতেই—"শান্তি আরো অসহ্য দ্বিগুণ"। ইলার প্রবল প্রেমের আকর্ষণে রাজাকে আবার প্রেমের রাজ্যের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। তাই রাজার মধ্যে বিষণ্ণ শ্রান্তি—তাই কুমারসেনকে চাহেন তিনি প্রেমে বন্দী করিতে আর—"আর-কেহ"র জন্য অন্তরে তাঁহার হতাশ ক্রন্দন।

কিন্তু পরোক্ষ পরিতৃপ্তির জন্য রাজা যে আয়োজন করিলেন তাহাও বিপর্যস্ত হইয়া গেল। না ঘটাইতে পারিলেন কুমারসেনের সহিত ইলার মিলন, অধিকন্তু নিজের রাণীর সহিত মিলনের সম্ভাবনাও চিরতরে তিরোহিত হইয়া গেল। অন্তর্দাহের তীব্র জ্বালার সহিত চির-অপরাধের গ্লানি মিশিয়া রাজার শোচনীয়তাকে তীব্রতর করিয়া তুলিল। এখন, এই পরিকল্পনা করা সঙ্গত হইয়াছে কি অসঙ্গত হইয়াছে, পরে বিচার করা যাইবে; কিন্তু এই পরিকল্পনার মধ্যে

কুমারসেন-ইলার উপাখ্যানের উপযোগিতা যে অস্বীকার করা যায় না — ইহাই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় (আর এই বিষয়টি যুক্তিসহকারেই প্রতিপাদিত হইয়াছে)। উপাখ্যানটিতে গীতিকাব্যিক উচ্ছ্বাসই থাকুক, আর যাহাই না থাকুক, কাহিনীটি বর্ত্তমান পরিকল্পনায় একেবারে অবান্তর নহে। ডাঃ রায় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন — "প্রেমস্বর্গচ্যুত বিক্রম আপনাকে বুঝি বহুদিন পরে ফিরিয়া পাইলেন, বহুদিন পরে বুঝি সত্য প্রেমজ্যোতির একটু আভাস পাইলেন, ইলার মুখে বুঝি তাহার উদগ্র হিংস্র যুদ্ধোন্মত্ততা শীতল হইয়া আসিল, বুঝি 'শিশির-শীতল প্রস্ফুটিত শুভ্রমেঘের' একটি বিন্দুলাভ করিবার জন্য আবার সেই পুরাতন দিনগুলিকে তাহার সব সুখদুঃখভার লইয়া পাইবার জন্য সমস্ত অন্তর তৃষিত হইয়া উঠিল।" আশ্চর্য্য। এত বুঝি বুঝি' করিয়াও শ্রদ্ধেয় নীহারবাবু কাহিনীটির উপযোগিতা বুঝিলেন না কেন, ভাবিবার বিষয়। ইলার "প্রবল প্রেমের' সহিত হিংসোন্মত্তগতি রাজাকে ধাক্কা লাগাইবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য্য হইলে বা ধাক্কা লাগানো অসঙ্গত পরিকল্পনা না হইলে—কাহিনীটিকেও অবান্তর বলা যুক্তিযুক্ত নহে। এই কাহিনীকে অবান্তর বলিবার আগে প্রথমেই বলা উচিত যে, যে-পরিকল্পনার সাহায্যে নাট্যকার নাট্য-পরিণতি ঘটাইয়াছেন, সেই পরিকল্পনাই অ-মনস্তাত্ত্বিক এবং অসঙ্গত। রাজাকে উন্মত্ত হিংসায় অবিরামভাবে মাতাইয়া রাখিয়া নাট্য-পরিণতি ঘটানো উচিত ছিল, বর্ত্তমান পরিকল্পনা অস্বাভাবিক তথা অসঙ্গত হইয়াছে — এইরূপ সিদ্ধান্তে না পৌঁছানো পর্য্যন্ত এ বিষয়ে চূড়ান্তভাবে এই কাহিনীকে অবান্তর বলা উচিত নহে। আমার মনে হয় — নাট্য-পরিণতির যথার্থ রূপটি চোখে না পড়াতেই ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথ এবং ডাঃ নীহারবাবু স্রষ্টা-রবীন্দ্রনাথকে ঠিক অনুসরণ করিতে পারেন নাই। স্রষ্টা-রবীন্দ্রনাথ যে মনস্তাত্ত্বিক

সম্ভাবনার দিকে কাহিনীকে প্রসারিত করিয়াছেন তাহার প্রতি উপেক্ষা না থাকিলে দেখা যাইবে যে কুমারসেন শেষাংশে প্রাধান্য লাভ করিলেও রাজা বিক্রমদেবের ট্রাজেডির অন্যতম 'নিমিত্ত' রূপেই করিয়াছে। রাজার দুর্দান্ত হিংস্রতার আঘাত কুমারসেনকে নিহত করিয়া আত্মঘাতরূপে নিজের বুকে ফিরিয়া আসিল এবং এই ফিরিয়া আসাই বিক্রমদেবের ট্র্যাজেডিতে পূর্ণাহুতি। গর্ভসন্ধির উচ্চচূড়া হইতে কাহিনীটিকে বা চরিত্রকে উপসংহারের দিকে সরলরেখায় লইয়া না যাওয়াতেই—ইলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। "তপতী" নাটকের পরিণামের সহিত এই নাটকের পরিণামের তুলনা করিলেই ধারণা স্পষ্ট হইয়া যাইবে।

'রাজা ও রাণী' নাটকের ক্রটি নাট্যকারকে খুবই পীড়া দিয়াছিল এবং ঐ ক্রটি সংশোধনের চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। 'তপতী' নাটকখানি সেই চেষ্টার ফল। কিন্তু 'তপতী' নাটকখানিকে "রাজা ও রাণী"র উন্নততর বা বিশুদ্ধতর সংস্করণ বলা যে চলে না, রবীন্দ্রনাথ নিজেও খানিকটা স্বীকার করিয়াছেন। 'তপতী' যথার্থই ঢালিয়া সাজা আয়োজন। "রাজা ও রাণী"র দোষ এড়াইতে যাইয়া নাট্যকার স্বভাবদোষে লিরিক-দোষ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে যেমন পারেন নাই, তেমনি "রাজা ও রাণী"র অন্তর্দ্বন্দ্ব-মহিমার গুণটিও হারাইয়া ফেলিয়াছেন। "রাজা ও রাণী"র বিক্রমদেব এবং "তপতী"র বিক্রমদেব প্রধান ভাব-বন্ধের তথা অন্তর্দ্বন্দ্বের দিক দিয়া এক ব্যক্তি নহে। তদ্রূপ সুমিত্রাও এক নহে। "রাজা ও রাণী"র বিক্রমদেব যেখানে প্রেমের ধাতু দিয়া গড়া, "তপতী"র বিক্রমদেব সেখানে রাজ-অভিমানে গড়া। তেমনি "রাজা ও রাণী"তে সুমিত্রা মূলতঃ যেখানে প্রেয়সী ও মহিষী, সেখানে "তপতী"তে সুমিত্রা 'কাশ্মীর-কন্যা' এবং কাল-ভৈরবের মানস-কন্যা। আসলে পরিকল্পনার

দিক দিয়া "রাজা ও রাণী" এবং "তপতী" দুই খানি ভিন্নধর্ম্মের নাটক।

কেন্দ্রীয় চরিত্র বিশ্লেষণ

এক্ষণে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কাহিনীটির যে রূপ প্রকাশ পাইতে পারে, তাহা সতর্কতার সহিত অনুসরণ করিলেই 'রাজা ও রাণী' নাটকের উপস্থাপ্য বিষয় সম্যক জানা যাইবে। এই জন্য কেন্দ্রীয় চরিত্রটির (বিক্রমদেব) বিশ্লেষণই যথেষ্ট।

রাজা বিক্রমদেব জালন্ধরের অধিপতি আর প্রেমিক বিক্রমদেব কাশ্মীর-কন্যা জালন্ধর-মহিষী রাণী সুমিত্রার প্রণয়-ভিখারী। বিক্রমদেবে এই দুই ব্যক্তিত্বের নির্ব্বিরোধ সমন্বয় ঘটিতে পারে নাই। প্রেমিক বিক্রমদেব মোহ-স্বভাব, প্রেম তাহার মধ্যে মোহের অন্ধ আবেগে পরিণত হইয়া, অতৃপ্তির অনির্ব্বাণ অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। সুমিত্রাকে তিনি বাসনার মাকড়সার-জালের মধ্যে বাঁধিয়া ভোগ করিতে চাহেন,—সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যের বন্ধন হইতে ছিনাইয়া লইয়া সুমিত্রাকে তিনি অন্তর-নিবাসিনী করিতে চাহেন। তাঁহার একান্ত বাসনা—"সংসারের কেহ নয়, অন্তরের তুমি ; অন্তরে তোমার গৃহ—আর গৃহ নাই—বাহিরে কাঁদুক পড়ে বাহিরের কাজ।" সুমিত্রা যতই তাঁহাকে স্মরণ করাইতে চাহেন—"অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী" ততই ক্ষুব্ধ হন—তাঁহার 'রাজ'-সত্তাকে তিনি অস্বীকার করিতে উদ্যত হন, বলেন "নহি আমি রাজা"। এইরূপ মোহময় প্রেমে বিক্রমদেব আকণ্ঠ নিমজ্জিত। ফলে, "রাজ্যের বক্ষের পর সগর্বে দাঁড়ায়, বধির পাষাণ-রুদ্ধ অন্ধ অন্তঃপুর। রাজশ্রী দুয়ারে বসি অনাথার বেশে কাঁদে হাহা রবে"। অধিকন্তু, এই মোহের সুযোগে "রাণীর কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরী দেশ জুড়ে বসিয়াছে। রাজার প্রতাপ ভাগ করি লইয়াছে

খণ্ড খণ্ড করি……বিদেশীর অত্যাচারে জর্জ্জর কাতর কাঁদে প্রজা। অরাজক রাজসভা মাঝে মিলায় ক্রন্দন।" কিন্তু রাণী যত তাঁহাকে রাজ-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন, রাজা তত রাজ্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠেন—রাজ্যকেই বাসনা পুরণের প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করেন—রাণী যত বলেন, 'যাও রাজকাজে,' রাজা বিক্রমদেব তত বলেন—"কোন কাজ নাই, প্রিয়ে, মিছে উপদ্রব। ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, প্রজা সুখে আছে, রাজকার্য্য চলিছে অবাধে"— কর্ত্তব্যপালন তাঁহার কাছে আজ আত্ম-পীডন,—কর্ত্তব্য কারাগার। মুগ্ধ রাজার আজও এক কথা— 'সকল কর্ত্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর।' প্রেম 'এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্ত্তব্য'।

রাণী যত বলেন—"এ রাজ্যের প্রজার জননী আমি। প্রভু, পারিনে শুনিতে আর কাতর অভাগা সন্তানের করুণ ক্রন্দন। ……যুদ্ধ করো।" কিন্তু বিক্রমদেব মোহে একান্ত অটল—'ভালো, যুদ্ধে যাব আমি। কিন্তু, তার আগে তুমি মানো অধীনতা; তুমি দাও ধরা, ধর্ম্মাধর্ম্ম আত্মপর সংসারের কাজ সব ছেড়ে হও তুমি আমারি কেবল'। রাণী নিরুপায় হইয়া আজ্ঞা চাহেন— "মহিষী হইয়া আপনি প্রজারে আমি করিব রক্ষণ"। রাজার মধ্যে আত্ম-বিশ্লেষণ জাগে—রাজ-সত্তার তন্দ্রাচ্ছন্ন জাগরণ ঘটে, রাজা বলেন "সুখী হোক, সুখে থাক, এ রাজ্যের সবে! কেন দুঃখ, কেন পীড়া… কেন মানুষের পরে মানুষের এত উপদ্রব। দুর্ব্বলের ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র শান্তিটুকু, তার পরে সকলের শ্যেনদৃষ্টি কেন? যাই দেখি যদি কিছু খুঁজে পাই শান্তির উপায়"। রাজা আদেশ দেন—"এই দণ্ডে রাজ্য হ'তে দাও দূর করে যত সব বিদেশী দস্যুরে"। কিন্তু কী বিড়ম্বনা—সেনাপতি নিজেই বিদেশী। রাজা নিরুপায়। রাণী সুমিত্রা উপায় স্থির করেন—"কালভৈরবের

পূজোৎসবে কর নিমন্ত্রণ। সেদিন বিচার হবে। গর্ব্বে অন্ধ দণ্ড যদি না করে স্বীকার, সৈন্যবল কাছাকাছি রাখিবো প্রস্তুত।" কিন্তু রাজার মধ্যে মোহের ঘোর তেমনি প্রবল। রাণীর দুয়ারে তিনি—"ক্ষুধার্ত্ত কঙ্কালসার কাঙ্গাল বাসনা"। রাণীর উপেক্ষার অশরীরী কশাঘাতে রাজার বিক্ষুব্ধ চিত্তে আত্মসমীক্ষা জাগে—"অপদার্থ আমি! দীন কাপুরুষ আমি! কর্ত্তব্যবিমুখ আমি, অন্তঃপুরচারী! কিন্তু মহারাণী, সে কি স্বভাব আমার।…… …নহে তাহা। জানি আমি আপন ক্ষমতা। রয়েছে দুর্জ্জয় শক্তি এ হৃদয়মাঝে, প্রেমের আকারে তাহা দিয়েছি তোমারে।" কিন্তু তবু রাজার মোহ কাটে না। দেবদত্ত নায়কগণের বিদ্রোহের সংবাদ লইয়া প্রবেশ করিলে রাজা বিরক্ত হইয়া বলেন—"দেবদত্ত অন্তঃপুর নহে মন্ত্রগৃহ।" রাণী কর্ত্তব্যে-জাগ্রত রাজাকে বলেন—"মন্ত্রণার কী আছে বিষয়। সৈন্য লয়ে যাও অবিলম্বে…রক্ত-শোষী কীটদের দলন করিয়া ফেলো চরণের তলে।" রাজা কিন্তু রাণীর এই কর্ত্তব্য-সচেতনতাকে সুস্থ চিত্তে গ্রহণ করিতে অক্ষম। রাণীর আচরণ তাঁহার কাছে উপেক্ষা রূপে প্রতীয়মান—রাজা ক্ষুব্ধ অভিমানে বলেন—"আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ। দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপন, করলগ্নকাঁটা। হেথা হতে একপদ নড়িব না রাণী। পাঠাইব সন্ধির প্রস্তাব—।" রাজা সুখস্বপ্নে বিভোর থাকিতে চাহেন।

অগত্যা রাণী রাজার প্রেমেই রাজাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান; রাজার হৃদয় শূন্যতায় হাহাকার করিয়া উঠে। 'বৃহৎ প্রতাপ' লোক-বল অর্থবল শূন্য স্বর্ণপিঞ্জরের মতো মনে হয়—ক্ষুদ্র পাখীর মত ক্ষুদ্র হৃদয়ের অভাবে—সব শূন্য, সব নিরর্থক হইয়া যায়। এই শূন্যতার বেদনা অভিমানে গুমরিয়া উঠে—"এমনি কি চিরদিন কাটিবে জীবন। সে দিবে না ধরা, আমি ফিরিব পশ্চাতে?"

...রাণীকে অন্তর হইতে বিদায় দিতে চাহেন—কিন্তু 'পলাও পলাও নারী' বলা এক কথা, আর হৃদয় হইতে হৃদয়-বাসিনীকে বিদায় দেওয়া আর এক কথা। রাজা রাণীর চোখের এক বিন্দু জলের জন্য ব্যাকুল,—অন্তর্বেদনা তাহার অসহ্য। আক্ষেপ উৎক্ষিপ্ত হয়—"অন্তর্য্যামী দেব, তুমি জান, জীবনের সব অপরাধ তাকে ভালো-বাসা; পুণ্য গেল, স্বর্গ গেল, রাজ্য যায়, অবশেষে সেও চলে গেল।" ক্রমে আক্ষেপ বেদনার চাপে উত্তেজনায় রূপান্তরিত হয়—ক্ষাত্র-ধর্ম্মের জন্য, রাজধর্ম্মের জন্য রাজা প্রস্তুত হন। কিন্তু আসলে এই প্রস্তুতি অবিমিশ্র পুরুষকারের জন্য নহে—ইহা যেন আত্মকৃত অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা। রাজা যতই বলুন—"আমারে পশ্চাতে ফেলে চলে গেছে চোর, আপনারে পেয়েছি কুড়ায়ে। আজি সখা, আনন্দের দিন।" কিন্তু এই কথা অন্তরের কথা নহে, ইহা সম্পূর্ণ মৌখিক—রাজাই স্বীকার করেন—"বন্ধু, বন্ধু, মিথ্যা কথা, মিথ্যা এই ভান! থেকে থেকে বজ্রশেল ছুটিছে, বিঁধিছে মর্ম্মে।" এই জ্বালাই রাজার মধ্যে তীব্র উত্তেজনা-বুভুক্ষা হইয়া দেখা দিয়াছে। তাই তিনি চাহেন—'উদগ্র সংগ্রাম, বুকে বুকে বাহুতে বাহুতে—অতিতীব্র প্রেমালিঙ্গন সম।" "রক্তে রক্তে মিলনের স্রোত—অস্ত্রে অস্ত্রে সংগীতের ধ্বনি।" এই উদ্দীপ্ত উত্তেজনার প্রেরণা—"আগে আমি আপনারে করিব মার্জ্জনা; অপযশ রক্ত-স্রোতে করিব ক্ষালন।" তাঁহার তৃপ্তির স্বরূপ—"কে বলিবে আজি মোরে দীন কাপুরুষ! কে বলিবে অন্তঃপুরচারী।" তাঁহার মৌখিক সান্ত্বনা—দুর্ব্বল আত্ম-সমর্থন, "হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধনমুক্তির সুখ! হিংসা জাগরণ! হিংসা স্বাধীনতা!"

একদিন শক্তি-সত্তা ছিল প্রেম-সত্তার দ্বারা আচ্ছন্ন, আজ 'প্রেম-সত্তার' প্রত্যক্ষ প্রকাশ ব্যাহত, তাই শক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়াই উহা

আজ হিংসার আকারে প্রকাশ খুঁজে। যে তেজ একদিন প্রেম-রূপে একান্ত আবেগে রাণীর দিকে ধাবিত ছিল, তাহাই আজ বিকৃত শক্তিরূপে—অন্ধভাবে, কাপুরুষতাকে ক্ষয় করিতে, অন্তঃপুর-চারিতাকে নিঃশেষ করিতে উন্মত্ত। এই উন্মত্ততাই যুদ্ধের আকারে অভিব্যক্ত। রাজমহিমাকে নিষ্কলঙ্ক করিয়াই তিনি নিজেকে মার্জ্জনা করিতে পারেন। তাই রাণী সুমিত্রা সোদর শঙ্করের সাহায্যে যুধাজিৎ ও জয়সেনকে বন্দী করিয়া যখন রাজার শিবিরে প্রবেশ করিতে অগ্রসর রাজা বিক্রমদেব সাক্ষাৎকার প্রত্যাখ্যান করেন। যে অপযশকে রক্তস্রোতে ক্ষালন করিতে তিনি বাহির হইয়াছেন, সেই অপযশের ডালি লইয়াই রাণী দর্শনপ্রার্থী। যুধাজিৎ জয়-সেনকে বন্দী করিয়া রাণী রাজার রাজমহিমাকেই দীন করিয়া দিয়াছেন। এই দীনতা তাঁহার অসহ্য। এই রাজমহিমার দৈন্যেই রাণী রাজাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন ;—দৈন্যের ছায়াটুকু আজ তাঁহার অসহ্য—সে দৈন্য যেই ঘটাক,—এমন কি রাণীর হাতের দেওয়া হইলেও তাহা অগ্রাহ্য—বোধ হয় আরো অসহ্য। বন্দী বিদ্রোহীরা রাজাকে যাহা বলিয়াছে—"আমরা তোমারই প্রজা, অপরাধ করে থাকি তুমি শাস্তি দিবে। একজন বিদেশী এসে আমাদের অপমান করবে এতে তোমাকেই অপমান করা হল—যেন তোমার নিজ রাজ্য নিজে শাসন করবার ক্ষমতা নেই। একটা সামান্য যুদ্ধ, এর জন্য অমনি কাশ্মীর থেকে সৈন্য এল, এর চেয়ে উপহাস আর কী হতে পারে।"—এই কথা না বলিলেও রাজা রাজমহিমাকে খর্ব্ব করিতে পারিতেন না। দেবদত্ত ঠিকই ধরিয়াছেন—"একটা যুদ্ধ করবার ছুতো। রাজা এখন যুদ্ধ ছাড়তে পারছেন না।" তাই যুধাজিৎ যেই বলিয়াছেন—"পলাতক অপরাধী সহজে নিষ্কৃতি পায় যদি রাজদণ্ড ব্যর্থ হয় তবে।" জয়সেন যুক্তি দিয়াছেন—"সিংহাসনে

দিয়ে আসি কলঙ্কের ছাপ।" রাজা চিন্তার হাত এড়াইবার জন্যই—"কার্য্যস্রোতে আপনারে ভাসাইয়া" দেন, কার্য্যবেগের স্পর্শে অবিশ্রাম গতিসুখ লাভ করিতে চাহেন। কুমারসেনকে তাঁহার চাইই চাই—"সে না হলে সুখ নাই নিদ্রা নাই মোর। শীঘ্র না পাইলে তাকে সমস্ত কাশ্মীর আমি খণ্ড দীর্ণ করি দেখিব কোথা সে আছে।" রাজা তাহার কামনার স্বরূপ বুঝিতে পারেন না, তাই বিস্মিত হইয়া ভাবেন—"এ কী দৃঢ়পাশে আমারে করেছে বন্দী শত্রু পলাতক।" তাঁহার "সচকিতে সদা মনে হয়, এই এল, এই এল, ওই দেখা যায়···।" কুমারসেনকে পাওয়ার জন্য রাজার এই উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা এবং ব্যাকুলতার সহিত চাপা বেদনার রেশ যেন মাখানো রহিয়াছে। কুমারসেনের সহিত নিশ্চয়ই "আর-কেহ"কেও পাওয়া যাইবে—এই অব্যক্ত কামনাই যেন ঐ ব্যাকুলতার সৃষ্টি করিয়াছে। দৃঢ়পাশে রাজাকে বন্দী করিয়াছে।

রাজার হিংস্র উত্তেজনা প্রথম চমকিত বাধা পায়—শাশুড়ী রেবতীর "গুপ্ত লোভ বক্র রোষ, দীপ্ত হিংসাতৃষা"-কলুষিত চরিত্র দর্পণে আপনার বিকৃত রূপের আভাস দেখিয়া। তাঁহার অন্তরাত্মা অপরাধে—হীনতাবোধে সঙ্কুচিত হইয়া হাহাকার করে—"হে বিক্রম শান্ত করো এ সংহার-খেলা, এ শ্মশান-নৃত্য তব থামাও থামাও, নিবাও এ চিতা।" বিক্রমদেব নিজের প্রকৃত সত্তাকে উপলব্ধি করেন—উপলব্ধি করেন "এ হিংসা আমার চোর নহে, ক্রূর নহে, নহে ছদ্মবেশী।" আপনার হিংস্রতাকে ব্যাখ্যা করেন—'প্রচণ্ড প্রেমের মতো প্রবল এ জ্বালা, অভ্রভেদী সর্ব্বগ্রাসী উদ্দাম উন্মাদ দুর্ণিবার।' এবং ঘোষণাও করেন—"একদিন দিব বুঝাইয়া, নহি আমি তোমাদের কেহ। নিরাশ করিব এই গুপ্ত লোভ বক্র রোষ দীপ্ত হিংসাতৃষা"। রাজার এই আত্মোপলব্ধি,

তাঁহার হিংসার গতিবেগকে যেন রুদ্ধ করিয়া দেয়। যে রাজা একদিন বলিয়াছেন—"যুদ্ধ চাই আমি। রক্তে রক্তে মিলনের স্রোত—অস্ত্রে অস্ত্রে সংগীতের ধ্বনি," সেই রাজা বলেন—"একা আমি যাব সেথা মৃগয়ার ছলে।"

তারপর, ত্রিচূড়ের প্রমোদবনের মধুর শান্তি তাঁহার মধ্যে শান্তি-অনুভব-বন্ধকে স্পন্দিত করিয়া তুলে—রাজা স্মরণ করেন—"শান্তি যে শীতল এত, এমন গম্ভীর, এমন নিস্তব্ধ তবু এমন প্রবল উদার সমুদ্রসম, বহুদিন ভুলে ছিনু যেন।" এই শীতল শান্তির স্পর্শেই হারানো শান্তির স্মৃতি এবং আক্ষেপ জাগে—"এমনি নিভৃত সুখ ছিল আমাদের, গেল কার অপধাধে। আমার কি তার যার-ই হোক—এ জনমে আর কি পাব না।" রাজার প্রেমতৃষ্ণার্ত্ত হৃদয় কেবল অনুতাপ বহন করিয়া দিন যাপন করিতে চাহে না—নব-প্রেমের স্পর্শ চাহে (এই চাওয়াটুকু রাজা বিক্রমদেব-চরিত্রটিকে খুবই খেলো করিয়া দিয়াছে); ইলাকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন—কিন্তু ইলার হৃদয়কেও তিনি জয় করিতে পারেন না। জানিতে পারেন—ইলার প্রেমাস্পদ কুমারসেন এবং পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে ইলার প্রেম ঐকান্তিক—'প্রবল প্রেম'। ইলার ঐকান্তিক প্রেমের মহিমা তাঁহার প্রেমিক-সত্তাকে আবার জাগাইয়া তুলে। "প্রেমস্বর্গচ্যুত" স্বর্গের ভ্রান্তি দিয়া আপনাকে সান্ত্বনা দিতে চায়। প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্তির উপায় হাত-ছাড়া বলিয়া পরোক্ষ পরিতৃপ্তির পথেই আত্মতৃপ্তিকে কুড়াইতে চাহে—নিরুপায় পরিতৃপ্তি-কামনা জাগে—'প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি তোমাদের দেখে ধন্য হই।" রাজা যুদ্ধের মধ্যে আর উত্তেজনা পান না—"যুদ্ধ নাহি ভাল লাগে।" কিন্তু যুদ্ধবিরতিজনিত যে শান্তি সে শান্তিও যে তাঁহার দ্বিগুণ অসহ্য গতি আজ আর সুখ দেয় না, অথচ স্থিতির মধ্যে ফিরিয়া

যাইতেও তাঁহার মন চাহে না, কারণ স্থিতি তাঁহার শূন্যতার হাহাকারে পরিপূর্ণ। যাঁহাকে লইয়া স্থিতির মাধুর্য্য সেই প্রেমময়ীর জন্য তাঁহার অন্তর করুণ আক্ষেপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—"

"আমি কোন্ সুখে ফিরি দেশ দেশান্তরে স্কন্ধে বহে জয়ধ্বজা— অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ।" অন্তরাত্মা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে—"কোথা আছে কোন স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে—প্রস্ফুটিত শুভ্র প্রেম শিশিরশীতল। ধুয়ে দাও, প্রেমময়ী, পুণ্য অশ্রুজলে এ মলিন হস্ত মোর রক্তকলুষিত।" তাঁহার অন্তর্জ্বালা, বহির্ম্মুখী হিংসা-শিখায় আর কাহারো দিকে ধাইয়া যাইতে চাহে না,—নিজের অন্তরকেই গোপন দহনে ঘিরিয়া রাখে। রাজা যেন দেহে-মনে পরিশ্রান্ত—অবসন্ন। এই করুণ অবসাদে—অতৃপ্তি এবং নৈরাশ্যের শূন্যতায়—রুদ্ধকণ্ঠ অভিব্যক্তির মত রাজার কারুণ্য মৌন-মুখর। এই নৈরাশ্যের অকূলতার মধ্যে শেষ আশ্রয়ের মত জাগিয়া আছে— ইলা ও কুমারসেনের মিলনের আকাঙ্ক্ষাটুকু। তাই দেবদত্তের প্রতি তাঁহার নির্দ্দেশ,—"বন্ধু ফিরে চলো দেশে।·········এক কাজ বাকি আছে······অরণ্যে কুমারসেন আছে লুকাইয়া······সখে তার কাছে যেতে হবে। বোলো তারে, আর আমি শত্রু নহি। অস্ত্র ফেলে দিয়ে বসে আছি প্রেমে বন্দী করিবারে তারে।" কিন্তু তাঁহাকে না পাওয়ার বেদনায়—হিংসাতপ্ত অভিশপ্ত প্রাণ লইয়া তিনি দেশ দেশান্তরে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, যাঁহাকে পাওয়ার একান্ত কামনা আজ অভিমানের অন্তরালে বসিয়া গুমরাইয়া কাঁদিতেছে, তাঁহার কথাকেও রাজা চাপিয়া রাখিতে পারেন না; নিরুদ্ধ আবেগে বলেন—"আর, সখা—আর-কেহ যদি থাকে সেথা— যদি দেখা পাও আর-কারো—।" দেবদত্তকে দেখিয়া রাজার নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকার কেমন যেন পাতলা হইয়া যায়। রাজার মধ্যে

আশার আলো জ্বলে—"আবার আসিবে ফিরে সেই পুরাতন দিন মোর, নিয়ে তার সব সুখভার।" এই গোপন আশা লইয়াই রাজা কাশ্মীরে গমন করেন—কুমারসেন-ইলার মিলনকে সুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য,—"আর কেহ"কে পাওয়ার আশাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। বিক্রমদেব তাই আশা-উদ্দীপনায় উৎসাহী—মন তাঁহার নূতন চরিতার্থতার আনন্দে অনেক পরিমাণে প্রসন্ন। রাজা সোৎসাহে দেবদত্তকে বলেন—"করিব রাজার মতো অভ্যর্থনা তারে।... .....পূর্ণিমা নিশীথে আজ কুমারের সনে ইলার বিবাহ হবে, করেছি তাহার আয়োজন"। রাজা এই পরোক্ষ পরিতৃপ্তির মধ্যেই কৃতার্থতার আস্বাদ পান। শিবিকার আগমন সংবাদে রাজা আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে নির্দ্দেশ দেন—'বাদ্য কোথা বাজাইতে বলো।' অভ্যর্থনা করিবার জন্য নিজেও অগ্রসর হইয়া যান। কিন্তু কৃতকর্ম্মের ফল বজ্রপাতের ভীষণতা এবং আকস্মিকতা লইয়া দেখা দেয়।

মোহময় প্রেম তাঁহার মধ্যে অনির্ব্বাণ অতৃপ্তির অন্তর্দ্দাহ হইয়া আছে, আর সেই মোহময় ভালোবাসা ব্যাহত হইয়া যে অন্ধ হিংসার রূপে বিশ্বকে আঘাত করিয়া আত্মতৃপ্তি খুঁজিয়াছে, তাহারই এক আঘাত 'চির-অপরাধের' আত্ম-গ্লানি রূপে রাজাকে গ্রাস করিতে ফিরিয়া আসিয়াছে। অন্ধ হিংসার আঘাত কুমারসেনকে 'আত্মহত্যা' করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে। সুমিত্রা কুমারের কত্তিত শির স্বর্ণথালে লইয়া প্রবেশ করিয়া — রাজার উৎসব-আয়োজনের দীপগুলিই নিবাইয়া দেয় না — অপ্রত্যাশিত আঘাতে রাজাকে বিস্ময়ে ও বিষাদে নির্ব্বাক করিয়া দেয়। যে গোপন-আশার উৎসাহে উজ্জীবিত হইয়া রাজা কাশ্মীরে আসেন সেই আশার আলোও এক ফুৎকারে নিবিয়া যায়। সুমিত্রাও রাজাকে ক্ষণপ্রভার মত আশার আলোয় আলোকিত করিয়া অন্ধকারকে গাঢ়তর করিয়া দিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

অনুতাপ এবং চির-অপরাধের গ্লানিতে রাজার হৃদয় আচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া যায়। এমনি করিয়া নিবিবার জন্যই বোধ হয় তাঁহার আশার-আলো ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠে। (বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে—এই বিক্রমদেব এবং তপতীর বিক্রমদেব ভাবে ও পরিকল্পনায় এক নহে)।

নাটকের এই পরিকল্পনা ভাবসত্যের দিক দিয়া আপত্তিকর হইতে পারে না, বরং ইহাই সত্য যে পরিকল্পনাটির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক গতিবিধির বিশেষ একটি জটিল রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। তবু এ কথা স্মরণে রাখা আবশ্যক যে উপ-আখ্যানটি অনাবশ্যক না হইলেও, যে-ভাবে উপন্যস্ত হইয়াছে তাহাতে অনাবশ্যক ভাবে জায়গা জুড়িয়াছে — অর্থাৎ ইলা-কুমারসেনের দৃশ্যগুলি 'প্রত্যক্ষ-নেতৃচরিত্র' না করায় নিরপেক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হয় — নাটকীয় প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া ইহা নিরপেক্ষ স্বকীয়তা বিস্তার করিয়াছে, এই বিস্তারটুকুই অবান্তর বলা যাইতে পারে। মোটকথা, ইলা-কুমারসেনের প্রেমকে অত প্রত্যক্ষবৎ না করিয়া পরোক্ষ বিবৃতির সাহায্যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাই উচিত ছিল। তাহা হইলে — সমগ্র উপ-আখ্যানটিই পরিত্যজ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত না। এই কারণেই — তৃতীয় অঙ্ক হইতে ঘটনা-বিন্যাসে বেশ খানিকটা শিথিলতা বা বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়াছে। প্রধান ঘটনার অভিমুখী করিয়া ঘটনা স্থাপন করিতে পারেন নাই বলিয়াই উপখ্যানটি এক-কেন্দ্রিক হইয়া দাঁড়ায় নাই — মূল কাহিনীটি শেষদিকে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই দ্বিধা-বিভক্তি একেবারে অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত যেমন নহে, তেমনি ইহা নাটকীয় উপযোগিতায়ও কম শক্তিমান নহে। শাখা নদীটি মূলস্রোতে আসিয়া মিশিবার স্থানে যেমন একটা আলোড়ন ও

ব্যাপকতা সৃষ্টি করে, উপ-আখ্যানটিও সেইরূপ নাটকের উপসংহারকে ভাব-তীব্র করিয়া তুলিয়াছে।

চরিত্র-পরিকল্পনা

(ক) রাজা বিক্রমদেবের চরিত্রের রূপ-রেখা যাহাই হউক, চরিত্রটির মধ্যে দুই একটি অসঙ্গতি বা ত্রুটি না পাওয়া যায় এমন নহে। প্রথমেই যে পুরোহিত-বিরাগ এবং নিন্দা দিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহার উপযোগিতা একটুও দেখানো হয় নাই। তারপর প্রথমেই রাজার মুখে — "বশ করিবার নহে নৃপতি, রমণী" — চরিত্রটির আসল প্রবৃত্তির বিরোধী, এবং বাক্যটি চরিত্রের কোন ধর্ম্মকেই ব্যক্ত করিতে পারে নাই। এমন কথাও বলা চলে না যে, ঐ কথাটির দ্বারা চরিত্রের মূল ভাবটিকেই গোপন করিবার চেষ্টা ব্যক্ত হইয়াছে। কারণ ঐরূপ পরিকল্পনা ব্যক্তই হয় নাই। তৃতীয়তঃ রাণীর প্রতি ঐকান্তিক আসক্তির সত্তাটি আসংজ্ঞান স্তরে যাইয়া দাঁড়াইলেও তাহার ক্রিয়া আভাসিত না রাখিয়া অন্ততঃ দুই একটি স্খলিত শব্দে আভাষিত করা উচিত ছিল — অবশ্য দ্বন্দ্বের রূপেই। চতুর্থতঃ ত্রিচূড়ের উপবনে নব প্রেমের আকাঙ্ক্ষা দেখা দেওয়ায়, 'রাণী-কামনা'-বন্ধের জোর বেশ খানিকটা হাল্‌কা হইয়া পড়িয়াছে। এই স্থলটি রাজার চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক দুর্বলতা এবং অসঙ্গতি।

(খ) রাণী সুমিত্রা চারিটি ব্যক্তিত্বের সমবায়ে গঠিত। সুমিত্রা প্রেয়সী, সুমিত্রা মহিষী, সুমিত্রা কাশ্মীর-কন্যা, সুমিত্রা ভগিনী। চরিত্রে এই ব্যক্তিত্ব-সমূহের সন্তোষজনক সমবায় ঘটিতে পারে নাই। সুমিত্রা প্রথম দিকে অতি-সামান্য প্রেয়সী এবং অসামান্য মহিষী এবং শেষ দিকে ভগিনী এবং কাশ্মীর-কন্যা।

প্রত্যাখ্যাত হইবার পরে—"সঁপিলাম এ জীবন মোর তোমার লাগিয়া" বলিয়া ভ্রাতার কাছে আত্মসমর্পন করিলেও, এ কথা সকলেই বলিবে যে, রাণীর প্রেয়সী-চেতনা বা 'প্রজার-জননী'-চেতনা নিষ্ক্রিয় ও নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। "রাজারে মার্জ্জনা করো"—এই অনুরোধটুকু ছাড়া প্রেয়সীর কোন পরিচয়ই আর পাওয়া যায় না। মহিষী তো একেবারেই নীরব। হিংসোন্মত্ত রাজাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রেয়সী-সুমিত্রা কোন সন্তোষজনক চেষ্টা করেন নাই, তেমনি প্রজাদের জন্যও মহিষী-সুমিত্রার হৃদয় ভুলিয়াও কাঁদে নাই, একবার মাত্র সামান্যা নারী সুমিত্রাকে আক্ষেপ করিতে শোনা যায়—

> "আমি দুর্ভাগিনী নারী কেন আসিলাম
> অন্তঃপুর ছাড়ি।....................."

কিন্তু এখানে সুমিত্রা বুদ্ধিহীনা—ব্যক্তিত্ববিহীনা এবং ভ্রাতার "পদপ্রান্তে মৌন ছায়া"। ভগিনী-চেতনাই এখানে প্রবল। কিন্তু ভগিনী এবং কাশ্মীর-কন্যার চেতনার পরিধির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার মত কারণ নাটকে খুব স্পষ্ট হইয়া ফুটে নাই।

তারপর চরিত্রটিতে স্ব-বিরোধী ভাবও দেখা যায়—তিনি নিজে রাজকার্য্যে হাত দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, বরং মহিষীর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য অনেক কিছুই করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন রেবতী (খুড়ী) রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ধিক পাপ! চুপ করো মাতা! নারী হয়ে রাজকার্য্যে দিয়ো না দিয়ো না হাত.........হেথা হতে চলো ফিরে দয়ামায়াহীন ওই সদা-ঘূর্ণমান কর্ম্মচক্র ছাড়ি।........যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, রাজ্যরক্ষা আমাদের কার্য্য নহে।"

এই হিসাবে সুমিত্রা খুব সুগঠিত নহে—সব কয়েকটি ব্যক্তিত্বের

পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে চরিত্রটি একক শক্তিক্ষেত্র হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই চরিত্রটি 'কিন্তু'র অধীন হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং চরিত্রটিকে খুব পরিস্ফুট বলা চলে না। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় অবশ্য লিখিয়াছেন—"সমগ্র নাটকটিতে প্রায় সবগুলি চরিত্রই সুপরিস্ফুট, বিশেষ করিয়া বিক্রম ও সুমিত্রার·····।" ডাঃ রায়ের সহিত সম্পূর্ণ একমত হওয়া যায় না এবং এই কারণেই যায় না যে রাণী সুমিত্রা দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তাঁহার অতীত সত্তাকে একেবারেই যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। শৈশব-স্মৃতির সম্মোহনের আওতায় আবদ্ধ হওয়ায় সুমিত্রা প্রেয়সী ও মহিষী-সত্তা সম্বন্ধে একেবারেই অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন। এই চেতনাহীনতা চরিত্রের পরিস্ফুটতার পরিপন্থী।

(গ) দেবদত্ত 'রাজা ও রাণী' নাটকের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। দেবদত্ত "রাজার বাল্যসখা ব্রাহ্মণ"। তাই বয়স্যের স্বাধীনতা তাঁহার আচরণে সর্ব্বদাই পরিস্ফুট। ইহা ছাড়াও তাঁহার বড় বৈশিষ্ট্য—চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য—শ্লেষ-বক্রোক্তি-পটুতা। যাগ-যজ্ঞ-বিধি শ্রুতি-স্মৃতি বিস্মৃতির জলে ঢালিয়া দিলেও ভাষা ও ভাবের উপর শাসনটি খুবই আছে। এই 'শ্লেষ-বক্রোক্তির রচনা-রসে ভরপুর থাকে বলিয়া দেবদত্তের বচন অপ্রিয় সত্যকেও প্রীতিকর করিয়া তুলে। এই মুখের বা মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য আছে; এই বৈশিষ্ট্য—বুকের বা হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য। রাজাকে সে হৃদয় দিয়া ভালবাসে এবং সত্যই সে সম্পদে-বিপদে বন্ধু এবং অকৃত্রিম বন্ধু। দেবদত্ত রাজাকে হৃদয় খুলিয়াই আপনাকে দেখাইয়াছে—

> "সখা, এ হৃদয় মোর জানিও তোমার।
> কেবল প্রণয় নয়, অপ্রণয় তা
> সে ও আমি সব অকাতরে, রোষানল
> লব বক্ষ পাতি··············"

তাহার এই প্রকৃতি হইতেই স্ত্রী নারায়ণীর কাছে এই উক্তি বাহির হইয়াছে—"রাজাকে সাহস করে দুটো ভালো কথা বলে এমন বন্ধু কেউ নেই। আমি তো আর থাকতে পাচ্ছিনে—আমি চল্লুম।" দেবদত্ত উচিত বক্তা কিন্তু হৃদয়বান রসিক। সে শুধু রাজাকেই উচিত কথা বলে না, 'রাস্তা থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে যত রাজ্যের ভিক্ষুক'ও জুটাইয়া আনে।

(ঘ) চন্দ্রসেন কাশ্মীর-রাজ—যুবরাজ কুমারসেনের এবং সুমিত্রার খুল্লতাত। চন্দ্রসেন এককথায় ধার্ম্মিক-সুজন এবং —কর্ত্তব্যপরায়ণ। স্বার্থবুদ্ধি তাঁহার ধর্ম্ম-বোধকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই এবং তাঁহার হৃদয়কেও পৈশাচিক প্রবৃত্তি অধিকার করিতে সক্ষম হয় নাই। খুল্লতাতের স্নেহ হইতে তিনি কুমার-সেনকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাই তাঁহার স্নেহময় আদেশ—"দর্পমদে ইচ্ছা করে বিপদে দিয়ো না ঝাঁপ। আশীর্ব্বাদ করি, ফিরে এসো জয়গর্ব্বে অক্ষত শরীরে পিতৃসিংহাসন পরে।" স্ত্রী রেবতীর মত পাপীয়সী এবং পিশাচী নারীর অবিরাম প্ররোচনাও এই চন্দ্রসেনের স্বভাব-সৌজন্যকে বিকৃত করিতে পারে নাই —ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা। রাজার প্রতিটি কার্য্যকে এবং আচরণকে রাণী রেবতী ষড়যন্ত্রের দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিলে, চন্দ্রসেন নিজেকে প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই—রাণীকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন—

> "ছি ছি রাণী, এ সকল কথা শুনি যবে
> তব মুখে, ঘৃণা হয় আপনার পরে!
> মনে হয়, সত্য বুঝি এমনি পাষণ্ড
> আমি। আপনারে ছদ্মবেশী চোর বলে
> সন্দেহ জনমে। কর্ত্তব্যের পথ হতে
> ফিরায়ো না মোরে"

কিন্তু দুর্ব্বলতার স্পর্শ কি তাহাতে একটুও নাই? রেবতী যখন বলিলেন—"তুমি তারে বোলো, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়ি···করিতে হইবে তারে আত্মসমর্পণ" চন্দ্রসেন রাণীকে অনুরোধ স্বরে—"যেয়ো না চলিয়া" বলিলেন কেন? এই কথাটি নিষ্ঠুর কথা বলিয়াই কি রাণীর মুখ দিয়া তিনি বলাইতে চাহেন? অথবা—উহা একটা কথার-কথা মাত্র? যাহাই হউক, চন্দ্রসেন কুমারকে মনে বা বাক্যে কোন আঘাতই দিতে চাহেন নাই। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য —আক্রমণকারী "জামাতা": আর নিজে শুধু কুমারের খুল্লতাতই নহেন, তিনি রাজা: এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া খুব সহজ কাজ নহে। তাঁহার প্রশ্ন—"বিক্রম কি নহে বৎস কাশ্মীর-জামাতা। সে যদি আসিল গৃহে এত কাল পরে, অসি দিয়ে তারে কি করিব সম্ভাষণ।' অন্যদিকে—"রাজকার্য্য মনে রেখো সুকঠিন অতি। সহস্রের শুভাশুভ কেমনে করিব স্থির মুহূর্ত্তের মাঝে।" এই বিচার-বুদ্ধির জন্য কুমারসেন তাঁহাকে ভুল বুঝিল—বিদায়ও গ্রহণ করিল। কিন্তু চন্দ্রসেনের কথা এখানে যেন কেমন একটু শুষ্ক আন্তরিকতার মত শোনায়! তাঁহার স্নেহ খুব নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি পায় নাই। আরো 'কিন্তু'র বিষয় এই যে—চন্দ্রসেন বিক্রমদেবের নিকট কুমারের যে শাস্তি প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা খুব নির্দ্দোষ হৃদয়ের কথা হইয়া উঠে নাই এবং তাহাতে তাঁহার নিজেরও দুর্ব্বলতা প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রসেনের অনুরোধ—

> "ক্ষমা তারে করো, বৎস—
> বালক সে অল্পবুদ্ধি। ইচ্ছা কর যদি
> রাজ্য হতে করিয়া বঞ্চিত, কেড়ে নিও
> সিংহাসন-অধিকার। নির্ব্বাসন সেও
> ভালো, প্রাণে বধিয়ো না।"

এই উক্তিটিকে স্নেহ এবং অ-স্নেহ দুই দিকেই বাঁকানো যাইতে পারে। তারপর রাণী রেবতীর কথা বুঝাইয়া বলিতে যাইয়াও চন্দ্রসেন সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। কুমারসেনকে রাজ-বিদ্রোহী প্রমাণ করিবার চেষ্টা চরিত্রের সঙ্গতি নষ্ট করিয়াছে বইকি। চন্দ্রসেন শেষ দৃশ্যে যে 'নীরবতা' দেখাইয়াছেন তাহা খুবই জটিল। তবে কি রাণীর কথাই সত্য — "আপনার কাছ হতে, রেখো না গোপন করে উদ্দেশ্য আপন"। তবে কি কুমারসেনের আগমনকে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না? যিনি কিছুকাল আগে শুধু "প্রাণে বধিয়ো না" — অনুরোধ জানাইয়াছেন, কুমারের আত্মসমর্পণে আঘাত লাগা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। এস্থলে চন্দ্রসেনের ব্যক্ত রূপ এই — "বিদ্রোহী সে মোর কাছে"··· "সিংহাসন হতে তারে করিব বঞ্চিত।" কিন্তু কুমারসেনের প্রতি— যুবরাজের প্রতি তাঁহার প্রচ্ছন্ন অভিমান? কুমারসেন ভিক্ষা-স্বরূপ পিতৃসিংহাসন লাভ করিবে — এ চিন্তা অসহ্য বলিয়াই কি চন্দ্রসেন কুমারকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন? চন্দ্রসেনের ক্ষোভ —"নহে ইহা কুমারসেনের মতো কাজ। দৃপ্ত যুবা সিংহসম। সে কি আজ স্বেচ্ছায় আসিবে শৃঙ্খল পরিতে গলে? জীবনের মায়া এতই কি বলবান।" কুমারসেনকে ভালবাসেন বলিয়াই তাঁহার এই ক্ষোভ, এই অভিমান।—চরিত্রটি ক্রমেই ব্যক্ত হইয়া উঠে — কুমারসেনের প্রতি সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল, রাজাকে তিনি অনুরোধ করিলেন — "মহারাজ, শোনো নিবেদন গীতবাদ্য বন্ধ করে দাও। এ উৎসব উপহাস মনে হবে তার।"

শেষ পর্য্যন্ত—

সমস্ত সন্দিগ্ধ চক্ষুকে নিরসন করিলেন চন্দ্রসেন, যখন সিংহাসনে পদাঘাত করিয়া মাথা হইতে মুকুট ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং

রাণী রেবতীকে তীব্রতম ভৎর্সনা করিলেন—"রাক্ষসী পিশাচী—দূর হ' দূর হ'—আমারে দিসনে দেখা পাপীয়সী।" চন্দ্রসেন যথার্থই 'ধার্ম্মিক সুজন।'

(ঙ) রেবতী চন্দ্রসেনের বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়াই নামতঃ ধর্ম্মপত্নী বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ—"রাক্ষসী পিশাচী—পাপীয়সী। চন্দ্রসেনের ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মের উপাসিকা। বিক্রমদেবের মনোদর্পণে রেবতীর যে রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—তাঁহার ললাটে "শাণিত ক্রুর বক্র জ্বালারেখা", তাঁহার অধরের দুই প্রান্ত রুদ্ধ হিংসাভারে নুইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার উষ্ণ তিক্ত বাণী তীক্ষ্ণ ও "খুনীর ছুরির মতো বাঁকা বিষমাখা'। রেবতী স্বার্থপরতায় অন্ধ এবং নিষ্ঠুর।—লেডী ম্যাক্‌বেথের স্নায়ু দিয়াই যেন সে গঠিত। কিন্তু এই অন্ধতা এবং নিষ্ঠুরতাই চরিত্রটির আপাদমস্তক পরিচয় নহে। এই অপ্রশংসনীয়—এমন কি ঘৃণ্য আচরণের অন্তরালে যে প্রেরণা কাজ করিয়াছে, তাহাকে· কিন্তু নিরপেক্ষভাবে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। রেবতীর মধ্যে অত্যুগ্র আত্ম-প্রতিষ্ঠা-কামনা—স্বাধীনতা-কামনা এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ-চিন্তা সত্যই একান্ত। পুত্রের ভবিষ্যৎ-চিন্তাই রেবতীকে রাক্ষসী—পিপাচী এবং পাপীয়সী করিয়া তুলিয়াছে। রেবতীর সুস্পষ্ট আত্ম-প্রকাশ—

"আমি ও পালিব তবে
কর্ত্তব্য আপন।.........
রাজা যদি না করিবে তারে, কেন তবে
রোপিলে সংসারে পরাধীন ভিক্ষুকের
বংশ। অরণ্যে গমন ভালো, মৃত্যু ভালো—
রিক্ত-হস্তে পরের সম্পদ-ছায়ে ফেরা

ধিক্ বিড়ম্বনা !

আমি তারে

দিয়েছি জনম, আমি তারে সিংহাসন

দিব—নহে আমি নিজ হস্তে মৃত্যু দিব

তারে। নতুবা সে কুমাতা বলিয়া মোরে

দিবে অভিশাপ।”

এই কারণেই পুত্রের জন্য সিংহাসনখানি নিষ্কণ্টক করিতে রেবতী বদ্ধপরিকর। তাই হৃদয়ে তাহার হিংসাতৃষ্ণা। এই অতি-তৃষ্ণা মরীচিকা সৃষ্টি না করিয়াও পারে নাই। স্বামীর প্রতিটি কার্য্যকে—প্রতিটি আচরণকে সে কুমার-বিরোধী ষড়যন্ত্র বলিয়া মনে করিয়াছে। হিংসা-দীপ্ত অন্তরের প্রতিফলনই সে সর্ব্বত্র দেখিতে পাইয়াছে। আর একটি বৈশিষ্ট্যও চরিত্রে লক্ষণীয় এবং প্রশংসনীয়ও বটে—রেবতী স্বার্থান্ধ, কিন্তু অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস-এর মতো অসাধারণ এবং দুর্লভ গুণও তাঁহার আছে। রেবতী নিজের মুখেই স্বীকার করিয়াছেন এবং উহা তাঁহার অকৃত্রিম স্বীকৃতি—“পারিনে লুকাতে আমি হৃদয়ের ভার। স্নেহের ছলনা করা অসাধ্য আমার।” বস্তুতঃ চরিত্রটি কখনও চরিত্রহীন হয় নাই।

(চ) শংকর চরিত্রটি অপূর্ব্ব ভাব-সমৃদ্ধ একটি চরিত্র। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় ঠিকই বলিয়াছেন—“এই বৃদ্ধ ভৃত্যটির স্নেহপ্রাণ তেজোদীপ্ত চরিত্রটি বহুবার আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় না, কিন্তু তাঁহার এই একটুখানি পরিচয়ই আমাদের চিত্তের সমস্ত সম্ভ্রমকে আকর্ষণ করে.........।” শংকর স্নেহপ্রবণ বৃদ্ধ ভৃত্য বটে, কিন্তু তাঁহার এই স্নেহ স্নেহাস্পদের দেহটিকে বা প্রাণটিকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার আত্মিক-সত্তা বা মহিমা-সত্তা পর্য্যন্ত প্রসারিত। স্নেহাস্পদের মহিমা-দীপ্ত সত্তাটিকেই শংকর হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়া

সেবা করিতে চাহে। তাঁহার স্নেহ দুর্ব্বলের অন্নপ্রাণ স্নেহ নহে, স্নেহাস্পদকে বড়ো করিয়া রাখিতে সে স্নেহাস্পদকেই হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিতে পারে। শংকর কুমারসেনকে ভালবাসে — কাশ্মীরের রাজ-বংশধর রূপেই ভালবাসে। বীর কুমারসেনকেই সে ভালোবাসে — কীর্ত্তিমান কুমারসেনকেই সে সেবা করিতে চাহে। "আমি কি সহিতে পারি তব অপমান" — এই ভাবটিই শংকরের স্থায়ীভাব। তাই কুমারসেন যখন ক্ষমাকে 'বীরত্ব অধিক' বলিয়া কাশ্মীরে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন, শংকর অস্থির বেদনায় কহিল — "হায়, এ কী অপমান, পলাতক ভীরু বলে রটিবে অখ্যাতি।" কিন্তু শংকর একেবারে হৃদয়হীন আত্মাভিমানী নহে। হৃদয়ের কাছে আবেদন করিলে — বিশেষতঃ শংকর বা সুমিত্রা — যাহাদের সে ("কোলে বেঁধে রেখেছিলি এক স্নেহপাশে") স্নেহপাশে কোলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল — কোন আবেদন জানাইলে সে তাঁহার সঙ্কল্প স্থির রাখিতে পারে না। তাই সুমিত্রা ছেলেবেলার কথা স্মরণ করাইয়া যখন সেই পুণ্য স্নেহতীর্থে ফিরিয়া যাইতে চাহিল, শংকর আত্মা-ভিমানের হিসাব ভুলিয়া গেল, শংকর বলিল —

"চলো দিদি, চলো ভাই, ফিরে চলে যাই
সেই শান্তিসুধাস্নিগ্ধ বাল্যকালমাঝে।"

কিন্তু শেষ দৃশ্যে শংকর প্রকৃত স্নেহের অগ্নিপরীক্ষা দিয়াছে। তাঁহার স্নেহের স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। কুমারসেন আত্মসমর্পন করিবে—কাশ্মীরের রাজ-মহিমাকে ধূলায় লুটাইয়া দিবে — আত্মাবমাননার শেষ ধাপে যাইয়া দাঁড়াইবে — শংকর কি তাহা সহ্য করিতে পারে ? শংকরের বুকে এক অনির্ব্বচনীয় অন্তর্দ্দাহ জাগিল — তাঁহার হৃদয় যেন ছিঁড়িয়া যাইতে চাহিল এবং হৃদয় চিরিয়া আর্ত্তনাদ বাহির হইল — "চিরভৃত্য তব, আজি দুর্দ্দিনের আগে মরিল না কেন।"

বিক্রমদেবের আন্তরিক উক্তিকে ব্যঙ্গোক্তি মনে করিয়া দৃপ্ত তেজে শংকর উত্তর করিল — "রাজন্, তোমার কাছে আসিনি কাঁদিতে।" সত্যই স্বর্গীয় রাজেন্দ্রগণ ছাড়া তাঁহার হৃদয়বেদনা কে বুঝিবে? বিক্রমদেবের মার্জ্জনা-লব্ধ মুক্ত জীবন অপেক্ষা দণ্ড-পীড়িত দুঃসহ জীবনই যে তাঁহার কাম্য — তাই কুমারসেনের ছিন্ন শির লইয়া যখন শিবিকা প্রবেশ করিল শংকর লজ্জায় ক্ষোভে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু শংকর যখন দেখিলেন কুমারসেন প্রাণভয়ে মান বিলাইয়া দেন নাই, মরিয়াই খাঁটি রাজার মত সিংহাসনে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন করুণতম আনন্দে তাহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল। অগ্রসর হইয়া মহাপ্রাণ স্নেহরাশি উৎসারিত করিয়া দিল —

"প্রভু, স্বামী,
বৎস, প্রাণাধিক, বৃদ্ধের জীবনধন,
এই ভালো, এই ভালো।.........
.......................এতদিন
এ বৃদ্ধেরে রেখেছিল বিধি, আজি তব
এ মহিমা দেখাবার তরে।"

কুমারসেনের প্রেমেই শংকর কুমারসেনকে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া দিল — ছিন্ন শিরকেই শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিল।

এইবার চরিত্র-পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে "রাজা ও রাণী" নাটকের চরিত্র-সৃষ্টিতে 'প্রকাশ' অপেক্ষা 'বিকাশ'ই লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে এবং চরিত্রগুলি ভাব-স্ফীত হইলেও, স্থিতিশীল নহে—গতিশীল — অর্থাৎ একই ভাব-বন্ধের আকর্ষণে আবর্ত্তিত হয় নাই। তবে, অনেকস্থলে নাট্যকার আপন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে পারেন নাই, এবং পারেন নাই বলিয়াই চরিত্রগুলি

অনেকস্থলে জৈবিক-প্রায় একক (organic whole) হইয়া উঠিতে পারে নাই এবং কয়েকস্থলে উহাতে অসঙ্গতিও দেখা দিয়াছে।

নাটকখানির ঘটনা-বিন্যাস এবং চরিত্র পরিকল্পন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পরে এইবার নাটকখানির ভাব ও ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

নাটকের ভাব ও ভাষা

(ক) নাট্যকার নাটকখানির মুখ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে নিজেই লিখিয়াছেন— "বিক্রম…প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে।……এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে স্বত উদ্যত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
শুধু সুখ চলে যায়
এমনি মায়ার ছলনা।"

তারপর, 'তপতী' নাটকের ভূমিকাতেও লিখিয়াছেন—

"বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটেই রাজা ও রাণীর মূল কথা।"

(খ) দ্বিতীয়ত, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় "রাজা ও রাণীর অন্তরের রহস্যটি" এইরূপ ধারণা করিয়াছেন —

"বিক্রমদেবের চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া একটি সত্য একটি 'আইডিয়া' এই নাটকটির মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।……যত-

দিন বিক্রম সুমিত্রার প্রতি প্রেমে আত্মকর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া মোহাচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন, ততদিন তিনি সত্য প্রেমের আভাস লাভ করিতে পারেন নাই; তারপর, একদিন সুমিত্রাকে নিজেই যখন পথে বাহির হইয়া যাইতে হইল, তখনই তাহার স্বপ্ন টুটিল, আপনাকে জানা সম্ভব হইল, এবং নিজের কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে-তিনি জাগ্রত হইলেন। কিন্তু এ জাগরণও সত্য জাগরণ নয়·········যেন এক মোহের আচ্ছন্নতার ভিতর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আর এক আচ্ছন্নতার ভিতর নিজকে ডুবাইয়া দেওয়া! জীবনের রহস্য প্রেমের রহস্য এত সহজে তাঁহার কাছে ধরা দিল না, তাহার জন্য অনেকখানি মূল্য দিতে যে এখনও বাকী···জীবনের যে-সন্ধান লাভের জন্য এই উন্মত্ত অভিযান সে-সন্ধান কোথায়? ······ইলার···সর্ব্বত্যাগী মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের পরিচয়ের সম্মুখে বিক্রমের আচ্ছন্নতা যেন সূর্য্যোদয়ে কুয়াসার মত কোথায় উবিয়া গেল, তাঁহার সমস্ত চৈতন্য এক মুহূর্ত্তে যেন ফিরিয়া আসিল।······কিন্তু তাহার পরও প্রেমের রহস্য, জীবনের রহস্য যে এখনও অনেক দূরে—এখনও যে তাহার জন্য অনেকখানি মূল্য দেওয়া বাকী।······আক্ষেপ অনুতাপের আগুনে নিজকে পোড়ানো হইল কোথায়?······দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন তাহার বাকী ছিল: সুমিত্রাকে আত্মদান করিয়া তাহা প্রমাণ করিতে হইল······”

আমার মনে হয়—নাটকের রূপ হইতে উল্লিখিত মর্ম্মার্থ সন্তোষ-জনকভাবে পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহা এই যে, মোহগ্রস্ত প্রেম আপন গতিবেগেই আপনার মধ্যে বিকার সৃষ্টি করে—বিশ্বের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না বলিয়া বিশ্ব হইতে নিজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, এবং সে শুদ্ধ যে প্রেমাস্পদকেই আত্মসাৎ করিয়া বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তৃপ্তি পাইতে চাহে

তাহা নহে, তাহার ভোগে ব্যাঘাত ঘটিলেই সে ক্রোধেও অন্ধ হইয়া পড়ে, এবং বিশ্বকে আঘাত করিতে যাইয়া শেষ পর্য্যন্ত নিজকেই আঘাত করিয়া বসে। মোহ-স্বভাব ব্যক্তি নিজের ভার-সাম্য রক্ষা করিতে পারে না এবং পারে না বলিয়াই অতৃপ্তির এবং অনুশোচনার অন্তর্দ্দাহ তাহার অবশ্যম্ভাবী সহচর এবং পরিণাম হয়। মোহ অতি-ইচ্ছার অতি-বেগে অন্ধ, তাই "দেখিতে না পায় পথ, আপনারে করে সে নিষ্ফল।" আর এই প্রেমেরই বিপরীত আত্মোৎসর্গ-মহিমান্বিত উদার-শান্ত মোহ-মুক্ত প্রেম, যে প্রেম প্রেমাস্পদকে পূর্ণমহিমার উজ্জ্বল মূর্ত্তিতেই দেখিতে ভালবাসে এবং প্রেমের মহিমা রক্ষা করিতে যে প্রেমাস্পদকেও ছাড়িয়া যাইতে বা দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া বলা যায় যে—চরিত্রের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্ব-গুলির কোন একটির অতি-বৃদ্ধি, সমগ্র ব্যক্তিটির ভার-সাম্য নষ্ট করিয়া ফেলে এবং ব্যক্তিটি কখনও পরিবেষ্টনীর সহিত সুষমভাবে অভিযোজন করিতে পারে না এবং পারে না বলিয়াই নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই সৃষ্টি করিতে থাকে।

এই গেল নাটকের মুখ্য ভাবের আলোচনা — প্রেমতত্ত্বের আলোচনা। ইহার পাশেই, নাটকখানিতে আরো একটি ভাব-ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়।

টমসন্ সাহেব যে বলিয়াছেন—"It will be at once grasped that the play has a double meaning, it has a political reference, which helps to explain its very considerable measure of popularity on the stage"—তাহা এই পর্য্যন্তই সত্য যে নাটকখানির মধ্যে রাজনৈতিক অবস্থার ইঙ্গিত এবং প্রতিকারের ইঙ্গিতও বেশ পাওয়া যায়—বৈদেশিক শাসনের স্বরূপের

এবং স্বাভাবিক ফলের প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে। মন্ত্রী, দেবদত্ত এবং প্রজাদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের পরোক্ষ বিশ্লেষণ প্রতিফলিত হইয়াছে। মন্ত্রী যখন বলেন— 'বিদেশীর অত্যাচারে জর্জ্জর কাতর কাঁদে প্রজা। অরাজক রাজসভামাঝে মিলায় ক্রন্দন। বিদেশী অমাত্য যত বসে বসে হাসে…', তখন ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপটাই আভাসিত হইয়া উঠে; আবার, দেবদত্ত যখন—'জীর্ণচীর ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহল'কে উপেক্ষা করিতে বলেন, সেখানেও দীন ভারতীয় জনসাধারণের মূর্ত্তি চোখের উপর আসিয়া দাঁড়ায় এবং রাজা, অমাত্য প্রভৃতির সমালোচনা করিতে যখন বলেন—"এসেছে বিদেশ হতে রিক্তহস্তে সে কি শুধু দীন প্রজাদের আশীর্ব্বাদ করিবারে দুই হাত তুলে"—তখন ব্রিটিশ শাসকদের মনোভাবের উপরই তীব্রালোক ফেলিয়া উহাকে আলোকিত করা হয়। মোটকথা, ইহাদের উক্তির মধ্যে শোষণ এবং শাসনের স্বরূপকে খুবই সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করা হইয়াছে। আর প্রজাদের মধ্যে—কুঞ্জরলাল স্পষ্টভাষায় বলে—"ভিক্ষে করে কিছু হবে না—আমরা লুট করব"। সকলেই—"আগুন" প্রস্তাব গ্রহণ করে, 'রাজা যদি শাস্তর না শোনেন', তখনকার উপায়ও কুঞ্জর স্থির করে—"শাস্তর ছেড়ে অস্তর ধরব।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজানুগৃহীতদের স্বরূপও প্রকাশ করে— "রাজবাড়ির সিধে খেয়ে খেয়ে ফুলছ।" ধনবণ্টন বৈষম্যের বিরুদ্ধেও কাশ্মীরের হাটে বেশ উত্তেজনা দেখা যায়। মহাজনদের নির্দ্দয় সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ পায়— "তুমি রাখতে গম জমিয়ে আর আমি মরতুম পেটের জ্বালায় সেইটে হবে না"—এই ভাব…এই ভাবগুলি তদানীন্তন রাজনৈতিক চেতনার প্রণেতার অনুকূল এবং সেই কারণেই চিত্তাকর্ষক। রাজা ও রাণীর মঞ্চ-সাফল্যের নানা

কারণের মধ্যে এই ভাবগুলিও অন্যতম এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই রাজনৈতিক ভাবগুলি থাকাতেই টমসন্ সাহেব—'political reference' দেখিতে পাইয়াছেন।

তারপর—রচনার কথা।

রবীন্দ্রনাথ যে রচনা-রসের রাজা এ নাটকেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দেবদত্তের বক্র-উক্তিগুলি, শ্লেষের খোঁচা-গুলি যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি রসালো। তারপর বিক্রমদেব, সুমিত্রা, কুমারসেন প্রভৃতি গম্ভীর চরিত্রগুলি মাঝে মাঝে যে আলঙ্কারিক কল্পনায় উচ্ছ্বসিত আবেগ প্রকাশ করিয়াছে, তাহার শিল্প-চমৎকারিত্ব লক্ষণীয়; ভাব ও ভাষার কারুকার্য্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা রস-রুচির; এ ক্ষেত্রেও তাহার কোন দৈন্য দেখা দেয় নাই।

উপসংহারে সংক্ষেপে বলা চলে—'রাজা ও রাণী' একখানি রসোত্তীর্ণ নাটক, ঘটনা-বিন্যাসে রোমাঞ্চকরতা থাকিলেও, আকস্মিক পতন ও মৃত্যু প্রভৃতি স্থূল ও রোমাঞ্চকর ঘটনা থাকিলেও, আবেদনের গভীরতা এবং সার্ব্বজনীনতা-ধর্ম্মের গুণে নাটকখানি মেলোড্রামার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তারপর উপ-আখ্যানটী অবান্তর না হইলেও যে পরিমাণ স্থান জুড়িয়াছে এবং যে পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে নাটকের বিষয়-ঐক্য বেশ একটু আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। চরিত্র-সৃষ্টি বিষয়ে এই বলা যায় যে, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র হইয়া উঠায় কয়েকটি চরিত্র চিত্তাকর্ষক হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে চরিত্র সাম্প্রতিক ভাবের প্রাধান্যে ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের জটিলতা তথা গভীরতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভাবসমুজ্জ্বলতা, বাগ্‌বিভবতা এবং আবেগ-শক্তি প্রশংসনীয় পরিমাণেই নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্যিক নাটক (poetic drama) হিসাবে 'রাজা ও রাণী' একখানি সার্থকফল নাটক।

রক্তকরবী

(মুখবন্ধ)

'Symbolism may be defined as the representation of a reality on one level of reference by a corresponding reality on another'.

—*Dictionary of World Literature*

ভাবানুভূতিকে ভাষার মাধ্যমে উপভোগ্যরূপে সৃষ্টি করিবার প্রেরণা হইতে কাব্য-শিল্পের জন্ম। এই সৃষ্টির এক প্রান্তে আছে — ব্যক্তির আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, যাহা স্থানে-কালে বিস্তৃত নহে, এবং অন্য প্রান্তে আছে — মহাকাব্যের মত বহুপটিক ব্যাপকত্ব — স্থান-বিস্তার ও কাল-ব্যাপ্তির সমবায়ে গঠিত ব্যাপক আয়তন। (মহাকাব্য — উপন্যাসাদি) দৃশ্যকাব্য বা নাটক যেমন আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস নহে বা কোন একটি কাহিনীর সরল বর্ণনা মাত্র নহে, তেমনি মহাকাব্যের মত বহুপটিক ব্যাপকত্ব — স্থান-বিস্তার ও কাল-ব্যাপ্তির সমবায়ে গঠিত ব্যাপক আয়তন। (মহাকাব্য ও উপন্যাসাদি) দৃশ্যকাব্য বা নাটক যেমন আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস নহে তেমনি মহাকাব্যের মত বহুপটিক রচনাও নহে। ইহা সেই অনুভবাত্মক জীবন-কথারই প্রত্যক্ষবৎ প্রকাশ যাহা স্থানে-কালে সুবিন্যস্ত তথা সুবিস্তৃত হইয়া কাহিনীর রূপায়তন লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ নাটক নানা-সম্বন্ধে-সম্বন্ধ ব্যক্তির ব্যাপ্তিমান জীবন-কথারই প্রত্যক্ষ রূপায়ন। 'রূপ' মাত্রই দেশ-কালের সীমায় আবদ্ধ হইতে বাধ্য বটে, সেই দিক হইতে প্রত্যেক রূপেরই দেশ-কাল-সাপেক্ষতা জনিত একধরণের ভাবগত বাস্তবতাও আছে। কিন্তু

বাস্তবতা বলিতে আমরা সেই দেশ-কালের সাপেক্ষতাই বুঝি যে, দেশ-কাল কল্পিত নহে — অন্ততঃ বিশ্বাসের মণ্ডলে যাহার সত্তা সুবিদিত। নাটক বলিতে সাধারণতঃ আমরা এইরূপ দেশ-কাল-সাপেক্ষ জীবনেরই রূপায়ন বুঝিয়া থাকি। ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটকে এই বাস্তবতার মাত্রা ষোল আনা না থাকিলেও উহার কাছাকাছি থাকে — পৌরাণিক নাটকে কম থাকিলেও, না-থাকে এমন নহে অর্থাৎ সেখানেও দেশকাল-সাপেক্ষতা থাকে এবং সে দেশ-কালের সত্তা কল্পনায় বা বিশ্বাস-ভূমিতে। মোট কথা এই যে, সাধারণ নাটকে ভাব যে-রূপের মাঝারে অঙ্গ পায়, সেই রূপের বাস্তব গুরুত্ব থাকে যথেষ্ট।

কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, রূপ ভাবপ্রাধান্যের চাপে দেশ-কাল-সাপেক্ষতা হারাইয়া ফেলিতে পারে — লৌকিকতা যুক্তিযুক্ততা বা সম্ভাব্যতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ভাবকেই বিলক্ষণ প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে। এই রীতিরই বিশেষ পরিণাম রূপক নাটক। রূপক নাটকে আরোপ অপেক্ষা আরোপ্যেরই প্রাধান্য। ভাব-সত্যকে অভিব্যক্ত করাই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। রূপের বাস্তবতা — অর্থাৎ লৌকিকতা, কার্য্যকারণনিয়মানুগত্য প্রভৃতি নানাবিধ ঔচিত্য রূপক নাটকে অতীব গৌণ। ভাব-সত্যের ব্যঞ্জনার জন্য যতটুকু রূপস্পর্শ দরকার, এই রচনায় রূপের সংযোগ ততটুকুই। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী "সিম্বলিস্টরা" রূপক কবিতা সম্বন্ধে যে ইস্তাহার ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার ভাষায় — "Symbolist poetry seeks to clothe the Idea with a sensory form which, however would not be its own end,.........Thus in this art.........all concrete phenomena are mere sensory appearances designed to represent their esoteric affinities with primordial Ideas."

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের ভাষায়— "সে সৃষ্টির মধ্যে বাস্তব ঘটনা বা বাস্তব নরনারীর সত্যকার কোন স্থান নাই; নাটকের প্লটের, তাহার নরনারীর গতির বা কর্ম্মের কোন প্রাধান্য সেখানে নাই বলিলেও চলে।" রূপকের বড় এবং প্রধান ধর্ম্মই রূপের ব্যঞ্জনা দ্বারা ভাব-সত্যের উপস্থাপনা। এ সম্পর্কে এইরূপ অনুসিদ্ধান্ত করা যায়—

(ক) রূপক নাটকের বিষয়-বস্তুভাব-রহস্য বা ভাবতত্ত্ব (The Ideas)। এই ভাবতত্ত্ব শুধু আধ্যাত্মিকই হইবে এমন কথা নাই, সামাজিক বা প্রাকৃতিক ভাব-রহস্যও হইতে পারে; এই বিষয়বস্তু এই অর্থেই অরূপ যে, ইহা একটা ভাব (Idea) — ভাব-লোকেই ইহার জন্ম।

ডাঃ শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় রূপকের বিষয়-বস্তুর আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন — "আমাদের চিত্তে এক এক সময়ে এক একটা কল্পনাভূতির স্পর্শ আসিয়া লাগে, এমন একটা রাজ্যের আভাস আমরা পাই যাহাকে এই দৃশ্য বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আনিয়া কিছুতেই রূপ দেওয়া যায় না, যে-রাজ্যের সঙ্গে আমাদের এই প্রতিদিনের সংসারের কোন মিল, কোন যোগ নাই, অথচ মনের মধ্যে এই অনুভূতি এত তীব্র, এত প্রবল, এত সত্য যে কিছুতেই এড়ান যায় না, তাহাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, এই যে কল্পনাভূতি ইহার আভাস মানুষকে দিতে হইবে।" ডাঃ রায়ের এই মন্তব্যটি আধ্যাত্মিক ধারণা বা কল্পনাভূতি সম্বন্ধেই সত্য। কিন্তু রূপক নাটক কেবল আধ্যাত্মিক সত্যেরই প্রতিভাত রূপ, এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না। যে-কোন ভাব-সত্যকেই রূপে সুবিন্যস্ত করা যাইতে পারে — রূপ-পরিকল্পনার মধ্যে বাস্তবায়িত করা যাইতে পারে। বড় বড় রূপক-কাব্য আধ্যাত্মিক বিষয়-বস্তু অবলম্বনে রচিত হইলেও উহাই রূপক-কাব্যের একমাত্র বিষয়-বস্তু নহে। রাশিয়ার বিখ্যাত

সমালোচক ডি. মেরেজকোভ্স্কি সিম্বলিজমের পক্ষ সমর্থন প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেও বড় কথা — "mystical content." অবশ্য — "The aridity for that which has never before been experienced, the pursuit of elusive shades, of the obscure and unconscions in our sensibility.........”-র কথাও তিনি লিখিয়াছেন। যাহা হউক, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এবং ঐন্দ্রিয় অনুভূতি উভয় প্রকার অনুভূতিই রূপকের বিষয়-বস্তু হইতে পারে — এইরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন।

(২) তারপর, রূপক নাটকের চরিত্র এক একটা ভাবাদর্শের প্রতীক—সুতরাং ভাবাদর্শের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিতে পারাই চরিত্রের উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিমাণের তারতম্য অনুপাতেই উহাদের সার্থকতা। এই নাটকের চারিত্রিক আকর্ষণ দ্বন্দ্বময়তায় নহে ভাবপ্রাণতায়—ভাবব্যঞ্জনার ক্ষমতায়। ইহারা দেহ ধারণ করে বটে, কিন্তু দেহগুলি বাস্তব বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষা ভাব-বায়ুরই বেশী অধীন। ইহারা নামে বাস্তব, কার্য্যে অবাস্তব। এক কথায়, ইহারা "ভাবে-ভরা ফানুস"।

(৩) ঘটনা-সংস্থাপনে এখানে কোন কার্য্য-কারণ-তত্ত্বের বাধ্য-বাধকতা নাই। ভাবটিকে অভিব্যঞ্জিত করিতে যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা ঘটাইতে পারিলেই ঘটনা-সংস্থাপনের উদ্দেশ্য সার্থক। ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। ভাবোপস্থাপনায় উহার কার্য্যকারিতা কতটুকু তাহাই প্রধানতঃ বিবেচ্য।

(৪) রূপক নাটকের রস সাধারণ রস নহে, ভাবানুভূতিজনিত একপ্রকার বিশেষ আনন্দই উহার আত্মা, এক কথায় বলা চলে— 'ভাব'-রস। এ সম্বন্ধে অজিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে, "কতকগুলি রস—যাহা কাব্যের

বিষয়ীভূত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে—তাহাদের সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত আছি, কিন্তু সেই রসগুলির মধ্যেই যে মানুষের সমস্ত হৃদয়াবেগের প্রকাশ নিঃশেষিত তাহা নহে; প্রেম, ভক্তি, করুণা, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি যে রসোদ্রেক করে তাহার ধারণা আমাদের মনে সুস্পষ্ট, কিন্তু **অনন্তের জন্য পিপাসা** যে রসকে জাগায় তাহার ধারণা তো তেমন স্পষ্ট নহে।"

রূপকবাদের ক্রমধারা

অলঙ্কার হিসাবে রূপকের প্রয়োগ খুবই প্রাচীন, তেমনি প্রাচীন রূপক-কাহিনী ও কাহিনীর রূপক-ব্যাখ্যা। অরূপকে রূপের মধ্যে ধরিবার চেষ্টা হইতে, সুপরিচিতের মাধ্যমে অপরিচিতকে চিনাইবার চেষ্টা হইতে—বাস্তবের সাহায্যে অবাস্তবের রূপায়িত করিবার চেষ্টা হইতেই রূপকের জন্ম।

সাহিত্য-রচনারীতির শাখারূপে মতবাদটি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিঘোষিত হয় ('Figaro'-তে); সাহিত্যক্ষেত্রে যাহারা "ডেকাডেণ্ট" নামে পরিচিত ছিলেন (২০ বছর আগে থেকেই) তাঁহারাই এই ঘোষণা প্রকাশ করেন। *

ফরাসী দেশকেই এই আন্দোলনের জন্মভূমি বলা যাইতে পারে কারণ এই দেশেই (ক) বুদেলেয়ারের সনেটে (Les Corres-pondences) সুইডেনবর্গের মতবাদ (Theory of Corres-

---

* **"Symbolist poetry seeks to clothe the Idea with a sensory form which, however, would not be its own end,......Thus in this art......all concrete phenomena are mere sensory appearances designed to represent their esoteric affinities with primordial Ideas."** (২১৮ পৃঃ দ্রঃ)

pondences) পরিপোষিত হয়। তারপর বুদেলেয়াবের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন (খ) আর্থার রিম্বুদ (Arthur Rimbaud) এবং তাঁহাকে অনুসরণ করেন (গ) ভারলেন্ (Verlaine) ও (ঘ) ম্যালার্সে (Mallarsie)। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবীন সাহিত্যিকরা এই ম্যালার্সে এবং ভারলেন্‌কে খুঁজিয়া বাহির করেন এবং নিজেদের নেতৃ-পুরুষরূপে দাঁড় করান। এক দল হইলেন—"ম্যালার্সে-পন্থী", আর এক দল হইলেন—"ভারলেন্-পন্থী"। ভারলেন্-পন্থীদের মধ্যে (১) Le Cardonnel, (২) Somiain, (৩) Mikhael, (৪) Ridenbach, (৫) Maeterlink অগ্রগণ্য, আর ম্যাল্যার্সে-পন্থীদের মধ্যে অগ্রগণ্য (১) Ghil, (২) Dubus, (৩) Mockel, (৪) Manclair, (৫) Merrill, (৬) Verherren, (৭) Kahu, (৮) Laforgue প্রভৃতি।

এই আন্দোলন নানাদেশে ছড়াইয়া পড়িল অতি অবিলম্বেই। এক এক দেশে এক এক নামে দেখা দিল। ইংলণ্ডে ইহাদের নাম 'ডেকাডেণ্ট', আমেরিকায় 'ইমেজিষ্ট এবং সিম্বলিষ্ট', স্প্যানিশ আমেরিকায় এবং স্পেনে 'মডার্নিস্‌ট্যাস্' (Modernistas)।

রাশিয়াতেও এই আন্দোলন প্রসারিত হইতে বিলম্ব করে নাই। 'নবম দশকে' এই আন্দোলন আন্তর্জ্জাতিক হইয়া উঠিয়াছিল। ডি. মেরেজকোভস্কি (জন্ম ১৮৬৫) প্যারিস হইতে দেশে ফিরিয়াই "নতুন রীতি"র পক্ষে প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি লিখিলেন, এই নূতন রীতি "which reflects the vague longing of an entire generation arising from the depths of the modern European and Russian spirit.........we are witnessing the great and significant struggle between two views of life, two diametrically opposite conceptions of the

world. In its ultimate demands, religious feeling clashes with the latest deductions of experimental science, and modern art is characterised by this principal elements : mystical content, symbols, and the development of artistic sensibility —which the French writers have rather cleverly called— *Impressionism.* The aridity for that which has never before been experienced, the pursuit of elusive shades, of the obscure and unconscious in our sensibility is a characteristic feature of the ideal poetry of the future (*Russian Literature*— page 187).

রাশিয়ায় (1) Merezkovsky, (2) Constantiv Balmont, (3) Vyacheslar Ivanov, (4) Bryusov (1873-1924), (5) Andrei Byely (1880-1934), (6) Alexander Block (1880-1921) প্রভৃতি এই আন্দোলনের প্রবক্তা।

আয়ারল্যাণ্ডে এই আন্দোলন ইয়েটস্ (Yeats), সিন্জ (Synge), পলভিনসেণ্ট্ ক্যারল্ প্রভৃতির নাট্য-রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহা Anton Chekhov, Engene O'Neil, Philip Barry প্রভৃতির নাট্য-রচনায়, জয়েস্ (Joyce), জুলিস্ রোমেন্স (Jules Romains) প্রভৃতির উপন্যাসে, এবং ইলিয়টের কবিতাদিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের নাটিকায় এই রচনা-রীতির চমৎকার অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছে। প্রতীচ্য ভূখণ্ডে রূপক-নাটক লিখিয়া যাঁহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ষ্ট্রীণ্ডবার্গ, মেটারলিঙ্ক, ইয়েটস্ আন্ড্রিফ্, হাউপট্‌ম্যান, জেরোম্ কে জেরোম্, চার্লস ব্যান কেনেডি, পারসি ম্যাকেণ্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রাচ্য ভূখণ্ডে রবীন্দ্রনাথ এক না হইলেও, অদ্বিতীয়।

রক্তকরবী

১৩৩০ সালের গ্রীষ্মকালে শিলঙ-বাসকালে রবীন্দ্রনাথ "যক্ষপুরী" নামে একখানি নাটক লেখেন। কিন্তু "যক্ষপুরী" পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই "নন্দিনী" মূর্তি পরিগ্রহ করিতে বিলম্ব করে নাই, আবার যখন ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে সংস্কৃত রূপে ইহা প্রকাশিত হয়, তখন উহা 'নন্দিনী'-বেশ ত্যাগ করিয়া "রক্তকরবী" রূপ ধারণ করে।

'যক্ষপুরী'—'নন্দিনী' — 'রক্তকরবী', কোন্ নামটি ধারণ করিলে নাটকখানি সার্থকনামা হয়, এই প্রশ্ন সহজেই জাগিতে পারে, এবং নাম-পরিবর্তন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের বেশী অবকাশ দিয়াছেন। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় 'নাম লইয়া বিব্রত হইবার কিছু কারণ নাই' বলিয়াও 'তবু'-যোগে লিখিয়াছেন "আমার মনে হয় 'যক্ষপুরী' নামটি এই নাটকের পক্ষে সার্থকতর ছিল, যদিও 'রক্তকরবী' নাম অধিকতর কবিতাময়।" কিন্তু ডাঃ রায়ের মন্তব্যটি সমর্থন-যোগ্য হইতে পারে নাই। নাটকখানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটু অবহিত হইলেই দেখা যাইবে যে 'যক্ষপুরী' 'দানবের পটভূমিকা' মাত্র। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাউক — "এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' ব'লে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ।" 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবেই জানাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—"যক্ষপুরে পুরুষের

প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য্য সেখান থেকে নির্ব্বাসিত।·········এমন সময় সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল, প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্ত্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙ্গে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"

অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, যেহেতু যক্ষপুরী নাটকের পটভূমি মাত্র, সেই হেতু পটভূমি অপেক্ষা 'উদ্দেশ্য' অনুযায়ী নামকরণই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তবে কি 'নন্দিনী'ই সার্থকতম নাম? তাই যদি হইবে, তবে 'রক্তকরবী' নাম দিলেন কেন?— শুধু কি 'কবিত্বময়' করিবার জন্যই 'রক্তকরবী' নাম দেওয়া হইয়াছে? না। রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন — "সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি" এবং "আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপক-নাট্য নয়"—আসল কথা এই যে, নন্দিনী সামান্যই মানবী এবং অধিকাংশই 'কল্পনা', আর রক্তকরবী পালাটিও খাঁটি রূপক-নাট্য এবং সেই রূপক-নাট্যের মূল বিষয় — সহজ-যোগের আনন্দেই মুক্তি এবং সেই মুক্তিতেই আনন্দ ও সৌন্দর্য্য, আর অফুরন্ত বাঁধনহারা রক্ত-রাঙ্গা প্রাণই সেই মুক্তির বিজয়কেতন বাহন। 'রক্তকরবী' আনন্দময়ী ও সৌন্দর্য্যময়ী ও প্রাণময়ী মুক্তির বিজয়কেতন; তাই, আনন্দ-মুক্তির প্রতীক 'রক্তকরবী'ই রূপকনাট্যখানির সার্থকতম সংকেত।

নাট্য-পরিচয়

প্রথম সংস্করণ রক্তকরবীর 'প্রস্তাবনা'য় কবি বিবৃতি দিয়া

জানাইয়াছেন — "আমার পালাটিকে যাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক।.........এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কবির জ্ঞান-বিশ্বাস মতে এটি সত্য"।— আরো বিশেষভাবে জানাইয়াছেন — "আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়।...... এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকে পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তেমনি। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন তা-হলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন।"

অতএব বড় প্রশ্ন — নাটকখানি কি রূপক-নাট্য নহে? বাস্তবিক যাহা 'সত্যমূলক' তাহাকে 'রূপক' বলা কেন? আশ্চর্যের কথা এই যে, কোন সমালোচকই রবীন্দ্রনাথের নিবেদনে গুরুত্ব স্থাপন করেন নাই — নাটকখানিকে রূপক-নাট্যরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং খুব সঙ্গতভাবেই করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে ইহাকে 'সত্যমূলক' বলিয়াছেন সে অর্থ এই যে, ঘটনাটি 'ঘটে যাহা সব সত্য নহে' এই অর্থেই সত্য, আর উহার জন্মস্থান কবির মনোভূমি এবং উহা প্রকৃত জগতের চেয়েও সত্য। নাট্যকার স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছেন — "এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কি না ঐতিহাসিকের পরে তার প্রমাণ সংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে।" অর্থাৎ ইহা বস্তু-সত্য নহে, "কবির জ্ঞান-বিশ্বাস মতে" সত্য — ভাব-সত্য। এই ভাব-সত্যকে নাট্যকার যে রূপের আশ্রয়ে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত বাস্তব রূপের মর্যাদা লাভ করে নাই — সংকেতটুকুর মধ্যেই উহার সমস্ত সম্ভাবনা আবদ্ধ হইয়া আছে। রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া ভাবেরই প্রধান হইয়া পড়া — রূপক-নাট্যের এই প্রধান লক্ষণটিই নাটকের সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। অধিকন্তু রূপক-নাটকে যে

ধরণের কুহেলিকা ভাসিয়া বেড়ায় — চরিত্রগুলি যেরূপ "ছায়ার যেন ছায়ার মত যায়" এই নাটকেও সেই কুহেলিকা, সেই ছায়া কম নহে —। এখানে রাজা আছেন এই কুহেলিকার জালের ভিতরে। নন্দিনীর সঙ্গে তাহার আলাপ-আলোচনা, নন্দিনীর নিজের গতিবিধি — সবই ঠিক 'ছায়ার যেন ছায়া'। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মৌখিক বারণ সত্ত্বেও নাটকখানিকে আমরা 'রূপক-নাট্য' রূপেই গ্রহণ করিব। কারণ নন্দিনীকে শুধু "মানবীর ছবি" রূপে দেখা অসম্ভব। তবে কি নাটকখানিতে ভাব-রস ছাড়া রচনা-রস ছাড়া হৃদয়-রস পাওয়া যায় না? রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন এবং রসের ফল্গুধারাটির প্রতি দৃষ্টিও আকর্ষণ করিয়াছেন —

"এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটী মানবীর ছবি।............সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন, তা-হলে হয়ত কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তাহলে তার দায় কবির নয়।" কিন্তু কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ যদিও দাবী করিয়াছেন —'আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর' তবুও এই প্রশ্নই বড় আকারে জাগে — নাটকখানি সত্যই কি ব্যক্তিগত মানুষের হইয়া উঠিতে পারিয়াছে? নন্দিনী ভৌগোলিক স্থিতিতে, ব্যবহারিক নীতিতে, মানসিক বা আনুভাবিক গতি-প্রকৃতিতে সত্যই কি 'ব্যক্তিগত মানুষ' হইয়া উঠিয়াছে? মানুষের হৃদয় যে ভাবে কাজ করে, নন্দিনীর হৃদয় কি সেই ভাবেই কাজ করিয়াছে? অবশ্য নন্দিনীর হৃদয়ের অভিব্যক্তি না পাওয়া যায় এমন নহে।

নন্দিনী কিশোরের দুঃখ সহিতে পারে না, রাজার বিশ্রী জালটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া মানুষটাকে উদ্ধার করিতে তাহার ইচ্ছা জাগে —

সে কোন বাধাই মানিতে চাহে না, রঞ্জনের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় তাহার মনে পুলক জাগে — আনন্দে মন ভরিয়া উঠে, অনুপ-উপমন্যুকে কঙ্কুকে দেখিয়া বেদনায় তাহার অন্তর ফাটিয়া যায়, পালোয়ানকে বাঁচাইবার জন্য তাহার কত আন্তরিক সমবেদনা — বিশুর জন্য তাহার মন উৎকণ্ঠিত হয়, রাজার বিরুদ্ধে, সর্দারের বিরুদ্ধে সে নির্ভীক প্রতিবাদ করে — মৃত-রঞ্জনের জন্য তাঁহার করুণ শোকোচ্ছ্বাস জাগে। এতগুলি হৃদয়-ভাবের স্পন্দন নন্দিনীর মধ্যে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু স্পন্দন যে-পরিমাণে থাকিলে স্থায়ী-ভাব-বদ্ধ হইতে ভাবাবেগ উদ্রিক্ত হইয়া হৃদয়কে আপ্লুত করিয়া রাখে; সেই পরিমাণ স্পন্দন-আবেদন নাটকে পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহার যথার্থ পরিচয় — রস নহে, রসাভাস। তবে — "রসভাবৌ তদাভাসৌ ভাবস্য প্রশমোদয়ৌ।

সন্ধিঃ শচলতা চেতি সর্ব্বেহপি রসনাদ্রসাঃ ॥"

অর্থাৎ — রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস, ভাব-প্রশম, ভাবোদয়, সন্ধি, শচলতা — সব কিছুই রসসৃষ্টির অংশ, অতএব রস বলিয়াই গ্রাহ্য — এই কথা স্বীকার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে নাটকখানিতে রস আছে। তাই প্রশ্ন, সেই রসের স্বরূপ কি? কেই বা সেই রসের অবলম্বন বিভাব? নাট্যকার নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রতি নিজেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন — এবং নন্দিনীই সেই চরিত্র। সুতরাং অনুসন্ধান করিতে হইবে — কোন্ স্থায়ীভাব নন্দিনীকে অবলম্বন করিয়া রসপরিণতি লাভ করিয়াছে — নন্দিনীর মধ্যে কোন্ ভাবটি প্রধানতঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে। আমরা জানি, নন্দিনী ভাবের প্রতীক, কিন্তু আমরা ইহাও দেখি যে নন্দিনী হৃদয়ের যোগেও অনেকের সঙ্গে যুক্ত এবং বিশেষতঃ রঞ্জনের সহিত তাহার প্রাণের যোগ — প্রেমের

.যাগ। নন্দিনী প্রাণের স্পর্শ দিয়াছে অনেককেই, কিন্তু প্রাণ দিয়াছে সে কেবল রঞ্জনকে। সেই দিক দিয়া নন্দিনীর স্থায়ীভাব— রতি; এবং নাটকখানির রস — বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার। কারণ রঞ্জনের সঙ্গে নন্দিনীর বাস্তবিক মিলন ঘটিতে পারে নাই।

বিচ্ছেদ-বেদনায় নন্দিনী ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছে—"তবে আমাকে ওই ঘুমেই ঘুম পাড়াও। আমি সইতে পারছিনে।" বিচ্ছেদ-চেতনা ভাব-সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেলেও করুণ-মূর্চ্ছনার রেশ শেষ পর্য্যন্তই পাওয়া যায়।

তত্ত্ব-পরিচয়

(ক) নাট্যকার প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নিবেদন করিয়াছেন—"যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায়" — এবং সতর্ক করিয়াও দিয়াছেন — "রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা হ'লে তার দায় কবির নয়।" এক কথায় 'গোপনে যে-অর্থ আছে তার ঝুঁটি ধরে টানাটানি' করিতে নাট্যকার নিষেধই করিয়াছেন। কিন্তু সমালোচকরা যে কত নিরুপায়, নাট্যকার তাহা উপলব্ধি করেন নাই, করিলেই দেখিতে পারিতেন যে, গূঢ়কে প্রকাশ করিতে পারাই তাহার বড় সার্থকতা — গোপনে যে-অর্থ আছে, তাহার ঝুঁটি ধরিয়া টানাটানি না করিলে সমালোচকের নিজের ঝুঁটিই থাকে না। এই কারণেই কেহই তাঁহার নিবেদনে সাড়া দেন নাই এবং নাট্যকার নিজেও গোপন অর্থের ঝুঁটি ধরিয়া টানাটানি না করিয়া পারেন নাই। (একবার বারোয়ারি-সভায় দাঁড়াইয়া করিয়াছেন — একবার 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি'তেও করিয়াছেন)।

নাট্যকার প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় যে তত্ত্বটি বিবৃত করিয়াছেন তাহাকে এক কথায়,—সমাজসংস্থাগত তত্ত্ব বলা চলে।

তাঁহার ভাষায়—"আমার পালায় একটি রাজা আছে।………… বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা সেই শক্তি-বাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন………একই নীড়ে পাপ ও পাপের মৃত্যুবান লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ, সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।………(রাজার এই ধর্মটি সমালোচকদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে)।

………যক্ষের ধন মাটির নীচে পোঁতা আছে। এখানকার রাজা পাতালে সুড়ঙ্গ করে সেই ধন হরণে নিযুক্ত। তাই আদর করে এই পুরীকে সমজদার লোকেরা যক্ষপুরী বলে।………

কর্ষণ-জীবী এবং আকর্ষণ-জীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে…………। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে। তা-ছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো।………আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে—কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে……………; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন।" (রবীন্দ্রনাথের মতে) এইটুকু নাটকের সামাজিক ব্যঞ্জনা; ইহা ছাড়া 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়রি'তে রবীন্দ্রনাথ আরো একটি তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন; তাঁহার ভাষায়—"নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলি পীড়া দেয়,

পীড়িত হয়।.........যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য্য সেখান থেকে নির্ব্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনি জড়িত হয়ে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশী; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে। এমন সময়ে সেখানে নারী এল, প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্ত্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"

এই ভাষ্যটির তাৎপর্য্য এই যে—নারী-শক্তিই (নারী-মহিমা) প্রকৃত প্রাণশক্তি—এবং প্রেমশক্তি; আর এই ভাষ্য স্বীকার করিলে, রক্তকরবীর তত্ত্ব নারী-মহিমায় পর্য্যবসিত হয়—তথা প্রতাপ ও প্রেমের তত্ত্বের কথা হইয়া দাঁড়ায়। (আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে এই তত্ত্বটির সহিত নাটকে-বর্ণিত বিষয়ের পূর্ণ সঙ্গতি পাওয়া যায় না)।

(খ). ডাঃ শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় নাটকখানির ভাবতত্ত্বকে এইভাবে দেখিয়াছেন—"যক্ষপুরীর রাজার রাজধর্ম্ম প্রজাশোষণ, তাহার অর্থলোভ দুর্দ্দম। সেই লোভের আগুনে পুড়িয়া মরে সোনার খনির কুলিরা। রাজার দৃষ্টিতে কুলিরা ত মানুষ নয়, তাহারা স্বর্ণলাভের যন্ত্রমাত্র, তাহারা ৪৭ক ২৬৯ক মাত্র, তাহারা জড় যান্ত্রিকতার যন্ত্রকাঠামোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গমাত্র.........
......মনুষ্যত্ব, মানবতা এই যন্ত্রবন্ধনে পীড়িত ও অবমানিত। জীবনের

প্রকাশ সেই যক্ষপুরীতে নাই। প্রেম ও সৌন্দর্য্য হইতেছে জীবনের প্রকাশের সম্পূর্ণ রূপ—নন্দিনী তাহার প্রতীক; এই নন্দিনীর আনন্দ-স্পর্শ রাজা পান নাই তাঁহার লোভের মোহে, সন্ন্যাসী পান নাই তাঁহার ধর্ম্মসংস্কারের মোহে, মজুররা পায় নাই অত্যাচার ও অবিচারের লোহার শিকলে বাঁধা পড়িয়া, পণ্ডিত পায় নাই তাহার পাণ্ডিত্যের এবং দাসত্বের মোহে। এই যক্ষপুরীর লোহার জালের বাহিরে প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রতীক, প্রাণশক্তির প্রতিমূর্ত্তি নন্দিনী হাতছানি দিয়া সকলকে ডাকিল, যক্ষপুরীর কারাগারের ভিতরে এক মুহূর্ত্তে সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল, মুক্ত জীবনানন্দের স্পর্শ সকলের দেহে মনে লাগিল............। রাজা নন্দিনীকে পাইতে চাহিলেন যেমন করিয়া তিনি সোনা আহরণ করেন তেমন করিয়া, শক্তির বলে কাড়িয়া লইয়া পাওয়ার মতন করিয়া, ধরিয়া ছুঁইয়া পাওয়ার মতন করিয়া; কিন্তু তেমন করিয়া প্রেম ও সৌন্দর্য্যকে লাভ করা যায় কি? নন্দিনীকে তিনি তাই পাইয়াও পান না............এমন যে মোড়ল সে-ও বিচলিত হইল, সে-ও নন্দিনীকে ভালবাসিল, কিন্তু তাহা প্রকাশ পাইল বিরোধের মধ্য দিয়া............এই জীবনানন্দের রূপ দেখিয়া, প্রাণপ্রাচুর্য্যের মধ্যে বাঁচিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া জালের বাহিরের দিকে হাত বাড়াইল। নন্দিনী রঞ্জনকে ভালবাসে, নন্দিনীই রঞ্জনের মধ্যে এই প্রেম জাগাইয়াছে; কিন্তু সে তো যন্ত্রের বন্ধনে বাঁধা এবং সেই যন্ত্রই শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে বিনাশ করিয়া প্রেমকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল, জীবনের সঙ্গতি নষ্ট করিয়া দিল।............নন্দিনীর প্রেমাস্পদ বলি হইল যান্ত্রিকতার যূপকাষ্ঠে এবং তাহারই মধ্য দিয়া জীবন হইল জয়ী আবার প্রেমকেই সন্ধান করিয়া ফিরিয়া পাইবার জন্য।" (রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—১৫৬ পৃষ্ঠা)।

তারপর—

(গ) সমালোচক বন্ধু অজিতবাবু নাটকখানির অন্তর্নিহিত ভাব-সত্তাকে এইরূপে দেখিয়াছেন :—"রক্তকরবী'র যক্ষপুরীও এক অতিকায় অজগরের ন্যায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত ক্ষুদ্র মানবাত্মাগুলিকে গ্রাসে গ্রাসে তাহার গহ্বরের মধ্যে চালান করিয়া দিতেছে, তাহাদের বাহিরে আসিবার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। পতঙ্গ যেমন বহ্নির রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া বসে, পল্লীর স্বাধীন কৃষিও তেমনি আপাত-লোভনীয় ধনকণার আকর্ষণে নিজেদের রক্তলোভী যন্ত্রদানবের কাছে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে। সোনার থলি মানুষের কাছে পরম লোভনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই থলি ক্রমাগত বড়ো হইয়া যখন গুরুভারী বোঝার ন্যায় তাহার কাঁধে চাপিয়া বসে তখন সে ক্লান্ত পীড়িত হইয়া এই বোঝা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায়। যক্ষপুরীর রাজাও যেন স্বারোপিত ভার হইতে মুক্তি-প্রয়াসী হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক ধনতন্ত্রী যন্ত্রসর্ব্বস্ব সভ্যতার মর্ম্মপীড়া এই রাজার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রাণময়ী রস-নির্ঝরিণী নন্দিনী যেন জড় দেবতার অচল সিংহাসন আজ টলাইয়াছে। ....ধনদানব রাজা, তত্ত্বসর্ব্বস্ব অধ্যাপক, ধর্ম্মভেকধারী গোঁসাই, ক্ষমতাপন্ন সর্দ্দার—ইহারা নন্দিনীর প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। প্রভাতের স্নিগ্ধ কম্পমান আলোক-রশ্মির ন্যায় ইহা ফাঁক-ফুকর দিয়া সকলের ঘরে প্রবেশ করিয়া অতি মমতাময় করস্পর্শে সকলকে জাগাইয়া তুলিয়াছে।" (বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৫৭)।

উল্লিখিত তত্ত্ব-বিশ্লেষণ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করার আগে নাটক খানির কথা-বস্তুর একটি রূপরেখা দেওয়া একান্ত দরকার। অন্যথা

ভাব-সত্তার আসল রূপটি—পরিপূর্ণ রূপটি, অস্পষ্ট থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। বর্ণিত বিষয় হইতে যথার্থ ব্যঞ্জনা কি পাওয়া যায়, তাহাই অনুসন্ধান করা যাক।

রক্তকরবীর কথাবস্তু

যক্ষপুরীতে, যেখানে শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত—বালক-শ্রমিক কিশোর নন্দিনীকে ডাকে—ফুল তুলিয়া আনিয়া দিতে চাহে, কারণ সারাদিনের কাজের ফাঁকে—একটু সময় চুরি করিয়া নন্দিনীকে ফুল আনিয়া দিতে পারার মধ্যেই সে বাঁচার আনন্দ অনুভব করে। নন্দিনী কিশোরকে সতর্ক করে—"ওরে কিশোর, জানতে পারলে যে ওরা শাস্তি দেবে।"

কিশোর শাস্তির বিনিময়েও বাঁচার আনন্দ পাইতে চাহে; সে জোর গলায় বলে— 'ওদের গারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব।' কিশোরপ্রাণই মুক্তির আনন্দে—বাঁচার আনন্দে প্রথম সাড়া দেয়।

অধ্যাপক—যিনি পাণ্ডিত্যের জালের পিছনে 'মানুষের অনেকখানি বাদ দিয়া'—বস্তুতত্ত্বের গহ্বরের মধ্যেই বেশী সময় থাকেন, তিনিও নন্দিনীর প্রতি আকৃষ্ট হন—নন্দিনীকে দেখিলেই তাঁহার মনটা নড়িয়া উঠে—বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়া উঠে। অধ্যাপক উপলব্ধি করেন, নন্দিনীর সঙ্গে যে দরকার সে ঠিক ব্যবহারিক দরকার নয়—দরকারের সীমা যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখান হইতেই যেন নন্দিনীলোকের সীমারম্ভ। দরকারের সন্ধানে ছুটিয়া মানুষ কেবল ধূলোর সোনাই পায়, কিন্তু নন্দিনী যে আলোর সোনা। অধ্যাপক নন্দিনীর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন—যক্ষপুরে তুমি সেই 'আচমকা আলো'। (অধ্যাপক না-বলার মধ্যেই যেন এই কথা

বলেন—ন চিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ)। নন্দিনীর প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক যক্ষপুরীর সাধনার স্বরূপও প্রকাশ করেন—জানার অর্থ-শক্তিকে বশীভূত করার সাধনাই সেখানে একমাত্র সাধনা—'সোনার তালের তালবেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে'। নন্দিনীও রাজার প্রকৃতিকে আঙুল দিয়া দেখায় —"তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ সে-যে মানুষ পাছে সে-কথা ধরা পড়ে"। রাজার ঐ মানুষটিকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছাও নন্দিনী প্রকাশ করে। রাজার মানুষঢাকা ভয়ংকর প্রতাপকে—যাহাকে যক্ষপুরীর লোকে রাজার মহিমা বলিয়া মনে করে—নন্দিনী 'বানিয়ে তোলা 'কথা' বলিলে অধ্যাপকও তাহাতে সায় দেন—ধনী-দরিদ্রের আসল পরিচয়টা প্রকাশ করিয়া দেন—'বানিয়ে-তোলা কাপড়েই কেউ বা রাজা, কেউ বা ভিখিরী'। নন্দিনী অধ্যাপকের বদ্ধতার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বলে—'তুমিও তো…দিনরাত পুঁথির মধ্যে গর্ত খুঁড়েই চলেছ।' নন্দিনী বোধ হয় বলিতে চাহে—শ্রমিকরা যেমন বস্তুর পিছনে—সোনার পিছনে ছুটিয়া ছুটিয়া মুক্তির আনন্দকে হারাইয়া বসিয়াছে, অধ্যাপকও তেমনি বস্তুতত্ত্বের পিছনে ছুটিয়া ছুটিয়া অবকাশের আনন্দকে—মুক্তির আনন্দকে, সহজ-সুখের আনন্দকে হারাইয়া বসিয়াছে। নন্দিনীকে অধ্যাপক ঘরের মধ্যে আহ্বান করেন। কিন্তু নন্দিনী জানায়—তাহার সঙ্কল্প আরো বড়—"আমি এসেছি তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব। জালের বাধা নন্দিনী মানে না—মানিতে চাহেও না। সে আসিয়াছে ঘরের মধ্যে ঢুকিতে। নন্দিনীর হঠাৎ একটা প্রশ্ন জাগে—"এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল, রঞ্জনকে সঙ্গে আনলে না কেন?" অধ্যাপক বুঝাইয়া দেন—সব জিনিষকে

টুকরো টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি, অধ্যাপকের বলিবার কথা বোধ হয় এই—ইহারা আনন্দ না চাহে—মুক্তি না চাহে এমন নহে, কিন্তু ইহারা আনন্দকে চাহে অথচ প্রাণকে অস্বীকার করে, জানে না যে প্রাণকে চাপিয়া মারিয়া, পিষিয়া মারিয়া আনন্দকে পাওয়া যায় না। নন্দিনী রঞ্জনের মহিমা জানায়—বলে 'রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে।.........রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।' 'রঞ্জন যেমন হাসতেও পারে, তেমনি ভাঙতেও পারে'। নন্দিনী অধ্যাপককে জানায়—'আজ রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে'। অধ্যাপক আর বেশী সময় মুক্তির আনন্দে থাকিতে সাহস করেন না, নন্দিনীকে সতর্ক করিয়া দিয়া—'যেখানকার লোকে দস্যুবৃত্তি ক'রে মা বসুন্ধরার আঁচলকে টুকরো টুকরো করে ছেড়ে না", সেইখানে যাইতে অনুরোধ করেন—আর একটি অনুরোধও করেন—রক্তকবরীর কঙ্কন হইতে একটি ফুল খসাইয়া দেওয়ার জন্য—তাঁহার দৃঢ় ধারণা—"ওই রক্ত-আভায় একটা ভয়-লাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য্য নয়।" নন্দিনী রক্তকরবী ধারণের রহস্য প্রকাশ করে—"রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা, সেই রঙ গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি"। নন্দিনী অধ্যাপককে প্রাণের স্পর্শের নিদর্শনস্বরূপ একটি ফুল দেয়। অধ্যাপক প্রস্থান করে।

সুড়ঙ্গ খোদাইকর গোকুল নন্দিনীকে কিছুতেই বুঝিতে পারে না—কেবল প্রশ্ন করে "তুমি কে"। নন্দিনী বলে যে, সে যাহা তাহাই, সহজ ভাবে তাহাকে না বুঝিতে পারিলে সে অবোধ্যই—(যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি)—অথচ না বুঝিলেও গোকুলের ভাল ঠেকে না—গোকুলের মধ্যেও মুক্তির আনন্দের জন্য একটা অবোধপূর্ব্ব অভীপ্সা। গোকুলের প্রাণে যত চাঞ্চল্য জাগে, তত গোকুল

নন্দিনীকে সন্দেহ করে—অবিশ্বাস করে। গোকুলের মনে হয়—নন্দিনী যেন "রাঙা আলোর মশাল" গোকুল নির্বোধদের 'সাবধান' করিতে প্রস্থান করে।

এইবার নন্দিনী জালের দরজায় ঘা দিয়া ডাকে—'শুনতে পাচ্ছ?' রাজা সাড়া দেন—'শুন্‌তে পাচ্ছি……বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও নেই।' নন্দিনী আবেদন জানায়—'খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই'—নন্দিনী রাজাকে মুক্তির আনন্দ দিতে চায়, রাজা প্রত্যাখ্যান করেন—শূন্যতার শোভা লইয়াই তিনি থাকিতে চাহেন।

নন্দিনী রাজাকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া জাগাইতে, প্রকৃতির সহিত সহজ যোগ স্থাপন করিতে, মাঠে লইয়া যাইতে চাহে; রাজা স্বীকার করেন—'সহজ কাজই আমার কাছে শক্ত'। নন্দিনী রাজার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হন, কিন্তু সে শক্তির সহিত আনন্দের কোন যোগ নাই যে। নন্দিনী নিষ্প্রাণ শোষণপরায়ণ শক্তির কার্য্য-ফলকে রাজার সম্মুখেই বর্ণনা করেন—স্পষ্টভাবেই বলেন, "কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস……দেখছ না এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে কিংবা সন্দেহ করছে কিংবা ভয় পাচ্ছে……খুনোখুনি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত……রাজা শাপ সম্বন্ধে সচেতন নহেন কিন্তু শক্তি সম্বন্ধে খুবই সচেতন—গঠিতও। নন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করেন—'আমার শক্তিতে তুমি খুশী হও নন্দিনী'? নন্দিনী—প্রাণ পূজারিণী। শক্তি দেখিয়া খুশি না হইয়া সে পারে না; কিন্তু শক্তি যখন পৃথিবীর খুশীকে আত্মসাৎ করিয়া—আচ্ছন্ন করিয়া, শুধু প্রতাপ রূপেই প্রকাশ পায়, সেই শক্তির সহিতই নন্দিনীর বিরোধ। নন্দিনী এই কারণেই রাজাকে আলোতে বাহির হইতে, মাটির উপর পা দিতে এবং পৃথিবীকে খুশী করিতে অনুরোধ করে।

নন্দিনী বোধ হয় রাজশক্তিকে শোষণ-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, পালন-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বলেন—রাজশক্তির সহিত প্রজার সহজ ও আন্তরিক যোগ, প্রেমের যোগ স্থাপন করিতে বলেন। রাজা কিন্তু শক্তিবলেই সবকিছু লাভ করিতে চাহেন—এমন কি মুক্তির ও সৌন্দর্য্যের আনন্দকেও—নন্দিনীকেও। নন্দিনীকে বলেন "আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙে-চুরে ফেলতে চাই।'

রাজা নন্দিনীর মুখে নিজের মহিমাকে আস্বাদন করিতে চাহেন—জিজ্ঞাসা করেন—'আমাকে কী মনে কর বলো'। নন্দিনী উত্তর করে—'মনে করি আশ্চর্য্য ...... দেখে আমার মন নাচে'। রঞ্জনের প্রতি কথা রাজার মনে পড়ে—নন্দিনীকে যে রঞ্জনই সহজ আকর্ষণে প্রেমে বন্দী করিয়াছে। রঞ্জনকে দেখিয়া নন্দিনীর মন যে ভাবে নাচে, ইহাও কি সেই নাচ? নন্দিনী রাজার সন্দেহ দূর করেন — 'সে-নাচের তাল আলাদা' রাজার মর্ম্মে উপলব্ধ হয়—"আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু"। বুঝাইয়াও বলেন—"দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মাণিক আনি, সহজের থেকে ওই প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারিনে"।

রাজা নন্দিনীর প্রশ্নের উত্তরে নিজের দুর্ব্বলতা ও দীনতা প্রকাশ করেন—আক্ষেপ করেন—'শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছই না। তাই পাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাই...... হায় রে, আর-সব বাঁধা পড়ে কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।' রাজার কথার তাৎপর্য্য—শক্তি যতই বৃদ্ধি পাক, সহজ-আকর্ষণ যৌবনের ধর্ম্ম তাহাতে আসে না, আনন্দকে বাঁধা যায় না—সহজ-আকর্ষণেই লাভ করিতে হয় (যমেব এষো বৃণুতে)।

রাজা তাহার তপ্ত, রিক্ত এবং ক্লান্ত অন্তর-সত্তাটিকে মেলিয়া

ধরেন—ভিতরে-ভিতরে-ব্যথিয়ে-উঠা হৃদয়টিকে বিশ্লেষণও করেন —"শক্তির ভার নিজের অগোচরে···নিজেকে পিষে ফেলে··· ।" রাজা উপলব্ধি করেন—সহজই সুন্দর, নন্দিনী সহজ, তাই সে সুন্দর। রাজার মধ্যে সঙ্কল্প জাগে—'বিধাতার সেই বন্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে।' রাজা সুন্দরের স্পর্শ লাভ করিতে হাত বাড়াইয়া দেন। কিন্তু সুন্দরকে "সব দিয়ে"ই যে লাভ করিতে হয়। নন্দিনী রঞ্জনের কথা তুলিলে—রাজা অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। আদেশ করেন—"যাও, তুমি চলে যাও—নইলে বিপদ ঘটবে।" নন্দিনী জানাইয়া যায়—"রঞ্জন আসবে, আসবে, আসবে—কিছুতে তাকে ঠেকাতে পারবে না।"

খোদাইকর ফাগুলাল ও তাহার স্ত্রী চন্দ্রা আলাপ করে—শ্রমিক-জীবনের অবসন্ন অবসরের চিত্র ফুটাইয়া তোলে। 'যক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই' যে। সহজ আনন্দের বরাদ্দ বন্ধ বলিয়াই ছুটির অবসরটুকু হাটের মদের মাতলামি দিয়া পূর্ণ করিতে চাহে। চন্দ্রা ফাগুলালকে সাবধান করিয়া দেয়—বিশুকে নন্দিনীতে পাইয়াছে, কাহাকে কখন পাইবে না পাইবে বলা যায় না। বিশু প্রবেশ করে গান করিতে করিতে। চন্দ্রা বিশুর "স্বপনতরীর নেয়ে"কে চিনে—বলে 'তোমার সেই সাধের নন্দিনী।' প্রবেশ করে—গোকুল খোদাইকর। তাহারও নন্দিনীকে ভালো ঠেকে না। কাজের রাজ্যে কিছুই করে না, তাই তো খট্‌কা লাগে। চন্দ্রাও নন্দিনীকে ভালো চোখে দেখে না—দুঃখের জায়গায় 'অষ্টপ্রহর কেবল সুন্দরিপনা করে'। যক্ষপুরী সুন্দরের উপর অবজ্ঞা ঘটাইয়া দেয়—বিশু বলে 'এইটেই সর্বনেশে'। ফাগুলালের প্রশ্নের উত্তরে বিশু মদ খাওয়ার 'কেন'কেও ব্যাখ্যা করে—সকল কথার মধ্য দিয়া এই কথাই বলে যে—প্রাণের জন্য

মদ চাইই চাই—সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হইয়া গেলেই অন্তরাত্মা হাটের মদ লইয়া মাতামাতি করে। আনন্দের কামনা সহজাত যে!

বিশু আরো স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেয়—'একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক, তারা জ্বালা ধরিয়েছে—বলছে, কাজ করো। অন্যদিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে—বল্‌ছে, ছুটি ছুটি ছুটি।' এই ছুটিই প্রাণের মদ। এই খোলা মদের আড্ডায় যাহারা যোগ দিতে পারে না, তাহারাই কয়েদখানার চোরাই মদের টানে ছুটে।—বিশু বলে 'আমাদের না আছে আকাশ না আছে অবকাশ, তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সূর্য্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে'। শ্রমিকদের অবকাশহীন এবং সহজ-আনন্দহীন জীবনের অবসন্ন অবসরটুকু মাতলামিতে পূর্ণ করিবার হেতু বিশু বিশ্লেষণ করে।

চন্দ্রার প্রশ্নের উত্তরে বিশু নারীর সোনার লোভের প্রভাব ও পরিণামও ব্যাখ্যা করে—বলে 'তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে চাবুক সর্দ্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া'। বিশু বোধ হয় বলিতে চাহে—পুরুষের দাসত্বের মূলে নারীর বাসনারও একটা বড় অংশ আছে। পুরুষ নারীর স্বপ্ন-সাধ মিটাইয়াই নিজের পুরুষকারকে আস্বাদন করে—নারীর সোনার স্বপ্নসাধ মিটাইতে যাইয়াই পুরুষ বেশী করিয়া সোনার ফাঁদে আপনাকে ধরা দেয়। বিশু একথাও বলে—"আজ যদি-বা দেশে যাও টিকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিমখোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে"। বিশু, চন্দ্রা ও ফাগুলালের কথায় প্রকাশ পায়—"যক্ষপুরীর কবলের

মধ্যে ঢুকলে তার হাঁ বন্ধ হয়ে যায়—শ্রমিকরা যাহাকে আদর করে, সর্দ্দারদের দৃষ্টি সেখানেই পড়ে—যক্ষপুরে 'মানুষ'কে সংখ্যায় পরিণত করা হইয়াছে—'গায়ে ছিলুম মানুষ এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক, বুকের উপর দিয়ে জুয়াখেলা চলেছে'—স্বৈরাচারী শাসনে—'কোন্ কথার টিকে কোন্ চালে আগুন লাগায় কেউ জানে না।'

সর্দ্দার প্রবেশ করেন—পয়োমুখ কিন্তু বিষকুম্ভ। চন্দ্রাকে নাতনী বলিয়া খাতির দেখান—বিশুকে কটাক্ষও করেন। বিশুও উত্তর দিতে ছাড়ে না—'তোমাদের এলেকায় নাচানো ব্যবসা কত সাংঘাতিক তার মোটা মোটা দৃষ্টান্ত দেখেছি, এমন হয়েছে সাদা চালে চলতেও পা কাঁপে'। সর্দ্দার সুখবর দেন—কেনারাম গোঁসাইকে নিয়োগ করা হইয়াছে—ভালোকথা শুনাইবার জন্য।

গোঁসাই প্রবেশ করেন—ভাড়াটিয়া প্রসাদলোভী প্রচারক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা। অধর্ম্মকে শাস্ত্রের বচনের আড়ালে ধর্ম্ম বলিয়া চালাইয়া দেওয়ার জন্যই এই গোঁসাই। বিশেষতঃ শোষণের বিরুদ্ধে যে স্বাভাবিক ক্ষোভ মাথা তুলিতে চাহে, সেই ক্ষোভকে পরলোকের ভয় ও পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া প্রশমিত করার উদ্দেশ্যেই গোঁসাই নিযুক্ত। ধনতন্ত্রের হাতে-ধরা-দেওয়া পুরোহিত এই গোঁসাই। শোষিত শ্রমিকদের ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অবিচলিত রাখাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। হরিনাম দিয়াই ইনি ক্ষুধা-তৃষ্ণার ক্ষোভ হরণ করিতে সচেষ্ট। ফাগুলাল ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, কিন্তু চন্দ্রা পরকাল খোয়াবার ভয়ে স্বামীকে তিরস্কার করে। শেষ পর্যন্ত সর্দ্দার নিজেই ভার নেন—ধর্ম্মনীতির কবলের মধ্যে যখন যাইতে চাহে না, তখন দণ্ডনীতিই চালানো বাঞ্ছনীয়। বিশু অনেকটা নির্ভীক—প্রাণবান, সর্দ্দারকে স্মরণ করাইতে ভুলে না—

শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়। 'কূর্ম্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে উঠে, বর্ম্মের বদলে বেরিয়ে পড়ে দন্ত, ধৈর্য্যের বদলে গোঁ'। বিশু যেন বলিতে চাহে—যে শ্রমিকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, সমাজকে ধারণ করিয়া আছে, ভোজ্য ও ভোগ্য যোগাইয়া থাকে, তাহারা কি চিরকালই 'কূর্ম্ম' হইয়া থাকিবে? তাহা নহে। প্রাণের স্পন্দন জাগিলেই তাহারা বিদ্রোহ করিবে।

এখানেই বিশু চন্দ্রাকে জানায়—'ওরা ঠিক করেছে এবার থেকে এখানে কারিগরের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা আসতে পারবে না' অর্থাৎ নারীর প্রেমের স্পর্শ হইতেও শ্রমিকদের দূরে রাখিবার, প্রাণকে একেবারে পিষিয়া মারিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছে। বিশু নন্দিনীর ডাক শুনে—চন্দ্রা জানিতে চায়— 'কোন্ সুখে ও তোমাকে ভুলিয়েছে' বিশু চন্দ্রাকে বুঝায়—যে দুঃখকে ভোলার মত দুঃখ আর নাই। সেই দুঃখেই নন্দিনী তাহাকে ভুলাইয়াছে। এই দুঃখ 'দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে-দুঃখ সেই দুঃখ, নন্দিনীর মধ্যে 'সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটির প্রকাশ!' চন্দ্রা এ সব নিগূঢ় তত্ত্ব না বুঝিলেও অভিজ্ঞতা হইতে এইটুকু বুঝিয়াছে—"যে মেয়েকে তোমরা যত কম বোঝ, সেই তোমাদের তত বেশী টানে।"

নন্দিনী আসে বিশুর কাছে। বিশু উপলব্ধি করে—"আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে।" নন্দিনীর কাছে সে প্রকাশ করে—"তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দূতী"; নন্দিনীও প্রকাশ করে, রঞ্জন কি ভাবে তাহাকে জিতিয়া লইয়াছে। রঞ্জন "প্রাণ নিয়ে সর্ব্বস্ব পণ করে…হারজিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই… জিতে নিয়েছে।"

বিশুর ইতিহাসও জানা যায়—বিশুও একদিন প্রাণ লইয়া সর্ব্বস্ব পণ করিয়া হারজিতের খেলা খেলিত, কিন্তু কী মনে

করিয়া প্রাণের সহজ সাধনার ভিড় থেকে একলা বাহির হইয়া গিয়াছিল। বিশুর তরী হাওয়ায় হাওয়ায় 'অচেনার ধারে' যাইয়া উপস্থিত, আবার সেখান হইতে, একটি মেয়ের আকর্ষণে বাঁধা পড়িয়া বিশু যক্ষপুরীতে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বিশুর সোনার শিকল ভাঙিবেই—সঙ্কল্প করে নন্দিনী। আর নন্দিনী রাজার ঘরের ভিতরে যাইয়া যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাও ব্যক্ত করে। রাজা সব কিছুকেই স্পষ্টভাবে জানিতে চায়। যাহা সে বুঝিতে পারে না তাহা উহার মনকে ব্যাকুল করে। বিশুর কথায় সর্দারকেও চেনা যায়। সর্দার—'প্রাণকে শাসন করবার জন্যেই প্রাণ দিয়েছে দুর্ভাগা।'

সর্দারও প্রবেশ করেন। বিশু স্পষ্ট ভাষায় সর্দারের মুখের পরেই বলে—"তোমাদের দুর্গ থেকে কী করে বেরিয়ে আসা যায় পরামর্শ করছি"। সর্দার বিস্মিত। নন্দিনী সর্দারকে রঞ্জনকে আনিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দেয়। সর্দার বলে—'আজই তাকে দেখতে পাবে।'

নন্দিনী রাজাকে ডাকে—অনুরোধ করে—"ঘরের মধ্যে যেতে দাও, অনেক কথা আছে।" রাজা বলেন, 'এখনও সময় হয়নি।'

নন্দিনীর সাথী বিশু—সে গান গায়। রাজা সহিতে পারেন না সাথীকে, তাহার কোন সঙ্গী নাই যে। রাজা আজ যেন শুধু টিকিয়া থাকিতেই চাহেন না, বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন, তাই তিন-হাজার-বছর-টিকিয়া-থাকা মরা ব্যাঙটাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। রাজা রঞ্জন ও নন্দিনীকে একসঙ্গে দেখিতে চাহেন—ঘরের ভিতরে অর্থাৎ ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনিয়া জানিতে চাহেন। নন্দিনী রাজাকে বুঝাইতে চাহে, এমন কিছু আছে যাহাকে মন দিয়া জানা যায় না, শুধু প্রাণ দিয়াই উপলব্ধি করা যায়। রাজার

ঠকিবার ভয়—যাহা জানার গণ্ডীর বাহিরে, তাহাকে বিশ্বাস করিতে তাহার সাহস হয় না। তবু রাজা রক্তকরবীর গুচ্ছটা চাহেন, না চাহিয়া পারেন না। না-পাওয়া সৌন্দর্য্যকে ছিঁড়িয়া নষ্ট করিবার ইচ্ছা জাগে, আবার পাওয়ার আশায় ইচ্ছাটা স্থগিত থাকে। রাজা নন্দিনীকে ভয় দেখান, রঞ্জনকে দলিয়া ধুলোর সঙ্গে মিলাইয়া দিলে কী হইবে। ভয়ংকর সাজিবার মোহ তাহার সমান বলবান। নন্দিনী স্পষ্টভাষায় রাজ-মহিমাকে বিশ্লেষণ করে, প্রমাণ করে যে, যাহারা ভয় দেখাবার ব্যবসা করে, সেই সব লোকই জাল দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়া রাজাকে অদ্ভুত সাজাইয়া রাখিয়াছে, রাজা একটা 'জুজুর পুতুল' মাত্র। নন্দিনী রাজাকে বুঝাইয়া দেয়, ভয় দেখাইয়া রাজ-মহিমা রাখা অসম্ভব। বলে—"এতদিন যাদের ভয় দেখিয়ে এসেছ, তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা করবে।" সে যেন বলিতে চাহে—ভয় দেখাইয়া, নিষ্ঠুরতা করিয়া রাজ-মহিমা অক্ষুন্ন রাখা অসম্ভব। যখনই ভয়ার্ত্তদের মধ্যে—নিপীড়িতদের প্রাণ জাগিয়া উঠিবে, তখনই রাজ-মহিমার অবসান ঘটিবেই ঘটিবে। নন্দিনীর কথা শুনিয়া রাজা রাজ-অহংকারে গর্জ্জন করিয়া উঠেন—তিনি যে কী নিষ্ঠুর তাহার সমস্ত প্রমাণ নন্দিনীর কাছে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতে তাহার ইচ্ছা জাগে! নন্দিনী চলিয়া যাইতে উদ্যত হয়। রাজার দীন-আত্মা ঐকান্তিক ব্যাকুলতা লইয়া ডাকে—'নন্দিনী'! নন্দিনী গান গাহে, কিন্তু রাজার বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙটা সকল রকম সুরের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া আছে, "গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছা করে" বলিয়া, রাজা পলাইয়া যান। নন্দিনী বিশুকে জানায়—'আজ নিশ্চয় রঞ্জন আসবে'। বিশু নন্দিনীর অনুরোধে—'পথচাওয়ার গান' গায়।

সর্দ্দার ও মোড়ল সঙ্কল্প আঁটে—"রঞ্জনকে কিছুতে আসতে দেওয়া

চলবে না।" রঞ্জনকে লইয়া বড় মুসকিল—সে হুকুম মানিতে চাহে না—'মানুষটার ভয় ডর কিছুই নেই', সে কাজের রশি খুলিয়া দিয়া কাজকে নাচিয়া চালাইতে চায়। রঞ্জন বাঁধনের বশ নহে, কথায় কথায় সাজ বদল করে, চেহারা বদল করে।

ছোট সর্দ্দার প্রবেশ করে—রঞ্জনকে বাঁধিতে চলে। সে ইহাও জানায় যে, মেজো সর্দ্দারের মনে রঞ্জনের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। সর্দ্দার রঞ্জনকে রাজার ঘরে পাঠাইবার আদেশ করে—নিজেও চলে।

এইবার দেখা দেন অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশ। অধ্যাপক রাজার অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপটি খুলিয়া বলেন এবং আভাস দেন—রাজা জ্ঞান-যোগের পর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছেন! রাজার কথা—জ্ঞান-যোগীর অশান্ত প্রশ্ন—"তোমার বিদ্যে তো সিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আর একটা দেয়াল বের করেছে, কিন্তু প্রাণ পুরুষের অন্দরমহল কোথায়?" সেই জন্যই এই প্রশ্নের পাশ কাটাইতেই অধ্যাপক পুরাণবাগীশকে আনিয়াছে ; উদ্দেশ্য—"ওকে পুরাণ আলোচনায় ভুলিয়ে রাখা যাক।" বস্তুতত্ত্ববিদ্যা বুদ্ধির গবাক্ষলণ্ঠনের আলোকে জগতকে অংশে-অংশে আলোকিত করে, কিন্তু যাহা কেবল অনুভবগম্য তাহাকে বুদ্ধি-যোগে পাওয়া যায় না বলিয়াই বস্তুতত্ত্ব-বিদ্যা সীমাবদ্ধ। অধ্যাপককে নন্দিনী তাই আকর্ষণ করে—প্রাণের টান জাগাইয়া তুলে, ফলে তাহার পাকা হাড়েও ঠোকাঠুকি বাধে—তাহার বস্তুতত্ত্ব ধানীরঙের দিকে একটানা ছুটিয়া চলে। রাজা অধ্যাপককে যেমন সহিতে পারেন না, পুরাণবাগীশকেও তাহার ভালো লাগে না। সর্দ্দার জানায়—'রাজা বলে পুরাণ বলে কিছু নেই, বর্ত্তমানটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চলেছে।'

এমন সময় নন্দিনী দ্রুত প্রবেশ করে—চোখের সম্মুখে ভয়ানক দৃশ্য—মনে হয় যেন প্রেতপুরীর দরজা খুলিয়া গিয়াছে। প্রহরীদের

সঙ্গে রাজার এঁটো—মাংস-মজ্জা-মন-প্রাণ-হীন কতকগুলি একদা-মানুষ কোথায় যেন যায় নন্দিনী দেখে—অনুপ আর উপমন্যু যে—ওই-যে শকলু তলোয়ার খেলোয়াড় — আখের-মত-চিবিয়ে-ফেলা কঙ্কু। নন্দিনী হতাশায় হাহাকার করে—"গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল।" অধ্যাপকের মনে পড়ে—"বড় হবার তত্ত্ব।" নন্দিনীকে বুঝায় – সেই অদ্ভুত শক্তির রাজা যাহার জমা, এই সকল কিম্ভূত তাহার খরচ। "ওই ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই, আর ওই বুড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা।" নন্দিনী এই ব্যবস্থাকে 'রাক্ষসের তত্ত্ব' বলিয়া ধিক্কার দেয়। কিন্তু অধ্যাপক তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিতে দেখেন—"যেটা হয় সেটা হয়, তার বিরুদ্ধে যাও তো হওয়ারই বিরুদ্ধে যাবে।" নন্দিনী এই 'হওয়া'কে ধিক্কার দেয়—রাস্তার সন্ধান জানিতে চায়। অধ্যাপকের ধারণা—রাস্তা দেখাবার দিন এলে এরাই দেখাবে। অধ্যাপক বোধ হয় এই কথাই বলিতে চাহে যে, সর্ব্বহারাদের, শোষিতদের মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগিলে, তাহারাই পথ কাটিয়া বাহির করিবে। নন্দিনী অস্থির উৎকণ্ঠায় রাজাকে ডাকে; কিন্তু রাজার সাড়া পাওয়া যায় না—'ভিতরকার কপাট পড়ে গেছে'। নন্দিনীর ভয় করে। রঞ্জনকে চিনাইয়া দিবার জন্য বিশু গিয়াছে কখন, এখনও যে সে আসে না। একদা-পালোয়ান গজ্জুর আর্ত্তনাদ শোনা যায়। অধ্যাপক গজ্জুকে গোড়াতেই সাবধান করিয়াছিলেন 'এ রাজ্যে সুড়ঙ্গ খুদতে চাও তো এসো, মরতে-মরতেও কিছুদিন 'বেঁচে থাকবে'...এ বড়ো কঠিন জায়গা'। অধ্যাপক যক্ষপুরীর সমাজের প্রবৃত্তিটিও প্রকাশ করেন—'ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে।' নন্দিনী 'শুধু থাকা'কে ধিক্কার দেয়, বলে 'মানুষ হয়ে থাকবার জন্যে যদি মরতেই হয়, তাতেই বা দোষ কী!' অধ্যাপকও

বলেন, "থাকবার জন্তে মরতে হবে এ কথা যারা বলে তারাই থাকে।"

প্রবেশ করে পালোয়ান। সব পালোয়ানি নিঃশেষ, অথচ বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখতেই পাবে না। পালোয়ান সর্দ্দারের পরে আক্রোশ প্রকাশ করে, সর্দ্দারের অভিসন্ধি ব্যক্ত করে: "সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশক্তি করতে পারলে তবে ওরা নিশ্চিন্ত হয়"। নন্দিনীর প্রশ্নে সর্দ্দার নিজের অবস্থা, শোষণের অবস্থা জানায়— "ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে……শুধু জোর নয় একেবারে ভরসা পর্য্যন্ত শুষে নেয়!" নন্দিনী পালোয়ানকে বাসায় লইয়া যাইতে চাহে, কিন্তু সতর্ক অধ্যাপক সাহস করেন না—রাজদ্রোহের অপরাধের আশঙ্কা করেন। সর্দ্দারকে দেখিতে পাইয়াই অধ্যাপক প্রস্থান করেন, তবে যাইবার সময় সর্দ্দারের মনটাকেও বিশ্লেষণ করিয়া যান, 'তুমি ভিতরে ভিতরে ওর মনের তারে টান লাগিয়েছ, যতই স্বর মিলছে না, ততই কড়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠছে।'

সর্দ্দার ও গোঁসাই প্রবেশ করেন। নন্দিনী পালোয়ানের একটা ব্যবস্থা করিতে গোঁসাইকে অনুরোধ করে। গোঁসাই মনতত্ত্বে মানুষের প্রাণের মর্য্যাদা কতটুকু চমৎকারভাবে তাহা বুঝান —'যে-পরিমাণ বাঁচা দরকার ……সর্দ্দার নিশ্চয় ওকে সেই পরিমাণেই বাঁচিয়ে রাখবে।' আর সঙ্গে সঙ্গে শোষক শ্রেণীর অভিপ্রায় ও ভণ্ডামির আবরণটাও আলোকিত করেন—"আমাদের শ্রেণীর লোকের পরে ভগবান দুঃসহ দায়িত্ব চাপিয়েছেন, সেটা বহন করতে গেলে আমাদের ভাগে প্রাণের সারাংশ অনেকটা বেশী পরিমাণে পড়া চাই। ওদের খুব কম বাঁচলেও চলে, কেননা ওদের ভার লাঘবের জন্তে আমরাই বাঁচি।" আশ্চর্য্য! 'নন্দিনীর সাহায্য লইতে পালোয়ানও ভয় পায়। 'সর্দ্দার রাগ করবে' এই ভয়ে পালোয়ান

হ্-ক্ষ পাড়ার মোড়লের ঘরে চলিয়া যায়—নন্দিনীর উপকারের হাতখানাও এড়াইতে চায়। নন্দিনী সর্দ্দারকে বিশু পাগলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করে—গোঁসাই বলেন, 'যেখানে যাক সবই ভালোর জন্যে।' নন্দিনী গোঁসাইয়ের জপমালা ধরিয়া টান দেয়—গোঁসাই অগত্যা প্রস্থান করেন। সর্দ্দার উত্তর করে—'তাকে বিচারশালায় ডেকেছে'…। "সর্দ্দার ইহাও ঘোষণা করে—"আগে কাকে টানবে তারপরে, শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে আমাতে। বেশি দেরি নেই।" সর্দ্দার রঞ্জনের সঙ্গে নন্দিনীর মিলন কিছুতেই ঘটিতে দিবে না।

কিশোর আসিয়া সংবাদ দেয়—বিশুর সঙ্গে দেখা হবে। বিশুকে দেখাও যায়—তাহার হাতে হাতকড়ি। বিশু বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করে।—সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি—এ বন্ধন তারি সত্য সাক্ষী……রঞ্জনের সঙ্গে মিলনের কামনা জানাইয়া বিশু নন্দিনীর নিকট বিদায় লয়।

চিকিৎসক এবং সর্দ্দার আসিয়া যথাক্রমে রাজার ভিতরকার এবং বাহিরকার সংবাদ জানায়। 'ব্রত' পাড়ার মোড়ল আসে—ধামা-ধরা—পদলেহী রাজসেবক মেজো সর্দ্দার আসিয়া অনেক বিষয়ে 'কিন্তু' তুলে—সর্দ্দারের মত রাজাকে ঠকানো সে কর্ত্তব্য মনে করে না, কেনারাম গোঁসাইকে সে নামাবলী ভেদ করিয়াই চিনিয়াছে—কেনারাম নাকি একপিঠে গোঁসাই, একপিঠে সর্দ্দার। সর্দ্দার বুঝিতে পারে—মেজো সর্দ্দারের রক্তের সঙ্গে সর্দ্দারির মিল হয় নাই এবং তাহার চোখে নন্দিনীর ঘোর লাগিয়াছে। কিন্তু মেজো সর্দ্দারও সর্দ্দারকে নিজের চেহারা দেখিতে বলে, কারণ তাহার চোখেও কর্ত্তব্যের রঙের সঙ্গে রক্তকরবীর রঙ কিছু যেন মিশিয়াছে। সর্দ্দার ভাবে—'মনের কথা মন নিজেও জানে না।'

নন্দিনী প্রবেশ করে—চারিদিকে তাহার সিঁদুরে মেঘের রঙীন আভা। মনে হয়—"ওই-কি আমাদের মিলনের রঙ।" নন্দিনী রাজাকে ডাকে—'শোনো, শোনো, শোনো'। গোঁসাই আসিয়া অযাচিত ভাবে নন্দিনীর মঙ্গল চিন্তা করিতে দাঁড়ান। নন্দিনীকে ঠাকুরঘরে লইয়া যাইয়া নাম শোনাইতে চাহেন। নন্দিনী শুধু নাম লইয়া সন্তুষ্ট হইতে চাহে না। শুধু নাম লওয়ার শান্তিকে সে ধিক্কার দেয়। নন্দিনী গোঁসাইকেও ধিক্কার দেয়—'যাও, যাও, যাও। মানুষের প্রাণ ছিঁড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যবসা তোমার।"

প্রবেশ করে ফাগুলাল ও চন্দ্রা—বিশুকে হারাইয়া তাহারা আত্মহারা। ফাগুলালের নন্দিনীকে আজ কেমনতর ঠেকিতেছে, চন্দ্রা তো তাহাকে রাক্ষসী মনে করে, ভর্ৎসনাও করে—সর্বনাশী বলিয়া। নন্দিনীর এক কথা—ও মুক্তি চায়, বিশুর কথাও বলে—'বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবে মুক্তি'। ফাগুলাল প্রতিজ্ঞা করে—'বন্দীশালা চুরমার করে ভাঙব'। নন্দিনীও ফাগুলালের সঙ্গে যাইতে চাহে। এই সময় গোকুল আসে—ডাইনীকে—নন্দিনীকে পোড়াইয়া মারিবার সঙ্কল্প লইয়া। ফাগুলালের সহিত গোকুলের বচসা হয়। গোকুল 'মিষ্টিমুখী সুন্দরী' অপেক্ষা সহজ শত্রু সর্দারকে বেশী শ্রদ্ধা করিতে চাহে। নন্দিনী বুঝাইয়া দেয়—যে দাস সে কখনও শ্রদ্ধা করিতে পারে না। ফাগুলাল গোকুলকে পৌরুষ দেখাইতে চলে, কিন্তু বালিকার কাছে নহে।

নন্দিনী রঞ্জনের খোঁজে ব্যাকুল। দলের পর দল ধ্বজাপূজায় যায়, আর নন্দিনী জিজ্ঞাসা করে—'রঞ্জনকে দেখেছ'। কেহই বলিতে পারে না। শুধু একজন বলে 'ধ্বজাপূজায় রাজাকে বেরোতেই হবে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো'।

নন্দিনী রাজাকে ডাকে—'সময় হয়েছে দরজা খোলো'। রাজা

ধ্বজাপূজার দিনে মন বিক্ষিপ্ত করিতে নিষেধ করেন, নন্দিনী নিষেধ মানে না, নন্দিনীর প্রতিজ্ঞা 'মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।' রাজা, বলেন 'এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে'। নন্দিনীও অটল—'বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না'।

রাজা দরজা খুলেন, তখনই নন্দিনী দেখে কে যেন পড়িয়া। রঞ্জনই পড়িয়া আছে। রাজা দেখেন তাহার নিজের যন্ত্রই তাহাকে মানে না। সর্দ্দারকে বাঁধিয়া আনিবার আদেশ দেন। নন্দিনী কাঁদে—'আমি সইতে পারছিনে, কেন এমন সর্ব্বনাশ করলে'। রাজা অনুতপ্ত মরা-যৌবনের অভিশাপে অভিশপ্ত। নন্দিনী রঞ্জনের চূড়ায় নীলকণ্ঠ পাখীর পালক পরাইয়া দেয়, আক্ষেপোক্তি করে 'তোমার জয়যাত্রা আজ থেকে শুরু হ'য়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি।" নন্দিনী রাজার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করে। মৃত্যুকেই নন্দিনী বড় অস্ত্র মনে করে: মনে করে, তারপর থেকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে 'আমার সেই মরা তোমাকে মারবে।'

রাজার পরিবর্ত্তন ঘটে। নন্দিনীর সাথী হইয়া নিজের বিরুদ্ধেই নিজে লড়াই করিতে প্রস্তুত হন। নিজের ধ্বজা নিজেই ভাঙ্গিয়া ফেলেন। সমস্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে রাজা হাতে হাত রাখেন। নিজের বন্দীশালা নিজেই ভাঙিতে ছুটেন। রাজা জানেন সর্দ্দার-দের সঙ্গেই শেষপর্য্যন্ত লড়িতে হইবে। নিজের সৈন্যশক্তির সঙ্গেই একলা যুদ্ধ করিতে হইবে। জিতিতে না পারিলেও মরিয়া বাঁচিতে পারিবেন। এতদিনে মরিবার অর্থ দেখিতে পাইয়াই তিনি বাঁচিয়াছেন। রাজা দেখেন সর্দ্দার রাজশক্তি দিয়াই রাজাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। রাজা নন্দিনীর পিছনেই যাত্রা করেন। অধ্যাপকও ছুটিয়া আসেন রাজা চরমপ্রাণের সন্ধান পাইয়াছেন শুনিয়া। নন্দিনীকে ধরিতে অধ্যাপকও ছুটিয়া যান।

বিশু আসিয়া নন্দিনীর খোঁজ করে। কাস্তলাল বলে, নন্দিনী 'শেষমুক্তিতে' আগাইয়া গিয়াছে। বিশু কাস্তলাল নন্দিনীর জয়ধ্বনি করিয়া লড়াই করিতে ছুটে। বিশু "রক্তকবরীর কঙ্কন"—বিদ্রোহের রক্তপতাকা ধূলা—হইতে কুড়াইয়া মাথায় তুলিয়া লয়।

নাটকের ভাব-সত্য

উল্লিখিত কাহিনী-রূপরেখা হইতে নাটকের ভাব-সত্তাটি উদ্ধার করিতে যাইয়া প্রথমেই এই কথাটি মনে আসে যে, নাটকখানি নানা ভাব-ব্যঞ্জনার সমবায়ে রচিত। তবে মুখ্য রূপে যে আধ্যাত্মিক ভাবকেই ব্যঞ্জিত করা হইয়াছে সে ভাবটি এই যে, কেবলমাত্র অন্নময় কোষেই জীবাত্মা গঠিত নহে, তাহার মধ্যে যে আনন্দময়-কোষ আছে সেই কোষের প্রেরণাতেই মানুষ আনন্দ চাহে, কারণ আনন্দ-সত্তার মধ্যেই মানুষের সম্পূর্ণতার পরিচয়, মুক্তির অনুভূতি। তাই আনন্দেই মুক্তি এবং মুক্তিতেই আনন্দ। প্রাণের সাধনা যখন আনন্দের লক্ষ্যে না যাইয়া, শক্তির লক্ষ্যে নিবদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন সে হয় বিকৃত, নিজের শক্তির অহংকারের কারাগারে নিজেই হয় আবদ্ধ, আর প্রাণের সাধনা যখন আনন্দের অভিমুখে ধাবিত হয়, মুক্তির লক্ষ্যে একাগ্র-আগ্রহে ছুটিয়া চলে, তখনই প্রাণের সাধনা হয় সার্থক---নির্বিরোধ মুক্তিতে সে হয় মহিমময়, সে হয় 'রঞ্জন'। আনন্দময় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই। নিছক প্রাণময়-কোষের ভূমিতে দাঁড়াইয়া রাজা শক্তির স্তূপের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া চলে, আনন্দ পায় না, চির অশান্ত।

বিজ্ঞানময়-কোষের ভূমিতে অধ্যাপক অনেক কিছু জানেন, কিন্তু অন্তরাত্মা অপরিতৃপ্ত। অপরিপূর্ণতায় শূন্যতা ইহাদের সকলের

মধ্যেই অতৃপ্তির বেদনা হইয়া বাজে, আনন্দময়-কোষে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বাসনা মর্ম্মদাহিনী হইয়া দেখা দেয়। নন্দিনীকে পাওয়ার কামনাই, মোহই শেষ পর্য্যন্ত মুক্তিরূপে ফলিয়া উঠে। নন্দিনীই তাহাদের রাসেশ্বরী হ্লাদিনী-সত্তা। নন্দিনীকে পাইয়াই ইহারা প্রকৃতিস্থ হয়, স্বরূপে অবস্থান করে।

এই আনন্দ-সত্তাকে, অন্তরাত্মাকে, বস্তু-সত্তা নানাভাবে বাঁধিতে চাহে। তাই জীবাত্মার মধ্যে সর্ব্বদাই এই দ্বন্দ্ব বস্তু-সত্তার সহিত আনন্দ-সত্তার দ্বন্দ্ব। বস্তু-সত্তা তাহার শক্তিবলে আনন্দ-সত্তাকে সাময়িকভাবে পরাজিত না করিতে পারে এমন নহে, আনন্দের সঙ্গ হইতে প্রাণকে বঞ্চিতও করিতে পারে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আনন্দ-সত্তারই জয় হয়, প্রাণের সহিত আনন্দের সম্মিলন ঘটে, বস্তুর বন্ধন কাটাইয়া প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া আত্মা আনন্দ-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। নন্দিনীই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। অন্তরাত্মার মুক্তিই নন্দিনীর জয়।

এই ভাবটিকেই নাটকে প্রধানভাবে রূপ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাই নাটকের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব—কেন্দ্রীয় তত্ত্ব।

আর এই প্রধান তত্ত্বটিকে যে সামাজিক পরিবেশের কাল্পনিক আবরণে রূপ দেওয়া হইয়াছে, সেই আবরণটি নাটকের উপতত্ত্ব—বলা যাক্, সামাজিক তত্ত্ব। এই সমাজ ধনতন্ত্রের উৎকট এবং অন্তিম রূপের সমাজ; রাজ-শক্তি, মুষ্টিমেয় বহুসংগ্রহী এবং বহুগ্রাসী সর্দ্দারের শক্তি-জালের অন্তরালে এবং আত্মদ্বন্দ্বে অশান্ত। অষ্টপাশী শোষণে সকলেই নিষ্প্রাণ—জীবন আনন্দশূন্য; মানুষের মর্য্যাদা কেবল বস্তু সংগ্রহে অংশ গ্রহণের মর্য্যাদা,—মানুষ সংখ্যায় পরিণত। জীবনে তাহাদের "ঠাস দাসত্ব"; এই যক্ষপুরীতে সারাদিন রাত একটি কাজ —বস্তু সংগ্রহের কাজ—সোনার তাল খোড়ার কাজ। অবিশ্রাম পরিশ্রমে শ্রমিকরা এখানে—"মাংস-মজ্জা-মন-প্রাণ"-শূন্য। কাজের

ফাঁকে যে অবসন্ন অবসরটুকু পায়, শ্রমিকরা তাহা মদ খাইয়া কাটায়। 'এখানে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই! এখানে মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির গায়ে গায়ে। শোষণে শোষণে এখানকার মানুষ দেহে-মনে নিঃস্ব—ইহাদের ভিতরটা একেবারে ফাঁপা—ইহাদের শুধু জোরই যায় নাই, ভরসা পর্য্যন্তও গিয়াছে।

এই শোষণ-ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার জন্য, সর্দ্দারগণ শুধু ফৌজ রাখিয়াই সন্তুষ্ট নহে, যাহাতে কোনরূপ উত্তেজনা কাহারো মধ্যে না আসে, সেই জন্য কেনারাম গোঁসাইয়ের মত ভাড়াটিয়া প্রচারকও নিযুক্ত রাখে।

ইহারা শাস্ত্রের বিকৃত ভাষ্য করিয়া, শোষণকে শাসন বলিয়া চালাইতে চাহে—কায়েমী স্বার্থের গুণগান করে এবং শ্রমিকদের মানসিক উত্তেজনাকে পরলোকের ভয় বা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া প্রশমিত করিতে চাহে। এই ব্যবস্থায় ধন জমা হয় মুষ্টিমেয় সর্দ্দারগণের হাতে আর জনসাধারণ হয় সর্ব্বহারা—দেহে-মনে সর্ব্বতোভাবে নিঃস্ব।

কিন্তু এই শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে প্রাণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে; মুক্তির আনন্দের সহজ আকর্ষণে প্রাণে সাড়া জাগে—প্রাণ উপলব্ধি করে—"বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবে মুক্তি।" এই উপলব্ধিতেই বিক্ষুব্ধ প্রাণ প্রতিকার করিতে সম্মিলিত হয়। শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শক্তি লইয়া দাঁড়ায়। বন্দীশালা চুরমার করিয়া ভাঙ্গিতে যায়—বিদ্রোহ ঘোষণা করে। গণ-শক্তির বিদ্রোহের সঙ্গে অব্যক্ত রাজ-শক্তি (রাজশক্তি স্বরূপতঃ অব্যক্ত, সরকার-রূপে ব্যক্ত) আসিয়া হাত মিলায় অর্থাৎ রাজ শক্তিতে গণশক্তিতে তখন কোন বিরোধ থাকে না—পার্থক্য থাকে না; আর ইহাদের সংগ্রাম বাধে সর্দ্দার-সরকারের সঙ্গে—কায়েমী

স্বার্থের সংরক্ষকদের সঙ্গে। প্রাণের পর প্রাণ বিসর্জন দিয়া গণশক্তি জয়ী হয়—রক্তকরবীর লাল-পতাকা উড়ে হাতে হাতে। প্রাণের মুক্তিকে অস্বীকার করিয়া—প্রাণের দাবী অস্বীকার করিয়া—প্রাণকে পীড়িত করিয়া কোন শাসনতন্ত্রই টিকিতে পারে না। এই সত্যের ব্যঞ্জনা নাটকের উপতত্ত্ব বা সামাজিক তত্ত্ব। *

নাটকের "ভাব"রাজি

(ক) আনন্দেই মুক্তি—মুক্তিতেই আনন্দ, সহজই সুন্দর।

(খ) আনন্দের কামনা—মুক্তির বাসনা আত্মার স্বভাবের মধ্যেই আছে। অন্নময়কোষ দেয় কাজের প্রেরণা আর আনন্দময়-কোষ দেয় ছুটির প্রেরণা। এই দুইয়েরই দাবী যেখানে সমানভাবে মিটে না, সেখানেই দ্বন্দ্ব, সেখানেই বিরোধ ও অশান্তি।

(গ) যে সমাজ-ব্যবস্থায় প্রাণের দাবী—প্রাণের মুক্তি অস্বীকৃত, সে সমাজ-ব্যবস্থা নিজের অত্যাচার দিয়াই আপনার বিনাশের পথ প্রস্তুত করে। 'শক্তির ভার নিজের অগোচরে......নিজেকেই পিষে ফেলে!'

*এই প্রসঙ্গেই বলা উচিত যে, রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে ধনতন্ত্র ও বস্তুতন্ত্রকে এক বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, ধনতন্ত্রে এবং বস্তুতন্ত্রে প্রাণের মুক্তি অস্বীকৃত এবং অস্বীকৃত বলিয়াই উহারা অগ্রাহ্য। এই তন্ত্রে প্রাণের স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশ ঘটিতে পারে না এবং পারে না বলিয়াই প্রাণ সংহত শক্তি লইয়া ফিরিয়া দাঁড়ায় এবং উহার অবসান ঘটায়। নিষ্পীড়িত প্রাণই বিদ্রোহের পথে—প্রাণের বিনিময়েও মুক্তি উদ্ধার করে।

আরো একটি কথা মনে রাখিবার—এবং কথাটি এই যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই ধারণাই কাজ করিয়াছে যে রাজা এক হিসাবে নৈর্ব্যক্তিক, রাজ-শক্তিমাত্র (এই জন্যেই রাজা জালের আড়ালে—নেপথ্যে), রাজ-শক্তির ব্যক্ত রূপ সরকার (গভর্ণমেণ্ট)—এখানে সর্দার। এই সরকারের রূপেই রাজার রূপ প্রতিভাসিত এবং সরকারই রাজার শক্তি-রূপ। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত প্রজা-শক্তির সহিত রাজশক্তিকে মিলাইয়া দিয়া—সর্দারদিগকেই প্রতিপক্ষ রূপে দাঁড় করাইয়াছেন এবং এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, রাজ-শক্তির সহিত প্রজাশক্তির মৌলিক বিরোধ নাই,—আসল বিরোধ সর্দার-সরকারের সঙ্গে।

(ঘ) ধনতন্ত্রে মানুষ অমানুষ হইয়া যায়। যাহারা শোষণকারী এবং যাহারা শোষিত উভয়ই মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলে।

(ঙ) ধনতন্ত্র ছলে বলে কৌশলে আপনার কায়েমী স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জাগ্রত জন-শক্তির কাছে পরাভব স্বীকার না করিয়া উপায় থাকে না।

(চ) ধনতন্ত্রের উদ্দেশ্য—অর্থের শক্তি দিয়া পৃথিবীকে বশীভূত করা। এই কারণেই শোষণ, বিনাশন—রণ তাহার প্রকৃতিগত। ক্রোধ-সন্দেহ-ভয়, খুনোখুনি, কাড়াকাড়ি ইহার অনিবার্য্য ফল।

(ছ) সৌন্দর্য্যকে-আনন্দকে জানা যায় না, অনুভব করিতে হয়। —দরকারের বাঁধনে উহাদের বাঁধা যায় না। শক্তির আকর্ষণে উহাদের পাওয়া যায় না—সহজ আকর্ষণেই উহারা ধরা দেয়। "আর সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না"।

(জ) 'এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মত দুঃখ নেই।'

(ঝ) মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করে…। প্রাণকে শাসন করিবার জন্যেই প্রাণ দিয়া বসে।

(ঞ) ভেঙে ফেলাও খুব একরকম করে পাওয়া।

(ট) গাম্ভীর্য্য নির্ব্বোধের মুখোস।

(ঠ) বস্তুতত্ত্ববিদ্যা অনেক কিছুই জানাইতে পারে কিন্তু প্রাণ-পুরুষের অন্দরমহলের পরিচয় দিতে পারে না।

(ড) 'ছোটগুলো হতে থাকে ছাই আর বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।'

(ঢ) শোষণের মার এমন মার যে 'বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখতেই পাবে না'।

(ণ) বড়োলোক বড়ো শিশু, খেলা করে। একটা খেলায় যখন

বিরক্ত হয়, তখন আরেকটা খেলা না জোগাইয়া দিলে নিজের খেলনা ভাঙে।

(ত) যে দাস সে কখনো শ্রদ্ধা করিতে পারে না।

(থ) তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়।

(দ) "কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে, কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজার করে দিচ্ছে"।

(ধ) পুরুষের জীবনে নারীর স্বপ্নের বাসনার প্রভাব অসামান্য। পুরুষ নিজের পুরুষকারকে তুলিয়া ধরিতে চাহে নারীর বাসনাকে প্রাণপণে পূরণ করিয়া; তাই নারী যখন সোনার স্বপ্ন দেখে, পুরুষ তখন সোনার খাদে যাইয়া নামে—যন্ত্রদানবের হাতে ধরা দেয়। অতএব পুরুষের দাসত্বের মূলে নারীর স্বপ্নের প্রেরণা কম কাজ করে না। (বিশুর কথা—'তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে-ভিতরে ওকে চাবুক মারে; সে চাবুক সর্দ্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া')।

এইবার, আমরা রবীন্দ্রনাথের, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের এবং অজিতবাবুর মন্তব্য সম্বন্ধে সামান্যভাবে দুই একটি কথা বলিতে চেষ্টা করি—

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ নাটকখানির সামাজিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ নহে—দিগ্‌দর্শন মাত্র। দ্বিতীয়তঃ নারী-মাহাত্ম্যের দৃষ্টিকোণ হইতে তত্ত্বটিকে দেখিতে যাইয়া, রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। "নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্ত্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তাহলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে"—নাটক-বর্ণিত বিষয়ের সহিত এই উক্তির পূর্ণসঙ্গতি পাওয়া যায় না। তারপর নারী যে যক্ষপুরীতে মোটেই ছিল

না এমন নহে, চন্দ্রা ছিল, সর্দারণীরাও নেপথ্যে ছিলেন,— অতএব 'এমন সময়ে সেখানে নারী এল…নন্দিনী এল'…কথাটি সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না।

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের ভাব-বিশ্লেষণে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিন্যাস পাওয়া যায় না। ডাঃ রায়ের মধ্যে প্রত্যেকটি ঘটনার তাৎপর্য্যকে অনুধাবন করিবার চেষ্টা দেখা যায় না। রাজার ভাবান্তর, সর্দ্দারের সহিত রাজার দ্বন্দ্ব, রাজাকে দেখিয়া নন্দিনী "কেন মুগ্ধ" হয়—এই সব বিশেষ বিশেষ স্থলের ব্যাখ্যা ডাঃ রায়ের বিশ্লেষণ হইতে পাওয়া যায় না। বন্ধুবর অজিত-বাবুর বিশ্লেষণ সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। অজিতবাবু রাজাকে চিনিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। নাটকখানির ব্যঞ্জনা-বর্ণালীর সমগ্র প্রকাশ অজিতবাবুর বিশ্লেষণে দেখা যায় না।

রক্তকরবীর 'নাটকত্ব'

নাটকখানির রস-নিরূপণ-কালে ইহার রসাত্মকতার পরিমাণ সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে যেমন ঘটনা-সংস্থানের আকস্মিকতা-জনিত চমৎকারিত্ব, এবং কাহিনী-কৌতূহল নাই, তেমনি ইহাতে আবেগ-অনুভাবাদিও সংলক্ষ্য হইয়া উঠে নাই। রাজা ছাড়া, অন্য কোন চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশেষ অস্তিত্ব দেখা যায় না। মোটকথা, অনুভাব অপেক্ষা ভাবই প্রধান হইয়া আছে। ভাবকে উপস্থাপিত করা বিশেষ লক্ষ্য হওয়ায়, অনুভাবের অভিব্যক্তি এবং একতানতা উপেক্ষিত হইয়াছে। এই কারণেই যাহাকে ঠিক রসনিষ্পত্তি বলে, তাহা এ নাটকে ঘটিতে পারে নাই।

তারপর,—নাট্যকারের প্রকাশ-ভঙ্গীও খুব অলঙ্কৃত এবং এত অলঙ্কার-বহুল যে সাধারণ দর্শকের কান-মন দুইই ধাঁধিয়া যায়।

প্রত্যেকটি চরিত্রই—যেহেতু অলৌকিক—ভাষায় প্রায় এক রকমই অলঙ্কার প্রয়োগে—খাঁটি রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য রূপকনাটকে এই আচরণে কোন দোষ স্পর্শ করে কিনা সব সময়েই সে প্রশ্ন করা চলে। কারণ রূপক নাটকে ঘটনা-বিন্যাসের, এবং বাক্য বিন্যাসের ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন অবান্তর—ইহাতে কেবল মাত্র ভাব-বিন্যাসেরই ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বিধেয়। এই ভাব-বিন্যাসের দিক দিয়া নাটকখানি যে একেবারে নিখুঁত সে কথা বলা চলে না। নাটকখানিতে একটি ভাব অপেক্ষা একাধিক ভাবের সমাবেশ ও সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে দেখা যায়। প্রথমতঃ, রাজার ভিতরকার মানুষটির উদ্ধার এবং রঞ্জনের সঙ্গে মিলন এই দুই উদ্দেশ্যে নন্দিনীর চেষ্টা বিভক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, রাজার ভাবান্তরটি না হইয়াছে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দ্বন্দ্বময়, আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া অবশ্যম্ভাবী, কিংবা রাজনৈতিক তত্ত্বের দিক দিয়া সুসঙ্গত। রাজনৈতিক তত্ত্বের দিক দিয়া সঙ্গতি রাখিতে হইলে, শোষিতদের বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দ্বারাই রাজার মধ্যে ভাবান্তর ঘটানো উচিত ছিল। এখানে রাজার ভাবান্তর বিদ্রোহীরা ঘটায় নাই, রাজার আনন্দ-সত্তাই রাজাকে ধ্বজা ভাঙিতে প্রেরণা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে আত্মার দাবীকেই পরিবর্ত্তনের কারণ রূপে প্রাধান্য দিয়াছেন—বিদ্রোহকে নহে। রাজনৈতিক তত্ত্বের ব্যঞ্জনা এখানে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে—পরিস্ফুট রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। অন্যভাবে বলা যায় যে, আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার সহিত সামাজিক ব্যঞ্জনার নির্ব্বিরোধ সমন্বয় ঘটিতে পারে নাই।

চরিত্র পরিচয়

(১) **রাজা**—আনন্দবিমুখ প্রাণের-সাধনা আনন্দের যোগ হারাইয়া অশিব শক্তিতে পরিণত। বিশ্বের আনন্দকে হনন করিয়া, শক্তিরূপে নিজের অহংকারের ভোগ্য করিয়া তুলিবার অবিরাম চেষ্টায় ইনি নিযুক্ত। কিন্তু আনন্দের সহজ আকর্ষণের টানে ইঁহার অন্তরাত্মা উন্মনা না হয় এমন নহে। তাই ইনি ভিতরে ভিতরে বড় ক্লান্ত, বড় শ্রান্ত—বড় অশান্ত ও দীন। রাজা তাই আনন্দ-যোগহীন শক্তির এবং আনন্দ-তৃষ্ণার দ্বন্দ্বক্ষেত্র। শেষ পর্য্যন্ত আনন্দই তাঁহার মধ্যে জয়ী হয়।

অন্য দৃষ্টিতে, রাজা ধনতান্ত্রিক পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজশক্তি—যন্ত্রের দুই বাহু দ্বারা ইনি সংগ্রহ করেন, আকর্ষণ করেন—শোষণ করেন। ইহার সংলক্ষ্য এবং অসংলক্ষ্য শোষণে মানুষ অমানুষে পরিণত,—মজ্জামাংস মনপ্রাণ সব নিঃশেষিত—সেইদিক দিয়া তাঁহার রাজ্য যেমন যক্ষপুরী, তেমনি প্রেতপুরীও। শুধু ভয়ের পূজা পাইলেই এই রাজা সন্তুষ্ট; কারণ ইনি 'জুজুর পুতুল' হইয়া থাকিতেই ভালবাসেন—অন্ততঃ সর্দ্দারগণ ইহাই চাহেন; যেহেতু, সর্দ্দারগণই রাজার শাসন-যন্ত্র—রাজার ব্যক্তশক্তি। কিন্তু ধনতন্ত্রের রাজশক্তি নিজের মধ্যেই 'প্রতি-স্থিতি' (antithesis) সৃষ্টি করিতে করিতে শেষ পর্য্যন্ত শোষিতদের হস্তেই নিজেকে ধরা দেয়—শোষিতদের হাতে যায়। কায়েমী স্বার্থের সহিত—তথাকথিত রাজশক্তির সহিত—তখন গণরাজার নিজেরই সংঘর্ষ বাধে। এই রাজায় ধনতন্ত্রের স্থিতি-প্রতিস্থিতি এবং নতুন সংস্থিতিও প্রতিফলিত।

(২) **সর্দ্দার**—আনন্দশূন্য প্রাণশক্তির নির্দ্দয় ও নির্ব্বিকার অভিব্যক্তি বা ব্যক্তরূপ। আনন্দসত্তা ইহার মধ্যে একেবারেই নির্জ্জীব আছে কি নাই বুঝা যায় না। কদাচিৎ কোন নিশীথ

অন্ধকারের নির্জ্জন মুহূর্ত্তে এই সত্তাটি সামান্য একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠে, আবার পরক্ষণেই অসাড় হইয়া যায়। যে জীবাত্মা বিষয়কর্ম্মে প্রাণশক্তিকে নিঃশেষে নিযুক্ত করিয়া রাখিতে যাইয়া, আনন্দ-সত্তাকে একেবারেই কোনঠাসা করিয়া ফেলিয়াছে, সর্দ্দার তাহারই

অন্যদিকে, সর্দ্দার ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র, 'সরকার'—শোষণ ও শাসনের উদগ্র সাধনায় সে নির্ব্বিকার নির্ম্মম—প্রাণের স্ফূর্ত্তি সে দেখিতে পারে না—কোন প্রতিরোধ সে সহিতে পারে না, মানুষের মজ্জা-মাংস-মন-প্রাণকে ক্ষীণ না করিতে পারিলে সে স্বস্তি পায় না। প্রাণ-শক্তিকে শাসন করিতে যাইয়া সে নিজেকেই নিষ্প্রাণ করিয়া তুলিয়াছে। সাম-দান-ভেদ-দণ্ড—ছলবল, কৌশল, যখন যে নীতি আবশ্যক, অকুণ্ঠভাবে সে প্রয়োগ করে। মানুষকে অমানুষ করিতে যাইয়া নিজেই সে অমানুষ। শোষণ-শাসনকে অব্যাহত রাখিতে সে মরিয়া।

(৩) **মোড়ল**—"এক সময়ে খোদাইকর ছিল, নিজগুণে তাদের পদবৃদ্ধি এবং উপাধিলাভ ঘটেছে। কর্মনিষ্ঠায় তারা অনেক বিষয়ে সর্দ্দারদের ছাড়িয়ে যায়"। এই মোড়লরা একদা শোষিত ও শাসিত শ্রমিক, অধুনা শোষণ-শাসনের মোড়লি করেন—শ্রমিক-স্বার্থের সহিত নিজের স্বার্থকে এক মনে করেন না।—'অফিসার'-গ্রেডে উন্নীত হওয়ায় বেশ কিছু উপায় করেন, তাই ইহাদের নতুন শ্রেণী-চেতনা—ই হারা না-শ্রমিক না-মালিক।

(৪) **গোঁসাই**—(বস্তু-সংক্ষেপ দ্রষ্টব্য)।

(৫) **বিশুপাগল**—বিশু মুক্তিপ্রবণ আনন্দপ্রবণ প্রাণ, আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না। বিশুর ইতিহাস একটু বিচিত্র : বিশু একদিন আনন্দ-ভূমিতেই বিচরণ করিত; সেদিন সে ছিল মুক্ত, প্রাণ-চঞ্চল।

কিন্তু তাহার মধ্যে কেন যেন ভাবান্তর ঘটিল। সহজ যোগের আনন্দে মন উঠে নাই, তাঁই সে নন্দিনীর মুখের দিকে কী একভাবে চাহিয়া অচেনার অভিমুখে ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু একটী নারীর আকর্ষণে পড়িয়া সে ঘুরিয়া ফিরিয়া যক্ষপুরে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া আছে। বিশু মুক্ত-স্বভাব বলিয়া যক্ষপুরে সে বেখাপ্পা। অনুচর, গুপ্তচর—কোন চর রূপেই সে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই।

শঙ্করাচার্য্য

জীবন-চরিতের উপাদান

যেখানেই বিভূতি সেখানেই দেব-সত্তা স্বীকার বা দর্শন করা লোক-চিত্তের, বিশেষতঃ ভারতীয় চিত্তের, অন্যতম সংস্কার। ভারতে অবতারের প্রাচুর্য্য এই কারণেই। বেদান্ত ও উপনিষদের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের মস্তিস্ক-তেজের দীপ্তিতে একদিন সমগ্র ভারতবর্ষের চোখ ও মন ধাঁধিয়া গিয়াছিল। সত্যই মস্তিষ্ক-শক্তির এত বড় দিগ্বিজয় পৃথিবীতে কে কবে দেখিয়াছে? প্রতিপক্ষের পক্ষশাতন করিয়া দুর্ব্বার বিক্রমে একটি সন্ন্যাসী-যুবক দিকে দিকে নিজের বিজয়-কেতন উড়াইয়া বিচরণ করিয়াছে— ইহাতে কাহারই বা চোখ না ধাঁধে? দর্শনের দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিপক্ষ আধিপত্য বিস্তারে নিযুক্ত, আপাত-দীপ্ত যুক্তিবাণে যোদ্ধার তূণ পরিপূর্ণ; এই সকল যোদ্ধার যুক্তিবাণ কাটিয়া কাটিয়া একে একে সমস্ত দুর্গ অধিকার করিলে ত্রিপুরান্তক শঙ্করের কথ স্বাভাবিক ভাবেই যে মনে জাগে! শঙ্করাচার্য্য এই জন্যই ভারতে শঙ্করের অবতার রূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম-কর্ম্ম সব কিছুই অলৌকিক রহস্যে মণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহার প্রকৃত জীবনী চিরদিনের মতই হারাইয়া গিয়াছে; 'পণ্ডিতেরা বিবাদ করে নিয়ে তারিখ সাল'—এ অবস্থা কোন কালেই ঘুচিবে বলিয়া মনে হয় না।

অগত্যা আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহা পরবর্তীকালের রচনা এবং তাহা লৌকিক-অলৌকিক ঘটনার জগা-খিচুড়ি। তবু তাহারই মুখাপেক্ষী আমরা।

(ক) ইহাদের মধ্যে প্রধান ও উল্লেখযোগ্য :—

(১) আনন্দগিরি কৃত = শঙ্কর দিগ্বিজয়।

(২) চিদ্বিলাস যতি কৃত = শঙ্কর বিজয়।

(৩) মাধবাচার্য্য কৃত = সংক্ষেপ শঙ্করজয়।

তদ্ভিন্ন নীলকণ্ঠ, সদানন্দ, পরমহংস বালকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ রচিত "লঘু শঙ্কর-বিজয়", তিরুমল্লদীক্ষিতের "শঙ্করাভ্যুদয়" ও পুরুষোত্তম ভারতী-কৃত "শঙ্করবিজয়-সংগ্রহ"ও উল্লেখযোগ্য।

(ক) পুরাণে শঙ্কর-প্রসঙ্গ পাইতেছি (যদিও প্রক্ষিপ্ত) :

(১) পদ্মপুরাণে—৬২শ অধ্যায়ে (সময়ের উল্লেখ নাই)

(২) কূর্ম্মপুরাণে—২৮।২৯শ অধ্যায়ে " " "

(৩) বায়ুপুরাণে—(উল্লেখমাত্র)

(৪) ভবিষ্যপুরাণে—(উল্লেখমাত্র)

(৫) স্কন্দপুরাণে—(শিবরহস্যে)

(গ) আধুনিককালে শঙ্কর-প্রসঙ্গ পাওয়া যায় :—

(১) ভক্তমাল।

(২) Biographical Sketches of Deccan Poet—কাবলি রামস্বামী (১৮২৯ খ্রীঃ—কলিকাতায় প্রকাশিত)

(৩) Lives of Eminent Hindu Authors—জনার্দ্দন রাম চক্রজী।

(৪) Sankara—Windischmarn.

(৫) ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়—অক্ষয় দত্ত।

শঙ্করাচার্য্যের কাল

খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দীয় লোকের কাল সম্বন্ধে তো কথাই নাই,—খ্রীষ্টাব্দীয় লোকের কাল সম্বন্ধেও আমরা অনিশ্চিত ধারণার অন্ধকারেই আছি।

অন্যে পরে কা কথা—শঙ্করাচার্য্যের মত দিগ্বিজয়ী জ্ঞানবীরের স্থান-কাল-ঘটনা সম্বন্ধেও আমরা অনুমানের উপর ভর দিয়া চলিতেছি। এখানেও 'পণ্ডিতেরা বিবাদ করে নিয়ে তারিখ সাল'।

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিতেরা কম বাদ-বিতণ্ডা করেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে এইচ. এইচ. উইলসন্, বিণ্ডিষমান্, টেলার ল্যাসেন, বেবর, মানিভ্, কোলব্রুক, রাইস্, বুর্ণেল, বার্থ, কে, বি. পাঠক, কাউএল, গাফ্, অক্ষয়কুমার দত্ত, কাশীনাথ তেলাঙ্, মোক্ষমূলর, টিল, রেভারেণ্ড থুলক্স্, ফ্লীট, লোগান, এন্. ভট্টাচার্য্য, মনিয়র উইলিয়াম্, নিখিলনাথ রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সঙ্গেই দর্শনের ইতিহাসকার রাধাকৃষ্ণণ এবং সুরেন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের নামও উল্লেখ্য। ইঁহাদের অধিকাংশের মতেই শঙ্করাচার্য্য খ্রীষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীর লোক। অবশ্য নিখিলনাথ রায় (সাহিত্য, ১৩০৬, চৈত্র সংখ্যা) সারদামঠের গুরুপরম্পরাক্রমে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৪৭৯ অব্দে এবং এন. ভট্টাচার্য্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে শঙ্করকে আবির্ভূত করাইয়াছেন।

কেরলোৎপত্তি-গ্রন্থের মতে শঙ্করাচার্য্যের ৩৯২ খ্রীঃ জন্ম—কেরলদেশের অন্তর্গত কালদী বিভাগের কৈপল্লে নামক স্থানে। **চেরুমাল পেরুমান** রাজার রাজত্বকালে, ৩৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু। 'কোঙ্গু-দেশ রাজ কাল' নামক গ্রন্থের মতে—স্কন্দপুরে রাজা **ত্রিবিক্রমদেবের** রাজত্বকালে জন্ম। নেপালের ইতিহাসের প্রমাণ **'বৃষদেব'** রাজার সময়ে শঙ্করাচার্য্য নেপালে যাইয়া বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করেন। 'বিশ্বকোষ'-কার নানা যুক্তি বিন্যাস করিয়া শঙ্করকে ৬৮৪ বা ৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের লোক বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভাণ্ডারকর শঙ্করের সময় ৬৮০ খ্রীঃ স্থির করিয়াছেন। যাহাই হউক, সত্য কাল নিশ্চয়ই এই দুই সীমার

মধ্যে (খ্রীঃ পূঃ ৪৭৯ হইতে ৯ম শতাব্দী পর্য্যন্ত) কোন এক কোঠায় আছে   অতএব দেখা যাইতেছে যে   পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া নবম শতাব্দী   । শঙ্করকে টানাটানি করা হইয়াছে

শঙ্করের পিতা-মাতা

(ক) (শঙ্কর দিগ্বিজয়ের মতে) সর্ব্বজ্ঞ নামক এক ব্রাহ্মণ কামাক্ষী নাম্নী নিজ পত্নীর সহিত চিদম্বরে বাস করিতেন। বিশিষ্টা নাম্নী তাহার এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মে। বিশ্বজিৎ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত এই কন্যার বিবাহ হয়। বিশ্বজিৎ কিয়ৎকাল গৃহে থাকিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বনে গমন করেন এবং তপশ্চর্য্যায় মনোনিবেশ করেন। এদিকে বিশিষ্টা দুঃখিত চিত্তে চিদম্বরেশ্বর মহাদেবের সেবায় নিযুক্ত হন। মহাদেবের কৃপায় বিশিষ্টার এক পুত্র জন্মে। এই পুত্রই শঙ্করাচার্য্য। [পিতা= বিশ্বজিৎ, মাতা—বিশিষ্টা (নাটকে মাতা—বিশিষ্টা)]

(খ) (চিদ্বিলাস যতির শঙ্করবিজয় মতে) কেরল-দেশান্তর্গত **কালাদি** নামক স্থানে **শিবগুরুর** ঔরসে **আর্য্যাম্বার** গর্ভে বসন্ত ঋতুর মধ্যাহ্নকালে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। [পিতা—শিবগুরু, মাতা—আর্য্যাম্বা]

(গ) মাধবাচার্য্যের—'সংক্ষেপ শঙ্করবিজয়' মতে)—**মলবরের** অন্তর্গত **কালাদি** নামক স্থানে—শিবগুরুর ঔরসে, **সতী** দেবীর গর্ভে জন্ম। [পিতা=শিবগুরু, মাতা=সতী]

শঙ্করের জীবনের ঘটনা

(খ) উক্ত 'শঙ্করবিজয়' মতে) পঞ্চম বর্ষ বয়সে উপনয়ন। তারপর একদিন নদীতে স্নান করিতে গিয়া কুম্ভীরের' মুখে পড়েন এবং কৌশলে বাঁচিয়া যান। তারপর সন্ন্যাস অবলম্বন

করিয়া হিমালয়ে বদরিকাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় তিনি তপোনিরত গোবিন্দপালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহার পরে তিনি **ভট্টপাদের** (কুমারিল) সহিত সাক্ষাৎ করেন, কাশ্মীরে যাইয়া **মণ্ডনমিশ্রের** সহিত তর্কযুদ্ধ করেন; অনন্তর, শৃঙ্গাগিরি ও জগন্নাথে দুইটি মঠ স্থাপন করিয়া **সুরেশ্বর** ও পদ্মপাদকে মঠরক্ষায় নিযুক্ত করেন এবং দ্বারকায় মঠস্থাপন করিয়া **হস্তামলককে** এবং বদারিকাশ্রমের মঠে তোটকাচার্য্যকে আচার্য্যপদে নিযুক্ত করেন। তারপর, বদারিকাশ্রমে অবস্থান কালে বিষ্ণুর ষষ্ঠাবতার দত্তাত্রেয় শঙ্করের নিকট আসেন এবং উভয়ে হিমালয়গহ্বরে প্রবেশ করেন এবং কৈলাসে যাইয়া শিবের সহিত মিলিত হন।

(মাধবাচার্য্যের 'সংক্ষেপ শঙ্কর বিজয়ে') অষ্টমবর্ষ বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া শঙ্কর উত্তরভারতে গমন করেন—নর্ম্মদাতীরে গোবিন্দযোগীর সহিত সাক্ষাৎ করেন; এবং তাঁহাকে বলেন—'আপনি প্রথমে আদিশেষ ছিলেন, তৎপরে পতঞ্জলিরূপে অবতীর্ণ হন এবং এক্ষণে আপনি গোবিন্দযোগী' (নাটকে-গৃহীত)। তারপর, তিনি নীলকণ্ঠ, হরদত্ত ও ভট্ট ভাস্করকে তর্কে পরাজয় করেন। ইহার পর তিনি বাণ, দণ্ডী, ময়ূরের সহিত সাক্ষাৎ কবিয়া দর্শন বিষয়ে উপদেশ দেন এবং হর্ষ, অভিনবগুপ্ত, মুরারি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য কুমারিল, মণ্ডল মিশ্র ও প্রভাকরকে তর্কে পরাজিত করেন; পরিশেষে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া কৈলাসে শিবের সহিত মিলিত হন।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: (ক) নীলকণ্ঠ রামানুজের পরবর্ত্তী লোক, কাজেই সাক্ষাৎকার অসম্ভব, (খ) হরদত্ত—কাশিকাবৃত্তির 'পদমঞ্জুরী' নামক টীকার লেখক—ইনি ৯ম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নন। (গ) ভট্টভাস্কর কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ভাষ্যকার। খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীর লোক, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শঙ্করকে আক্রমণও করিয়াছেন। (ঘ) বাণ শ্রীহর্ষের সভায় ছিলেন।

ময়ূর ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে—বাণ শেষভাগে জীবিত। (ঙ) দণ্ডী ৮ম শতাব্দীর লোক। (চ) অভিনবগুপ্ত প্রায় ১০০০ খ্রীঃ জীবিত (ডাঃ বুহলর) (ছ) মুরারী মিশ্র (মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ) ১১৮০ সংবতের কিছু পূর্ব্ববর্তী (জ) উদয়নাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য গ্রন্থের 'তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি' নামক টীকা লেখেন। উদয়ন ১০৩২ ও ১১৯৬ সংবতের মধ্যে বর্ত্তমান। (ঝ) কুমারিল, মণ্ডন মিশ্র প্রভাকর শঙ্করের সমসাময়িক।]

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক প্রতিভা

শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য দার্শনিক বিচার-শক্তির অন্যতম পূর্ণাবতার। আশ্চর্য্যের কথা হইলেও ইহা সত্য যে, ভারতীয় গুরুগৃহ এবং বিদ্যাশ্রমই এই অদ্ভুত শক্তির স্রষ্টা ও পালনকর্ত্তা। খ্রীষ্টীয় ৭।৮।৯ শতাব্দীতে ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি এমন একটি মননশীল মস্তিষ্ক গড়িয়া তুলিয়াছিল যাহার বিচার-শক্তির লিখিত নিদর্শন দেখিয়া সকলেই আজ বিস্মিত। বাস্তবিকই যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য মন দিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন— শঙ্করাচার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন কি ব্যাপক, স্মৃতি কি সর্ব্বসংগ্রহী, বুদ্ধি কি দূরবীক্ষক ও অনুবীক্ষক এবং যুক্তি কি লক্ষ্যভেদী। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য দোষলেশহীন এ কথা বলা এখানকার বক্তব্যের তাৎপর্য্য নহে; ইহাই বলিবার বিষয় যে, একটি তত্ত্বকে যথাসম্ভব যুক্তিযুক্ত করিয়া তুলিবার মত সতর্ক ও পরিপাটি বুদ্ধির অদ্ভুত বিকাশ ব্রহ্মভাষ্যে লক্ষ্যণীয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রাদির ভাষ্যে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহার নাম—কেবলাদ্বৈতবাদ। এই বাদটি মায়াবাদ নামেও প্রসিদ্ধ। কারণ এই মতানুসারে—'জগৎ' মায়া মাত্র, অনিত্য।

শঙ্করাচার্য্যের মতবাদের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম সম্বন্ধে একটি প্রাচীন বচন আছে।— 'শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ কোটিভিঃ
ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।'

অর্থাৎ সারমর্ম্ম মাত্র তিনটি—ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা আর জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কেহই নহে। শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক অভিমত এই তিনটি বিষয়ের বিশেষ আলোচনাতেই পর্য্যবসিত।

শঙ্কর-দর্শন সম্যগ্‌ভাবে বুঝিতে হইলে প্রথমেই নিত্য-অনিত্যের সৎ-অসৎ-এর এবং মায়া শব্দের সংজ্ঞা বুঝিয়া লইতে হইবে। অন্যথা শঙ্করকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনাই অধিক। শঙ্করমতে ব্রহ্মই মূল তত্ত্ব—তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, মূলে তিনি নির্গুণ চিন্মাত্র কিন্তু পূর্ণবিভু, স্বপ্রকাশ। ইনি ওঁ তৎসৎ—অক্ষয় অব্যয়—সচ্চিদানন্দ। এই ব্রহ্মই নিত্য; আর সব-কিছুই অনিত্য এবং অসৎ, কারণ আর সব কিছুরই জন্ম-লয় ও বিকার আছে। জগৎ এই কারণেই অনিত্য ও অসৎ—মায়া বা প্রতিভাসমাত্র। জগতের কোন পরমার্থিক সত্তা নাই—ইহার সত্তা মায়িক বা প্রাতিভাসিক (ব্যবহারিক); পারমার্থিক সত্তা একমাত্র ব্রহ্মেরই আছে, সেই হিসাবে ব্রহ্মই নিত্য, কেবল এবং অদ্বৈত সত্তা। তবে এই ব্রহ্মেরই একটা মায়িক রূপ বা সগুণ রূপও আছে। সেইরূপে তিনি ঈশ্বর—লীলাময়—লোকবৎ লীলা করেন (লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্)। এই লীলা হইতেই জন্মাদি সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চের আবির্ভাব। মায়াবদ্ধ দৃষ্টির কাছে এই জগৎ প্রবিভক্ত বা নানা মনে হইলেও, উহা আসলে নানা নহে—নানা-বোধ মায়ারই সৃষ্টি। এই জগৎ যেহেতু জন্ম ও লয়ের পরিণামে আবদ্ধ, সেই হেতুই অনিত্য—এবং যাহা অনিত্য তাহা পরমার্থতঃ অসৎ। (বিঃদ্রঃ—শঙ্কর একের বহু হওয়া স্বীকার করেন, কিন্তু 'বহু'র পরমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না, তাঁহার কাছে একই পরমার্থতঃ সত্য ও নিত্য।)

শঙ্করাচার্য্যের বড় কীর্ত্তি শূন্যবাদের খণ্ডনে, এক কথায় বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তিকে ধ্বসাইয়া দেওয়ায়। ক্ষণিকবাদ ও শূন্যবাদকে তন্ন তন্ন করিয়া খণ্ডন করিয়া শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব যথেষ্ট জোরের সহিত প্রমাণ করায় হিন্দু ধর্ম্মের নব শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। অভাব হইতে ভাব জন্মিতে পারে না (না সতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ)—এই তত্ত্বটিকে শঙ্করাচার্য্য 'নাভাব উপলব্ধেঃ' সূত্রের ভাষ্যে সবিস্তারে প্রমাণ করিয়াছেন তথা বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তিভূমি "শূন্যবাদ"কেই খণ্ডন করিয়াছেন। মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। ইহার বিরুদ্ধে শঙ্করের প্রধান যুক্তি (অবশ্য আরো আগের এবং অনেকেরই) অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি ঘটিতে পারে না (ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তিকে এইভাবে ভাঙিয়া দেওয়া তথা বেদান্তদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা শঙ্করের প্রধান কীর্ত্তি। এই কারণেই হিন্দুর কাছে শঙ্কর 'শঙ্করের অবতার' হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাহুবলের দিগ্বিজয় ভারতে অনেক হইয়াছে—বিদ্যা-বলের দিগ্বিজয় পৃথিবীতে খুবই কম ; শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয় বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান।

নাটকে শঙ্করাচার্য্য

প্রস্তাবনা দৃশ্য

কৈলাস। মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ (উপবিষ্ট ?): ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞ মহাদেবের নিকট আর্ত্ত দেবতামণ্ডলের মনস্তাপ জানাইতে আরম্ভ করিলেন—প্রথমে নারায়ণ ব্রাহ্মণের বিদ্যাদর্প দমন করিবার জন্য বুদ্ধ অবতার হইয়াছিলেন এবং শূন্যবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। হীনগতি নর দেবমায়া বুঝিতে পারে নাই, একেবারে বেদবিধি যাগযজ্ঞ ছাড়িয়া বসিয়াছে—নিরীশ্বর ও স্বেচ্ছাচার হইয়া উঠিয়াছে। যজ্ঞভাগ না পাওয়ায় দেবতারা মলিন। পাপভার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। বেদবিধি আপনাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। ব্রহ্মার প্রস্তাব শুনিয়া মহাদেব উত্তর দিলেন— হে দেবগণ, তোমরা চিন্তা দূর কর। ধরার ক্রন্দন নিত্যই আমার কাণে আসিতেছে। আমি স্থির করিয়াছি—নরদেহ ধারণ করিয়া 'অতি গুহ্য তত্ত্ব' প্রচার করিব। — সংসারে বিশুদ্ধ অদ্বৈত জ্ঞান দান করিব। কুমার কার্ত্তিকেয়ও যাইবে—বৌদ্ধগণে দমন করিয়া কর্ম্মকাণ্ড উদ্ধার করিবে।—ব্রহ্মা! তুমি তাঁহার শিষ্যরূপে কর্ম্মকাণ্ড প্রচার করিও, তোমার নাম হইবে, "মণ্ডন"। আমি নিজে ব্রহ্মসূত্রের এবং বেদার্থের প্রচার করিবার ভার লইলাম। ইন্দ্র। তুমিও যাও! রাজা হইয়া তুমি আমাকে সাহায্য করিও। তোমার নাম হইবে—সুধন্বা।" দেবগণ উৎফুল্ল চিত্তে মহেশ্বরের জয়ধ্বনি করিয়া প্রস্থান করিলেন। মহাদেব মহামায়াকে 'লীলায় আশ্রয় দান' করিতে আহ্বান করিলেন। মহা-

মায়াও সঙ্গিনীগণসহ আবির্ভূত হইলেন। সঙ্গিনীগণ "গীত" আরম্ভ করিলেন—'স্বপন-গঠিত' ইত্যাদি।*

প্রথম অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটী। শঙ্করের কাণে নিত্যই আসে—'অলসে আবাসে কি হেতু? প্রতীক্ষায় ব্রহ্মাণ্ড তোমার'। প্রশ্ন জাগে—'কেবা আমি'? শঙ্কর অন্তরাত্মার সিংহগর্জ্জন শুনেন—...'হের নিত্য চৈতন্যস্বরূপ তুমি। ...কার্য্যে নরকায়...যাও নিত্যধামে পুনঃ কার্য্য-অবসানে'। শঙ্কর স্বগতোক্তি শেষ করিতেই প্রবেশ করিলেন—'বিশিষ্টা'—শঙ্করের মাতা। শঙ্করকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি চিন্তিত। শঙ্করকে তিনি খুলিয়াই বলিলেন—'তোমার শাস্ত্রপাঠ সমাপ্ত...যদি তোমার অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম না হতো আমি তোমার বিবাহের উদ্যোগ করতেম'। শঙ্কর মায়ের ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন — সন্তানের শিক্ষার মায়ের যত্নের পরিচয় দিতে লাগিলেন—। বলিলেন—'তুমি আদর্শ জননী—সকলই তোমার শিক্ষার প্রভাবে'। বিশিষ্টা নিজের আশঙ্কা ব্যক্ত করিলেন—যেমন বিদ্যানুরাগ, বিষয়ানুরাগ সেরূপ নাই। বিষয়ানুরাগের কথায় শঙ্কর বিষয়ানুরাগ বিষয়েই বক্তৃতা দিলেন এবং মাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন—'চতুর্থ আশ্রম সার শাস্ত্রে এ প্রচার' আর 'একমাত্র মুক্তিপথ চতুর্থ আশ্রম'। তাহার সাধও জানাইলেন—সন্ন্যাস গ্রহণে সাধ সদা মনে।' বিশিষ্টা পুত্রের বাক্যে আতঙ্কে শিহরিত হইলেন—যাদুমণিকে ঐরূপ দারুণ কথায় মায়ের

---

* এই গীতকালীন দৃশ্যপটে শঙ্করাচার্য্যের অষ্টবর্ষব্যাপী লীলা:—যথা—মাতৃ-ক্রোড়ে শঙ্কর, মাতৃমুখে শঙ্করের পুরাণ শ্রবণ, পিতার নিকট শঙ্করের শাস্ত্রপাঠ, গুরুগৃহে শঙ্কর—দৃশ্য চতুষ্টয় ক্রমান্বয়ে পরিদৃশ্যমান।

অন্তরে ব্যথা না দিতেই অনুরোধ করিলেন শঙ্কর পিতার ইচ্ছার দোহাই দিলেন—এবং মাকে বুঝাইলেন যে, বংশে 'যতিপন্থা লভে কেহ যদি, উচ্চগতি হয় সে বংশের'। তাহার পুত্র সে পন্থা-প্রার্থী। এমন সময় প্রবেশ করিল জগন্নাথ—পুরাতন ভৃত্য। জগন্নাথ জাতিতে ছোট, কিন্তু স্নেহ-ভক্তি-সেবায় বেশ বড়, তবে সাদাসিদে চাল-চলনে—বুদ্ধিতেও। বিশিষ্টা যে ছেলেকে তখনও খাইতে দেয় নাই তাহাতেই সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। জগন্নাথ শঙ্করকে ভুলাইতে চায়—হাট হইতে সন্ন্যাস কিনিয়া আনিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া। শঙ্কর সন্ধ্যা-বন্দনা না করিয়া কিছুতেই খাইবে না, ব্রাহ্মণের নাকি সন্ধ্যা না সারিয়া খাইতে নাই।

বিশিষ্টা দু'ক্রোশ পথ দূরে যাইবেন স্নান করিতে। জগন্নাথ শঙ্করকে ততক্ষণ অভুক্ত রাখিতে ব্যথা পাইল। বুঝিয়াও ফেলিল —সেদিন পাল পার্ব্বনের দিন। শিবের মাথায় জল না ঢালিয়া বিশিষ্টা কিছুতেই খাইবে না। বিশিষ্টা প্রস্থান করিলে জগন্নাথ শঙ্করকে হাটের কেনা সন্ন্যাস দিয়া ভুলাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু শঙ্কর যে জ্ঞানে পাকিয়া গিয়াছিল সহজ বুদ্ধির জগন্নাথ বুঝিতেই পারে নাই। শঙ্কর আত্মচিন্তায় ডুব দিল—সে উপলব্ধি করিল, মহামায়া ভীষণ তরঙ্গ-রঙ্গে খেলা করিতেছে—জীবকুল মহা অন্ধকারে ভাসমান—ভ্রম-বশে ভুলিয়া থাকে কল্যাণ চাহে না। বার বার ঠেকিয়াও শিখে না। তাহার মধ্যে সত্তর জাগিল—'যাই যাই যেথা আর তিল নাহি রব······ছেদিব—ছেদিব মায়ার বন্ধন দৃঢ়।' শঙ্করের প্রস্থান। শঙ্করের এই ভাব দেখিয়া জগন্নাথ প্রবেশ করিল; বলে তাহার 'গালে-মুখে, চড়াইবার ইচ্ছা আর শঙ্করের [illegible] পিতার প্রতি বিরক্তি এবং লেখাপড়ার প্রতি বিরক্তি]। এমন [illegible] প্রবেশ—সঙ্গে তাহার [illegible]

জগন্নাথ রাগের ভাষায় বিশিষ্টার এবং শঙ্করের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিল। তাহার ধারণা শঙ্কর 'ছেলে বয়সে খেপে গেল'। রমা খ্যাপামির গোড়ার কথা আরম্ভ করিল—বিশিষ্টার একা একা সকলের মানা না শুনিয়া ভর সন্ধ্যাবেলা শিবের মন্দিরে যাওয়া—মন্দিরে তাহার পেটে হাওয়া ঢুকিবার ব্যাপার—নিশ্চয়ই যে কোনও উপদেবতা আশ্রয় করিয়াছে—এ বিষয়ে তাহার সতর্কবাণী এবং গুণিণ টুনিন আনিয়া ছেলেটিকে দেখাইবার উপদেশ—শঙ্করের বাবার সে উপদেশ অমান্য করা—কোন কথাই বাদ গেল না; রমা আর একটি বিষয়েও জগন্নাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—গোটা আটেক ছুঁড়ী লইয়া এক মাগী ছেলে দেখিতে আসিয়াছিল—অলুক্ষণে মাগী। জগন্নাথও সেইদিন নাকি মঠের দিকে তাঁহাকে দেখিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেই মাগী আসিয়া পড়িল—অষ্টসখী বেষ্টিতা হইয়া মহামায়া। জগন্নাথ শাসাইল—'জগা তখনও মরে নাই', জগার কাছে ভিরকুটি চলিবে না। তাই সোজা প্রশ্ন করিল সে—'ছেলেটার মাথা বিগড়াইতে আসিয়াছ?'

মহামায়া, "হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ" বলিতেই জগন্নাথ কাস্তে দিয়া নাক কাটিয়া দেওয়ার ভয় দেখাইল। কিন্তু মহামায়া ও সঙ্গিনীগণ কোন কথা না বলিয়া 'গীত' আরম্ভ করিলেন। গীত শুনিবার পরে জগন্নাথের কেমন নাচিতে ইচ্ছা করিল—জগন্নাথ 'বোম্ ভোলা' বলিয়া প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নদীতে স্নান করিতে যাইবার পথ। রমা, গঙ্গা ও বিশিষ্টা স্নানে চলিয়াছেন। বিশিষ্টার শরীরের কেমন অস্থির ভাব। বিশিষ্টা 'পথিমধ্যে উপবেশন' করিলেন। রমা বিশিষ্টার মিছে ভাবনা দেখিয়া বিরক্ত হইলেন। কিন্তু বিশিষ্টা একপদও অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিলেন

না—সেখানেই শয়ন করিলেন। গঙ্গা দেখিল—বিশিষ্টা 'সত্যি সত্যি ভিরমি গেলো'। বিশিষ্টা প্রলাপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। রমা দেখিল— সত্য সত্য বিকার। অকস্মাৎ দ্রুতবেগে শঙ্কর প্রবেশ করিল। শঙ্করের ডাক না শুনিয়াই বিশিষ্টা—'বাবা, আমার পুত্র দাও' বলিয়া কাতর অনুনয় করিতে লাগিল। জ্ঞান ফিরিলে বিশিষ্টা পুত্রকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন—তিনি অনুমতি না দিলে শঙ্কর কোথায়ও যাইবেন না। রমা শঙ্করকে বলিলেন—'বাবা, তোমার মাকে এতদূর আর স্নান করতে আসতে দিও না'.........শঙ্কর বলিয়া ফেলিলেন—'স্রোতস্বতী আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের বাড়ীর নিকট দিয়ে যাবে'। **(অলৌকিক শক্তি নং ১)**। জগন্নাথও আসিয়া পড়িল এবং বিশিষ্টাকে একটি আদুরেঁ কড়া কথা বলিয়া সকলের সহিত প্রস্থান করিল। শঙ্করই শুধু প্রস্থান করিল না।

এদিকে শঙ্কর স্রোতস্বতীর স্তব আরম্ভ করিলেন। ভগীরথের শঙ্খধ্বনি শুনিয়া গঙ্গা যেমন পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন, নদীটি যেন তেমনি ভাবেই করতালি শুনিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসে—এই তাঁহার ইচ্ছা, ঘটিলও তাহাই। "করতালি দিয়া অগ্রে অগ্রে শঙ্করের গমন এবং পশ্চাৎ স্রোতস্বিনীর প্রবাহিত হওন"। **(অতিপ্রাকৃত ঘটনা নং ১)**।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সম্মুখ। মহামায়া উপবিষ্টা। বিশিষ্টা প্রবেশ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন—মহামায়া হেঁয়ালী ভাষায় মহামায়ার দেবীত্ব এবং মানবীত্বের বেশ একটা সামঞ্জস্য রাখিয়া পরিচয় দিলেন। বিশিষ্টা মহামায়াকে আশ্রয় দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন—এমন কি, কোথাও চলিয়া যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেও আশ্রয় পাইবেন—

এইরূপ প্রতিশ্রুতি। জগন্নাথ প্রবেশ করিয়া মহামায়াকে বিরক্ত মনেই বলিল—'হ্যাঁ হ্যাঁ তুই যা—তোরে আর আসতে হবিনে।' জগন্নাথ মহামায়ার বহুরূপী পরিচয়টুকু বিশিষ্টাকে জানাইল। মহামায়া শ্লেষাত্মক ভাষায় উত্তর দিলেন—"যে আমায় চেনে তার কাছে তো আমি থাকি না"। জগন্নাথের ভাষাও দ্ব্যর্থক হইয়া দাঁড়াইল। বিশিষ্টা, জগন্নাথের কথায় কিছু মনে না করিতে মহামায়াকে অনুরোধ করিলেন। মহামায়া প্রস্থান করিলেন। জগন্নাথের ধারণা হইল—'খুদে দাদা তো যে সে নয়'; নদীকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া আনা যে-সে কথা নহে। শঙ্কর যতই বলিল—'মা ইচ্ছা করে এসেছেন'—তবু জগন্নাথের বিশ্বাস হয় না। তাহার ধারণা দৃঢ় 'উনি তারে চিনতে পারলুম'; তবু সে শঙ্করকে চোনি ভাইয়ের মতনই দেখিবে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সম্মুখস্থ নদী। নদীর তীরে শঙ্কর। সংসার-বাসনাকে শঙ্কর নিজ দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইতে এবং কুমীর আকার ধারণ করিয়া তটিনী-সলিল-মধ্যে অবস্থান করিতে বলিল। (**অতি-প্রাকৃত ঘটনা নং ২**)। কুমীরটির কাছে তাহার আবেদন—'যদি আমাকে এই সংসারে দেখ, তাহা হইলে আমাকে সলিলে নিমজ্জিত করিয়া দিও, আর যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে পূতবারি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও। যদি কোন দিন অন্য দেহে সংসারে আসি—আবার দেখা হইবে' এই বলিয়া শঙ্কর 'নদীতে অবতরণ' করিলে—তখন রমা ও গঙ্গা কথা বলিতে বলিতে সেখানে আসিল। রমা শঙ্করের মাহাত্ম্য দেখিয়া বিস্মিত। কলির প্রবাদটি যে সত্য—ছেলের মুখে আর পাগলের মুখে (রামকৃষ্ণদেবের স্মৃতি?) দৈববাণী হয়'—এ বিষয়ে কোন সন্দেহই তাহার থাকিল না।

কিন্তু গঙ্গা তাহার স্বামীর ব্যাখ্যা শুনাইল—‘অমন হয় অমন হয় অমন অনেক নদীর মুখ ফেরে!’ (দৈববিশ্বাসীদের যুক্তি!)। রমা সহজ যুক্তি দিয়া গঙ্গার স্বামীর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া বিশ্বাস করিল—‘এ সব ভাই ঠিক দৈব ঘটনা।’ গঙ্গা সহসা নদী-গর্ভে শঙ্করকে দেখিয়া কুমীর সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতে-না-দিতে শঙ্করকে কুমীরে ধরিল। বিশিষ্টা বেগে উপস্থিত হইলেন এবং বাবা মহাদেবের কাছে পুত্রের প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শঙ্কর মাকে বলিল যে তাহাকে কালে ধরিয়াছে। সন্ন্যাস-গ্রহণের অনুমতি না দিলে আর তাহার রক্ষা নাই। মা যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়ে পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য সকলের কাছে আবেদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শঙ্কর বলিল যে অনুমতি না দিলে রক্ষা নাই। অগত্যা মা অনুমতি দিলেন। শঙ্কর জল হইতে উত্থিত হইয়া মায়ের কাছে আসিল এবং জন্মপত্রিকার কথা মাকে স্মরণ করাইয়া দিল—অষ্টম বর্ষে সন্ন্যাস-গ্রহণ না করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল। বিশিষ্টা গভীর ক্ষোভে ধীরে ধীরে পুত্রকে নিজের যাতনার কথা ব্যক্ত করিলেন এবং মায়ের বেদনার অস্থিরতায় বলিলেন—‘কাল যেন আর সূর্য্যোদয় না দেখতে হয়’।—শঙ্কর ও বিশিষ্টা প্রস্থান করিলে রমা ও গঙ্গা বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—‘মাগী অনুমতি দিলে আর কুমীর ছেড়ে দিলে।’ রমা এইবার বিশ্বাস করিলেন—মন্দিরে বিশিষ্টার গর্ভে জ্যোতিঃ-প্রবেশ করিয়াছিল মিথ্যা কথা নহে। গঙ্গা শঙ্করের গুরুগৃহবাসকালীন একটা আশ্চর্য্যকর ঘটনা শুনাইলেন— ভিক্ষার সময় এক দুঃখিনী ব্রাহ্মণীর কাছে ভিক্ষা চাহিলে ব্রাহ্মণী কাঁদিতে কাঁদিতে মাত্র তিনটি আমলকী দিয়া সেবা করিয়াছিলেন। শঙ্কর (বয়স তখন মাত্র ছয়) ধ্যান করিয়া লক্ষ্মীকে টানিয়া আনিয়া অচল করিয়া দিয়াছিল। **(অতিপ্রাকৃত ঘটনা নং** ৩)। উভয়েই শঙ্করদের বাড়ীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটী। শঙ্কর ও বিশিষ্টা। শঙ্কর মায়ের কাছে বিদায় চাহিল। বিশিষ্টা রমণীর প্রাণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া নিজের অসহ্য বেদনাকেই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। শঙ্কর মাকে শোক পরিহার করিতে বলিয়া ক্ষণস্থায়ীপ্রভা মানবজীবন এবং উহার প্রকৃতি ও গতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিল। মাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—'প্রাণ মম বহিবে তোমার পাশে……তুমি ভাগ্যবতী…'। দেবতারা তোমায় রক্ষা করিবেন—কমলা ধনধান্যে পূর্ণ রাখিবেন—'অতিথি না বিমুখ হইবে এই গৃহে'।—'যেইক্ষণে করিবে স্মরণ—করি সত্য পণ,—সেইক্ষণে আসিব মা তোমার সদনে।' বিশিষ্টা অনেক অনেক দুঃখ করিয়া বলিলেন—'গর্ভজাত পুত্রের হস্তে অগ্নি গ্রহণ করবো, সে আশায় আজ নিরাশ হ'লাম।' শঙ্কর মায়ের কাছে অঙ্গীকার করিল—স্মরণ করিলেই 'যথা রহি—তখনি আসিব।'—'অন্তকালে অগ্নিক্রিয়া করিব নিশ্চয়'। শঙ্কর মাকে বুঝাইল—তাঁহার পুত্র অতিবাঞ্ছনীয় কার্য্যে রত—ক্ষণিক বিচ্ছেদের জন্য চিন্তা শ্রেয়ঃ নহে। আর স্বপ্নের মিলনেই বা বিচ্ছেদ-অপেক্ষা কেন?—শারীরিক বিচ্ছেদ-আশঙ্কা কেন? প্রসবকাল হইতে এই পর্য্যন্ত শরীর তো একরকম নাই! শঙ্কর মাকে জ্ঞান-চক্ষে দেখিতে বলিল—'তুমি আমি বিশ্ব অবিচ্ছেদ……অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি আছি এক হয়ে'। শঙ্কর বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রামদাসের বাটী। রামদাস ও সখারাম (প্রতিবেশী)। রামদাস শঙ্করের মায়ের গ্রাসাচ্ছাদন দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, কিন্তু ক্রমে বুঝিয়াছে—সে খরচ বাজে। কারণ, ও আবার ফিরে এসে আপনা

পৈতৃক বিষয় কেড়ে নেবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি না দিয়াও তাহার উপায় ছিল না। রাজা রাজশেখর শঙ্করের সহায়। ছদ্মবেশে রাজার লোক আসিয়া ভারে ভারে সামগ্রী দিয়া যায়। শঙ্করের মা তো রাজরাণীর মত দান করে। সখারাম লোভে বিষয়টা না চাহিয়া পারিল না। অবশ্য রামও ছাড়িবার পাত্র ছিল না।

অর্দ্ধোন্মাদিনীর মত প্রবেশ করিল বিশিষ্টা। শেষবারের মত মাত্র আর একটিবার পুত্রকে তিনি দেখিতে চাহেন। চলিতে গিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। সখারাম মূর্চ্ছা দেখিয়া উল্লসিত—'মাগী বুঝি এইখানেই অক্কা পায়।' রাম দেখিলেন—'সর্ব্বনাশ! ছোঁড়া এখনি ফিরে এসে মুখাগ্নি করবে আর বিষয়-আসয় বেচে কিনে চলে যাবে'। মহামায়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অঙ্গস্পর্শ করিতেই বিশিষ্টার—'একাকার' জ্ঞান লইয়া জ্ঞান হইল। তাহার কাছে তখন 'আমি আমি নাহি কেহ আর অসীম অসীম'! জগৎ তাঁহার কাছে শঙ্করময়। তাহার কোলে শঙ্কর, বুকে শঙ্কর, আঁচল ধরিয়া শঙ্কর—বেদপাঠরত শঙ্কর! মহামায়াকে দেখিয়া সখারাম বুঝিয়া ফেলিল এবং মেজো খুঁড়ো রামদাসকেও বুঝাইল—মাগী চোর। ডাকাতনি! বেটীর সঙ্গে লোক আছে।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

নর্ম্মদা তীর—গোবিন্দনাথের আশ্রম—ধ্যানমগ্ন গোবিন্দনাথ। শঙ্কর প্রবেশ করিয়াই বুঝিলেন—অনন্তদেবই নর-কলেবরে সম্মুখে সমাসীন। ইনিই সেই ভগবান পাতঞ্জল! বর্ত্তমানে ইনি গোবিন্দ-নাথের কলেবরে। শঙ্কর নমস্কার করিলেন। সেই সময়েই এক ঋষি আসিয়া শঙ্করকে প্রশ্ন করিলেন—বাপু, কার অনুসন্ধান করো? শঙ্করের উত্তর শুনিয়া ঋষি বুঝিতে পারিলেন, শঙ্কর কে এবং

প্রস্থান করিলেন। শঙ্কর শান্তিময় স্থান দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু নর্ম্মদার ঘোর কলনাদ অকস্মাৎ উত্থিত হইল। শঙ্কর গুরুর সমাধি ভঙ্গের আশঙ্কায় নর্ম্মদাকে শান্ত হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু নর্ম্মদা আদেশ অমান্য করিল। শঙ্কর আর একবার অলৌকিক শক্তি দেখাইলেন—'ক্ষমা কর অপরাধ' বলিয়া নর্ম্মদাকে কমণ্ডলুর মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। **(অলৌকিকশক্তি নং ২, অতি-প্রাকৃত ঘটনা নং ৪)**। গোবিন্দ চক্ষু উন্মীলন করিয়া নর্ম্মদাকে মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন এবং নর্ম্মদাকে মুক্তির পরে শঙ্করের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শঙ্কর পরিচয় দিলেন—'চিদানন্দ শিবময় স্বরূপ আমার।' গোবিন্দের ব্যাসের বচন মনে পড়িয়া গেল—দেখিলেন বিশ্বনাথই নর-কলেবরে বেদবিধি উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ। গোবিন্দ শঙ্করের 'কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান' করিলেন। শঙ্করের বিজ্ঞান-নয়ন বিকশিত হইল। জগৎ-জীব-মায়া ও নিত্য-পদার্থ সম্বন্ধে শঙ্করের পূর্ণ জ্ঞান আসিল।

গোবিন্দ শঙ্করকে "শিবদত্ত দণ্ড সন্ন্যাসীর" দিয়া বলিলেন—"দুষ্কৃত জনে দমন কর,—যাত্রা কর বারাণসী ধামে।" এবং দেখাইলেন—'অপ্সরী কিন্নরী বিদ্যাধরী আদি নৃত্য করে শিব-সঙ্কীর্ত্তনে।" বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীগণের গীত আরম্ভ হইল। **(অতিপ্রাকৃত ঘটনা নং ৫)**।

দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ প্রথম গর্ভাঙ্ক

বারাণসী—মণিকর্ণিকার ঘাট। গঙ্গাস্নানার্থী শঙ্কর। সেই সময়েই "স্বদলে চণ্ডালবেশী মহাদেবের বেদরূপী কুকুর চারিটি সহ প্রবেশ" এবং গীত — 'ভরপুর নেশা কেন করবি ফিকে!' শঙ্কর সুরাপানোন্মত্ত চণ্ডাল চণ্ডালিনী দেখিয়া খুবই বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন—'তুমি অস্পৃশ্য, পথ দাও, দূরে অবস্থান করো।' শঙ্করের কথা শুনিয়া

চণ্ডাল মাতলামির আচরণে শঙ্করকে তত্ত্বকথা শুনাইল। কথ কাটাকাটির পরে শঙ্কর প্রকৃতিস্থ হইলেন—চণ্ডালের কাছে পাদপদ্ম পরশনের অধিকার চাহিলেন। সহসা চণ্ডালের মহাদেব মূর্তি ধারণ এবং চণ্ডাল চণ্ডালিনীগণের ভৈরব ভৈরবীরূপে ও কুক্কুর চারিটীর চারিবেদরূপে রূপান্তরিত হওন) (**অতিপ্রাকৃত ঘটনা নং ৬**)। শঙ্কর স্তব করিলে মহাদেব শঙ্করকে তাঁহার করণীয় সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন, শঙ্করও নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সনন্দন (পরে পদ্মপাদ যিনি) প্রবেশ করিলেন—তাপপূর্ণ সংসার-অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সে খুবই ক্লান্ত। মুক্তি-বাসনায় সে যত অস্থির, মহাজনের অদর্শনে তত নৈরাশ্যব্যাকুল। শঙ্কর পুনঃ প্রবেশ করিলেন—'মহাকার্য্যে যে আছ সহায়'কে আহ্বান করিতে করিতে সনন্দন আত্মনিবেদন করিলে শঙ্কর তাঁহাকে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য গ্রহণ করিতে বলিলেন। সনন্দন শঙ্করকে গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং শঙ্করের সহিত প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর প্রাঙ্গণ। বিশিষ্টা শঙ্করের চিন্তায় বিভোর। শব্দ শুনিলেই তাঁহার মনে হয়—শঙ্কর বুঝি ডাকিতেছে। 'শঙ্কর এলি?'—বলিয়া বিশিষ্টা প্রবেশ করিলেন। জগন্নাথের আক্ষেপ আসিল—'মাগীর আর বাঁচবার ধারা নেই।' বিশিষ্টার মুখে শঙ্কর-স্মৃতির কথাই চলিল। মহামায়া প্রবেশ করিতেই জগন্নাথ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।—মহামায়া উন্মাদিনীপ্রায় বিশিষ্টাকে শঙ্করের সংবাদ দিলেন—'শিষ্য পড়াচ্ছে দেখে এলুম।' আরো বলিলেন—

'তোমার প্রসাদ নিয়ে যাবো, তবে সে খাবে'। জগন্নাথ নিশ্চিত হইল—'হুঁ, সন্ধান রাখে' কিন্তু তাঁহার কৌতূহল—'কি করে জানলে ?' মহামায়া কৌতূহল দূর করিলেন, বলিলেন—'এই যে দেখে এলুম'। (**অতিপ্রাকৃত ঘটনা নং ৭**) জগন্নাথ আরো তথ্য ও মহামায়ার তত্ত্ব জানিয়া লইল, কিন্তু জানা শেষ হইল না। প্রশ্ন থাকিয়াই গেল—'আচ্ছা তুই কে ?' মহামায়া পরিচয় না দিয়া "গীত" আরম্ভ করিলেন—"যে আমায় চেনে, আমায় জেনে আপনি থাকে না।" গীতান্তে বিশিষ্টা (ভাব-নেত্রেই) দেখিলেন—শঙ্কর শিব সাজিয়া আসিয়াছে। এই সম্বন্ধেই প্রলাপ বকিতে বকিতে—'ঐ যে আমায় মা বলে ডাকছে' বলিয়া বিশিষ্টা বেগে প্রস্থান করিলেন। মহামায়া ও জগন্নাথও তাঁহার পিছনেই গমন করিলেন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বারাণসী—গঙ্গাতীরস্থ শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম-সম্মুখ। গণপতি ও শান্তিরাম—শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যদ্বয় সনন্দনের প্রতি গুরুর পক্ষপাত লইয়া আলোচনা করিতে ব্যস্ত। সনন্দন আচারভ্রষ্ট : গঙ্গাস্নান করে না—মুখে বলে, গুরুগঙ্গা এক,.........এমন সময় প্রবেশ করিলেন শঙ্করাচার্য্য—মুখে সনন্দনেরই কথা লইয়া। গণপতি জনান্তিকে হাসাহাসি করিলেন—গুরুর পলকে-প্রলয়-দেখা দেখিয়া। শান্তিরাম সংবাদ দিলেন—সনন্দন ওপারে দাঁড়াইয়া আছে—নৌকা নাই, পার হইতে পারিতেছে না। শঙ্কর নাম ধরিয়া সনন্দনকে ডাকিতে লাগিলেন। সনন্দন "গঙ্গার পর-পার হইতে স্বগত" বলিল, 'যার কৃপায় ভবসিন্ধু পার হব—তিনি আহ্বান কচ্ছেন। আমি সামান্য নদী পার হতে চিন্তা কচ্ছি।'

সনন্দন—'জয় গুরুদেব' বলিয়া 'গঙ্গায় অবতরণ পূর্ব্বক আগমন'

করিলেন এবং তাঁহার "প্রতি পদক্ষেপে গঙ্গায় পদ্মের আবির্ভাব" হইল। **(অতি প্রাকৃত ঘটনা নং ৮)**। সকলেই বিস্মিত হইলেন—তবে গণপতি ও শান্তিরাম লজ্জিত ও অনুতপ্তও হইলেন খুব। সনন্দন শঙ্কর কর্তৃক নতুন নামে অভিহিত হইলেন—নাম হইল "পদ্মপাদ"।

সেই সময়েই ব্যাসদেব ছদ্মবেশে প্রবেশ করিলেন (**অতিপ্রাকৃত ঘটনা নং ৯**) এবং বেদান্ত সূত্রের সম্বন্ধে শঙ্করের সহিত আলোচনা করিতে চাহিলেন। আলোচনার উদ্দেশ্যে ব্যাস ও শঙ্কর আশ্রম অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধের পরিচয় লইয়া সনন্দন-গণপতি-শান্তিরামের মধ্যে অনেক তোলপাড় ও কথা ছুড়াছুড়ি হইল। সনন্দন চলিয়া গেলে গণপতি শান্তিরামের কাছে স্পষ্টই বলিল—'অন্য একটা অধ্যাপক দেখে নেবো।' গুরুর বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ—'একটাও তো বিদ্যে দিলেন না।—এমন কি দুই একটা ওষুধ-পালা পর্য্যন্ত না।' 'তত্ত্বমসি', 'সোহহং' পাঠ লইয়া লাঠালাঠি, হানাহানি—গণপতির ভাল লাগে না। সে শঙ্কর ও ব্যাসদেবকে আসিতে দেখিয়াই প্রস্থান করিল।

'শঙ্করাচার্য্য, ব্যাস ও সনন্দনের পুনঃ প্রবেশ' হইল। ব্যাস শঙ্করের পাণ্ডিত্যের এবং তর্কশক্তির প্রশংসা করিলেন এবং আরো তর্ক করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সনন্দন উভয়কেই চিনিয়া নিবেদন করিলেন—'হরিহরের বাদানুবাদ তো কোটিকল্পে অবসান হবে না—ব্যাস স্বয়ং নারায়ণ এবং শঙ্কর সাক্ষাৎ শঙ্কর।' শঙ্করাচার্য্য ব্যাসকে চিনিয়া আত্মনিবেদন এবং ভাষ্যের সংস্কার করিতে অনুরোধ করিলেন। কোন্ দেবতা কোথায় কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ব্যাসদেব পুনরায় শঙ্করকে স্মরণ করাইলেন—কার্ত্তিক হইয়াছেন কুমারিল্ল, ব্রহ্মা হইয়াছেন

তৎশিষ্য 'মণ্ডন' কর্ম্ম-মার্গে আসক্ত এবং নিবৃত্তি-মার্গে উদাসীন। ব্যাস শঙ্করকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

শঙ্কর সনন্দন প্রভৃতিকে ভারতবর্ষের কৃত্রিম তপোবনের কথা বলিলেন—ঐ তপোবনগুলি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদিগের আবাসস্থল। সনন্দনকে একাকী প্রথমে অগ্রসর হইতে নির্দ্দেশ দিয়া শঙ্কর পশ্চাৎ যাইবেন বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাশ্রম। বৃদ্ধ বৌদ্ধ কাপালিক ও শিষ্যগণ উপবিষ্ট। কাপালিকের বশীকরণবিদ্যার বহর দেখিয়া শিষ্যগণ বিস্মিত ও আনন্দিত। একটি অসূর্য্যম্পশ্যা কুমারীকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিয়া আনিয়াছেন। শিষ্য গুরুর জন্য 'ফুলশয্যা' প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন —বিহার করিলেই শিষ্য সন্তুষ্ট। কাপালিক বৃদ্ধ—অশীতিবৎসর বয়ঃক্রম। যৌবন লাভ করিবার জন্য তিনি উপর্য্যুপরি একপক্ষ বালকের হৃদপিণ্ডে প্রস্তুত সুরা পান করিয়াছেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। শিষ্যকে নির্দ্দেশ করিলেন—'আজ যে যমজ শিশু তাদের মাতার সহিত আনীত হয়েছে, তাদের চক্ষের উষ্ণ শোণিতে সুরা প্রস্তুত ক'রে পান করি: দেখি—যদি সবল হই।' শিষ্য 'চণ্ডালের হৃদপিণ্ড-প্রস্তুত' সুরা পান করিতে অনুরোধ করিলেন এবং জানাইলেন—'কুমারীর আলিঙ্গন-তৃষ্ণা দিন দিন বড়ই প্রবল হয়েছে।'

গুরুর আদেশে শিষ্যের বাঁশরী-সঙ্কেতে দুইজন স্ত্রীলোক একটি কুমারীকে লইয়া প্রবেশ করিল। নর্ত্তক-নর্ত্তকী আসিল যুগলে যুগলে এবং নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। "নৃত্যগীত চলিতেছে এমন সময়ে মাতার সহিত যমজশিশু ও চণ্ডাল বালককে লইয়া শিষ্যের পুনঃপ্রবেশ" ঘটিল। মাতাকে সুরা পান করাইয়া আদেশ করা হইল

—'তুই ছুরিকা দ্বারা দুই শিশুর বক্ষঃ বিদীর্ণ করো।' কাপালিক ওদিকে কুমারীকে আকর্ষণ করিতে উদ্যত। কুমারী 'মহাদেব রক্ষা করো' বলিয়া চীৎকার করিতেই প্রবেশ করিলেন সনন্দন। সনন্দনকে কাপালিক বন্ধন করিতে আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ— "শিষ্যগণসহ শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ" হইল। কমণ্ডলু হইতে জল নিক্ষেপ করিয়া শঙ্করাচার্য্য সকলকে নিস্পন্দ করিয়া ফেলিলেন। (**অলৌকিক শক্তি নং ৩**) সেই সময়েই। সসৈন্যে সুধন্বারাজার সেনাপতি প্রবেশ করিলেন—এবং শঙ্করের আদেশে রাজসৈন্যগণ কাপালিক ও শিষ্যদের বন্ধন করিয়া লইয়া গেলেন। শঙ্কর ও শিষ্যগণ—'শিব-মহিমা' গান আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কুমারিলভট্টের আশ্রম। তুষানলে তনুত্যাগাভিলাষী তুষগঞ্জোপরি উপবিষ্ট কুমারিল ভট্ট, সম্মুখে প্রভাকর প্রভৃতি শিষ্যগণ। কুমারিল বিদায় চাহিতেই প্রভাকর ব্যাকুলচিত্তে গুরুকে ক্ষান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কুমারিল শিষ্যদের অভয় দিলেন—কর্ম্মকাণ্ড বিলুপ্ত হইবে না—'বেদবিধি উদ্ধার কারণ হইয়াছে মহান্ উদ্ভব'। কুমারিল তাঁহার পাপের কথাও ব্যক্ত করিলেন—বৌদ্ধগণে ছলনা করিতেই যৌবনে বৌদ্ধ গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন গুহ্য বৌদ্ধ-তত্ত্ব অবগত হইবার জন্যই। ক্রমে পাপানলে দেহ পুড়িতে লাগিল। কুমারিল 'কই প্রভু এখনও তো দয়া হ'ল না' বলিয়া আক্ষেপ করিতেই শিষ্যগণসহ শঙ্করাচার্য্য প্রবেশ করিলেন। শঙ্কর যোগবলে কুমারিলকে যৌবন প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু কুমারিল মহাপ্রস্থানেই অধিকতর উৎসুক। তবে, কর্ম্মযোগে-সমাহিত মণ্ডনকে পরাজয় করিতে শঙ্করকে অনুরোধ করিলেন। শঙ্করের প্রশ্নের উত্তরে

কুমারিল মণ্ডনের আশ্রমের ও মতবাদের পরিচয় দিলেন সবিস্তারে। শেষে সকলেই শিব-গীত আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক

বনপথ। উভয় পার্শ্বে তাল নারিকেল ও খর্জ্জুর বৃক্ষশ্রেণী। কাতান হস্তে জনৈক শিউলির প্রবেশ। তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা। তাঁহার আদেশে গাছ মাথা নত করে। শঙ্করাচার্য্য প্রবেশ করিয়া শিউলির ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত এবং বিদ্যাটি লাভ করিবার জন্য উৎসাহী হইলেন। শিউলিকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিতেই সে খুব একচোট ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কয়েক হাত লইল। ব্রাহ্মণের অতি আচার এবং বৌদ্ধদের অত্যাচারের বর্ণনায় সে পঞ্চমুখ। শেষে শঙ্করের 'বাবা' শব্দটি তাঁহাকে দুর্ব্বল করিয়া দিল। তাঁহার স্বরে —'বাবা বলবার ছ্যালো, সেটা যমে নিয়েছে।' শিউলি শঙ্করকে মন্ত্র দিতে রাজি হইল।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মণ্ডনমিশ্রের বাটী। মণ্ডনমিশ্র ও উভয় ভারতী—মণ্ডন ভীষণ বিরক্ত। কোথা হইতে এক সম্প্রদায় শাস্ত্রজ্ঞানহীন পাষণ্ডেরা আসিয়াছে, তাহারা পরিচয় দেয় সন্ন্যাসী—কিন্তু আসলে মূঢ়, কারণ কলিতে 'সন্ন্যাস নিষেধ'—এ কথাটুকু তাহারা অবগত নহে। উভয়-ভারতী সন্ন্যাস গ্রহণের পক্ষে কিছু বলিতেই মণ্ডন আরো উত্তেজিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষে—জৈমিনীর মীমাংসা-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত শুনাইয়া দিলেন—মন্ত্ররূপ ঈশ্বর ব্যতীত "ঈশ্বরো নাস্তি"। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তর্কে জোর বাঁধিল না; মণ্ডনের বড় অতৃপ্তি 'একটা যুক্তি খণ্ডন করবার শক্তি কারো নাই।' উভয়ভারতী পিতৃশ্রাদ্ধের কথা স্মরণ

করাইয়া দিলেও, মণ্ডন কর্ম্মফলের প্রত্যক্ষত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া চলিলেন। উভয়ভারতী রহস্যালাপের দিকে টানিতে চেষ্টা করিলেও মণ্ডনের ভগবান্ জৈমিনীর ঝোঁক গেল না। কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ—'মণ্ডনমিশ্রের হস্তধারণ পূর্বক টানিয়া লইয়া উভয়ভারতীর প্রস্থান' পর্য্যন্ত মণ্ডনমিশ্রের মুখে ছিল।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শিউলি-পল্লীর অপরাংশ। শিউলিনী পুত্রশোকে কাতর ও বিমনা। ঘর তাহার 'বন পারা'। শঙ্করকে লইয়া শিউলি প্রবেশ করিলে শঙ্কর শিউলিনীকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিল। প্রতিবেশিনীরা স্বগতোক্তিতে আন জানাইল—'মা বাক্যিতে মাগীর পরাণটা জুড়ুলো!' শিউলি বালকগণও আসিয়া জুটিল—দুই চারিটি কথা বলিয়াই 'গীত' আরম্ভ করিল। জনৈক পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রের নির্দ্দেশে শিউলিপাড়ায় নীলজবা খুঁজিতে আসিয়াছিলেন, সন্ন্যাসী-বালককে দেখিয়া তিনি কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন—অবশ্য প্রস্থানও করিলেন 'রহস্যটা' দেখিবার জন্য।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম শঙ্করাচার্য্য ও সনন্দন। সনন্দন জানাইলেন—অদ্য মণ্ডনের পিতৃশ্রাদ্ধ—দ্বারবানেরা সন্ন্যাসীদের প্রবেশ করিতে দিবে না!—গৃহে শব থাকায় যেমন কার্য্য পণ্ড হয় সন্ন্যাসীর আগমনেও একই বিঘ্ন! শঙ্কর মণ্ডন মিশ্রের গৃহে প্রবেশ করিবার উপায় স্থির করিলেন—মণ্ডনের গৃহপার্শ্বের নারিকেল তরু মস্তকে ধারণ করিয়া তাহাকে গৃহপ্রাঙ্গণে স্থাপন করিবে। (**অলৌকিক শক্তি নং ৪**)। সনন্দনের মনে নতুন ধারণা জন্ম লইয়াছে "মীমাংসা সম্ভব নহে তর্কবলে

কভু!”…প্রত্যেক দর্শন ঋষি বিরচিত কিন্তু দর্শন পরস্পর বিরোধী।” এই দার্শনিক বিরোধে তাহার অন্তর আকুল, মনে সন্দেহ—‘প্রত্যক্ষ কিরূপে হবে সত্যের মূরতি!’ শঙ্কর সনন্দনের সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করিলেন—তর্কে সত্য নিরূপিত হয় না, স্বীকারও করিলেন। শঙ্কর তখন বিমল অদ্বৈতপন্থা এবং বেদার্থের মর্ম্ম—‘অস্তি ভাতি প্রিয়’—মহাবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝাইলেন। সনন্দন প্রশ্ন করিতে ছাড়িলেন না—‘তিনি আমি দ্বৈত বোধ, অদ্বৈত কিরূপে?’ শঙ্করও উত্তর দিলেন—(তবে খাঁটি ব্রহ্ম সূত্রের উত্তর নহে)—‘প্রিয় জ্ঞানে এক জ্ঞান জন্মে ব্রহ্ম সনে।’ ‘এই প্রিয় জ্ঞানে ক্ষুদ্র অহ্‌ম বিনাশ—ক্ষুদ্রত্ব ত্যজিয়া হয় অসীম অহ্‌ম।’ তখনই— সোহহং ভাব। সনন্দন তবু প্রশ্ন করিলেন —‘তবে কেন আমা সবে দেন কার্য্যভার। শঙ্কর মায়ার প্রভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সৎ এবং অসৎ কার্য্যের ফলশ্রুতি শুনাইয়া সনন্দনকে নিরস্ত করিলেন।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

উগ্র ভৈরব (জনৈক কাপালিক) ও গণপতির বশীকরণ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা। মহামায়াকে হাত করিবার জন্য উভয়ের চেষ্টা। মহামায়াকে কেহই চিনিতে পারিল না। তাঁহার হেয়ালিপূর্ণ কথাও বুঝিতে পারিল না। উগ্রভৈরব মহামায়ার সহিত প্রেম করিতে চাহিলেন। সর্ত্ত হইল—উগ্রভৈরব শঙ্করাচার্য্যকে বধ করিবে এবং তাহার শাস্ত্র প্রচার করিবে। মহামায়ার সখীরা—অবিদ্যা মহাচরীগণও প্রবেশ করিয়া গীত গাহিলেন—‘হেসে হেসে কাছে বসে মন্‌মোহিনী মন মজাই।’

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মণ্ডনমিশ্রের কক্ষ। পিতৃশ্রাদ্ধোত্থত মণ্ডনমিশ্র ও পুরোহিত। "সহসা নতশির নারিকেল বৃক্ষ হইতে মুণ্ডিত মস্তক ও কন্থাধারী শঙ্করাচার্য্যের অবতরণ।" **(অতি প্রাকৃত ঘটনা নং ৯)**। শঙ্কর ক্রুদ্ধ মণ্ডনমিশ্রের সহিত ব্যঙ্গ পরিহাস করিয়া কথার উত্তর দিতে লাগিলেন। কথা কাটাকাটি হইল প্রচুর। শেষ পর্য্যন্ত শঙ্কর তর্কযুদ্ধের প্রার্থনা করিলেন। মণ্ডন নিজের খ্যাতিবাদ করিয়া বিবাদে প্রস্তুত হইলেন—তবে উপযুক্ত মধ্যস্থ চাওয়া হইল। পণ হইল, পরাজিত হইলে পরাজিত বিজয়ীর একে অন্যের আশ্রম গ্রহণ করিবেন। শঙ্কর মধ্যস্থ নির্ব্বাচন করিলেন উভয় ভারতীকে।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

বনপথ। দুইজন পণ্ডিতের প্রবেশ। মণ্ডন পরাজিত হইবেন কি শঙ্কর পরাজিত হইবেন ইহাই ভাবনার বিষয়। কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের বিবাদের ফল কি দাঁড়াইবে ইহাই দুর্ভাবনা। ইহাদের আলাপের মধ্যেই শিউলি ও শিউলিনীর প্রবেশ—তাহারা চাঁদাকে (শঙ্করকে) খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। পণ্ডিতরা ইতিবৃত্তান্ত শুনিয়া উহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

মণ্ডন মিশ্রের বাটির বিচারমণ্ডপ। মণ্ডনমিশ্র, শঙ্করাচার্য্য ও পণ্ডিতগণ এবং কাণ্ডার-অভ্যন্তরে উভয়ভারতী। মণ্ডন কণ্ঠের মালা শুষ্ক দেখিয়াই পরাজয় উপলব্ধি করিয়াছেন। স্বীকার করিলেন—'সামান্য মানব তুমি নও।' শঙ্করও মণ্ডনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন—কিন্তু মণ্ডনের পরাজয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিতে কহিলেন—'জ্ঞান দীপ্ত নহে কদাচন, বৈরাগ্য না করিলে আশ্রয়।' ...বৈরাগ্যের অমোঘ

প্রতাপ বিবেক আশ্রয়ে 'হয় স্বার্থ বিদূরিত, করে সত্য প্রত্যক্ষ অন্তরে'। শঙ্কর স্বরূপ-দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে মণ্ডন শঙ্করকে 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করিলেন।

তখনই প্রবেশ করিলেন দ্বিতীয় পণ্ডিত—তাঁহার উদ্দেশ্য শঙ্করকে সামান্য মানুষ প্রতিপন্ন করা। মণ্ডন তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না.—অদ্বৈতজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। শঙ্করাচার্য্য প্রথমেই গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিতে বলিলেন—কারণ গুরুবাক্যে বিশ্বাস ছাড়া 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের ধারণা অসম্ভব।

শিউলি ও শিউলিনীকে লইয়া প্রথম পণ্ডিত প্রবেশ করিলেন। শিউলিনী বাৎসল্যে গলিত—ঝাল-টকের ডাল খাওয়াইতে উদ্যত হইল। শঙ্করকে স্পর্শ করিতেই উভয়েরই অদ্বৈত-চেতনা দেখা দিল। শিউলি ও শিউলিনীর ছোট মুখে বড় কথা শোনা গেল। শঙ্করের ধারণা—উঁহারা হর-পার্ব্বতী ছাড়া আর কেহই নহেন। প্রথম পণ্ডিত শঙ্করের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। সকলে শঙ্করকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে শঙ্কর মণ্ডন মিশ্রকে লইয়া প্রস্থানোদ্যোগ করিলেন।

উভয়ভারতী প্রবেশ করিয়া দিলেন বাধা। স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ; অতএব স্ত্রীকে পরাজিত না করিলে স্বামীর সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিতে পারে না। উভয়ভারতী তর্কযুদ্ধে শঙ্করকে আহ্বান করিলেন। কামশাস্ত্রের আলোচনা উঠিতেই শঙ্কর একমাস সময় চাহিলেন এবং প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতশৃঙ্গ। শঙ্করাচার্য্য, সনন্দন, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণ সমুপবিষ্ট। শঙ্করাচার্য্যের ভাবনা—'সন্ন্যাস-আশ্রম মণ্ডন না করিলে গ্রহণ, জ্ঞানকাণ্ড হবে না প্রচার।' কিন্তু 'মহাবিদ্যা মণ্ডনগৃহিণীরূপে

দেবী সরস্বতী।' শিষ্যদের কাছে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন—'করি পরকায় আশ্রয় গ্রহণ কামশাস্ত্র করিয়ে অর্জ্জন, পরাজিব মণ্ডন-পত্নীরে।' নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া যোগদৃষ্টিতে দেখিলেন—(**অলৌকিক শক্তি নং ৫**) মৃগয়া করিতে আসিয়া কোন এক নরপতি তনুত্যাগ করিয়াছেন,—এবং সঙ্কল্প করিলেন 'ওই দেহে এখনি পশিব।...মাসান্তে এ দেহে পুনঃ করিব প্রবেশ।' (**অতিপ্রাকৃত ঘটনা নং ১০**)। সনন্দন আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন—'পশি পরকায় —যোগিশ্রেষ্ঠ মীননাথ মুগ্ধ হন তায়'। শঙ্কর ব্রজধামে কৃষ্ণলীলার দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

সনন্দন আরো একটি কথা নিবেদন করিলেন—কামচর্চ্চা কামআলাপন জন্ম সংস্কার—'বহু জন্ম গ্রহণের হেতু তায় হয়।' শঙ্কর সনন্দনের কথার সত্যতা স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে আশ্বস্তও করিলেন এই বলিয়া—'দেবপ্রয়োজনে মম ধরা আগমন......যদি পশি পরকায় সংস্কার পরশে আমায়, বুঝিব অন্তরে.........সহি যথোচিত মহামায়া-ছলনা প্রভাবে।' শিষ্যদিগকে চিন্তা দূর করিতে বলিয়া শঙ্কর পর্ব্বত-গহ্বর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বনস্থলী। সজ্জিত চিতা-পার্শ্বে অমরক নৃপতির মৃতদেহ। উভয় পার্শ্বে সরমা, অম্বালিকা প্রভৃতি রাণীগণ; সম্মুখে মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। —রাণী সরমা সহমরণে যাইতে কৃতসঙ্কল্পা। অন্যান্য রাণী, মন্ত্রী প্রভৃতি শোকে মর্ম্মাহত। শবদেহ চিতায় তুলিবার উদ্যোগ করিতেই মন্ত্রী দেখাইলেন—'মহারাজ যেন চক্ষু উন্মীলন কচ্ছেন।' 'রাজদেহে শঙ্কর' বলিয়া উঠিলেন—'একি কোথায় আমি—এরা কে?' এমন সময় মৃতরাজার প্রেতাত্মা প্রবেশ করিল। (**অতিপ্রাকৃত ঘটনা নং ১০**)।

রাজা-শঙ্কর প্রেতাত্মাকে বলিয়া দিলেন—'এ দেহে আর তোমার অধিকার নেই।' প্রেতাত্মাকে বিদায় দিয়া শঙ্কর প্রেয়সীদের লইয়া গৃহে গমন করিতে উদ্যত হইলেন; উপবেশন করিলেন এবং কিছু পরেই গাত্রোত্থান করিলেন। রাণী অম্বালিকার সন্দেহ হইল—এ 'কি! কোন প্রেত আশ্রয় করেছে?'

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সম্মুখ। জগন্নাথ ও মহামায়ার একই ধরণের কথা। জগন্নাথ বিশিষ্টার দুঃখে খুবই কাতর। 'মরিবার আগে একবার ক্ষুদে দাদাকে আনা যায় না?'—এই জন্যেই সে ভূত হইতে চায়।—তাঁহার কামনা—'ক্ষুদে দাদাকে এনে মাগীকে দেখাবো।' জগন্নাথের ঐকান্তিক প্রেম দেখিয়া মহামায়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন—'তুমি মুক্তাত্মা, তোমার উপর আর আমার অধিকার নাই।' জগন্নাথ মহামায়ার কথা বুঝিতে পারিল না। তাহার রাগ হইল—'তোর হেঁদো কথা কে বুঝবে বল?'

বিশিষ্টা প্রবেশ করিলেন। মহামায়ার আসল পরিচয় তিনি স্বপ্নে পাইয়া গেছেন—শঙ্করের অর্দ্ধাঙ্গ। বিশিষ্টা নিশ্চিতভাবে জানিলেন দেব-দেব তাঁহার জঠরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হইল—রাঙা জবা দিয়া মহামায়াকে সাজাইবার সাধ পূর্ণ করিতে উভয়েই 'ঘরের মধ্যে চলিয়া' গেলেন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অমরক রাজার অন্তঃপুর-সংলগ্ন উপবন। অমরক-রাজ-দেহাশ্রিত শঙ্করাচার্য্য। শঙ্কর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে আত্মনিমগ্ন। মরমা, অম্বালিকা প্রভৃতি রাণীগণের রঙ্গরস সহকারে প্রবেশ। শঙ্করের

থাকিয়া থাকিয়া মন বিকল হইয়া পড়িতে লাগিল। রাণীরা ভাবিত হইয়া মন্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মন্ত্রী প্রবেশ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মন্ত্রীর প্রশ্নে সরমা খুলিয়াই বলিলেন—'নন ইনি পূর্ব্ব নৃপবর। ......যদিচ বিলাসে মগ্ন দিবস যামিনী, রঙ্গরস কৌতুক-কলাপে রত, কিন্তু কোন আসক্তি হেরিনে কভু।' আরো অনেক সন্দেহ-কারণ ব্যক্ত করিলেন এবং অনেকটা ধরিয়াও ফেলিলেন—'বুঝি যতীশ্বর কোন মহাশয় পশি মৃত নৃপতির কায়, ভোগ ইচ্ছা করেন খণ্ডন।" মন্ত্রী তাহার মন্ত্রনা-লব্ধ ব্যবস্থার কথা রাণীকে জানাইলেন—চারিদিকে দূত পাঠাইয়াছেন, শবদেহ দগ্ধ করিবার জন্ম। প্রতি শবদেহের মূল্য ঘোষণা করা হইয়াছে শতমুদ্রা; আর যোগীর শব-দেহের মূল্য সহস্র মুদ্রা। —যোগিপুরুষদের রাজপুরে আসাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নগরপ্রান্তে পথিপার্শ্বস্থ বটবৃক্ষতল। শান্তিরাম প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ।—সেখানে গণপতির প্রবেশ ঘটিল। আলাপে গণপতির অভিজ্ঞতা বাহির হইয়া পড়িল—"কোথাও কিছু নেই, বুঝলে? সব ফক্কিকারী! বুদ্ধির জোরে যে যা করে খায়।" গণপতির কথায় আরো জানা গেল যে, এক একটা মড়া একশো টাকা, সন্ন্যাসীর শবের মূল্য হাজার টাকা, অর্থাৎ কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি নিশ্চয়ই অনুমান করিয়াছেন—রাজদেহে কোন মহাপুরুষ প্রবেশ করিয়াছেন। সনন্দন প্রভৃতি বিপদের আশঙ্কা বুঝিয়া প্রস্থান করিলেন। গণপতি উগ্রভৈরবকে দেখিয়া ডাক দিলেন, নিজের পরিচয়াদি দিলেন এবং জানাইলেন, এইখানেই শঙ্করাচার্য্য কোথায় আছে। উগ্রভৈরব গণপতিকে একটি ফুল ও মস্তকে

সিন্দুরের টিপ দিয়া রাণীর কাছে পাঠাইলেন। নির্দ্দেশও দিলেন— ফুলটি নাকে শোঁকাইলেই রাজা রাণীদের বশীভূত হইবেন — এবং রাজদেহ ত্যাগ করিয়া যোগী নিজ শরীরে যাইতে পারিবে না।

সনন্দন, শান্তিরাম ও শিষ্যগণ প্রবেশ করিলেন — তাঁহারা গুরুদেবের মুক্তির কোন উপায়ই করিতে পারেন নাই। শেষ পর্য্যন্ত গুরুকেই উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রার্থনা করিলেন।

তখনই মহামায়া প্রবেশ করিলেন — গীত-মুখে। সনন্দন বুঝিল সামান্যা রমণী নয়। পরিচয় চাহিতেই মহামায়া বলিলেন — 'তোমাদের মা!' মহামায়া উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিলেন — শিষ্যদের গায়ক ও যন্ত্রী সাজাইয়া দিলেন। মহামায়া কাছে যন্ত্রবিদ্যা লাভ করিবার জন্য সকলেই তাঁহার সহিত প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

অমরক রাজার বিলাস-গৃহ। সরমা ও অম্বালিকা। সরমার আপত্তি সত্ত্বেও ফুল শোঁকানোই স্থির হইল। দেহাশ্রিত শঙ্করাচার্য্য প্রবেশ করিলেন — সংসারের স্বপ্নময়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে করিতে। রাণী সরমা ফুলটি শঙ্করাচার্য্যকে আঘ্রাণ করিতে দিলেন ; শঙ্কর ফুল আঘ্রাণ করিলেন — ভাবান্তরও হইল, — সংসারকে সুন্দর মনে হইল! — ধারণা জন্মিল "ভোগমাত্র সারবস্তু মানব জীবনে।"

নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি উঠিল — ক্রমে উগ্রভৈরব প্রেরিত অবিদ্যা সঙ্গিনীগণ প্রবেশ করিল ও নৃত্য-গীত আরম্ভ করিল। দেখিতে না দেখিতে 'বিদ্যাসঙ্গিনীগণসহ মহামায়া ও যন্ত্রহস্তে সনন্দন শান্তিরাম প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ প্রবেশ করিলেন এবং — গীত আরম্ভ করিলেন, কা তব কান্তা'.........ইত্যাদি। শঙ্কর প্রকৃতিস্থ হইলেন।

মহামায়া অবিদ্যাকে নিজের দেহে মিশাইয়া লইলেন। (**অতি প্রাকৃত ঘটনা নং ১১**)। শঙ্কর ক্রমে মূলাধার হইতে শক্তিকে সহস্রারে তুলিয়া ষট্‌পদ্ম ভেদ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রপথে বহির্গত হইলেন। —রাণীরা বিলাপ করিতে লাগিলেন।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

মণ্ডনমিশ্রের বাটী। মণ্ডনমিশ্র অন্তর্দ্বন্দ্বে আকুল। যাহা তিনি আগে সত্য জ্ঞান করিতেন, আজ তাহার কাছে তাহা প্রপঞ্চ কেবল। উভয়ভারতী প্রবেশ করিয়া প্রস্তাব করিলেন — 'এস, যেমন ছিলাম তেমনি থাকি।' মণ্ডন অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা ব্যক্ত করিলেন। উভয়ভারতী বিচ্ছেদ অবিচ্ছেদ তত্ত্বের আলোচনা করিলেন।—শঙ্করাচার্য্য প্রবেশ করিতেই উভয়ভারতী পরাজয় স্বীকার করিলেন। উভয়ভারতীকে মঠরক্ষিনী হইতে শঙ্কর অনুরোধ করিলেন —উভয়ভারতী কহিলেন —"তোমার ইচ্ছা কদাচ অপূর্ণ থাকবে না।"

মণ্ডন মিশ্র ব্যাকুল চিত্তে উভয়ভারতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ভারতী নিজের দৈবী সত্তাকে প্রকাশ করিলেন। তিনি চতুর্ম্মুখ-অভিশপ্তা সরস্বতী। উভয়ভারতী অন্তর্হিত হইলেন। (**অতিপ্রাকৃত ঘটনা নং ১২**)। —মণ্ডনের নাম পরিবর্ত্তিত হইল—সুরেশ্বর। শঙ্করের প্রসাদে মণ্ডন দেখিলেন — উভয়ভারতী — শ্বেতশতদলবাসিনী—শ্বেতপদ্মাসনে বিরাজিতা। পট পরিবর্ত্তন হইল। দেখা গেল—কমল-বনে সরস্বতী এবং কলাবিদ্যাগণের গীত হইতেছে।— (**অতি প্রাকৃত ঘটনা নং ১৩**)।

পঞ্চম অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক

পল্লী-প্রান্তস্থ পথ। ক্রীড়ারত বালকগণ 'হাবা'কেই সকলে বুড়ী করিতে চাহে—হাবা নাকি অতি হাবা, হাবার হাত হইতে সকলে খাবার কাড়িয়া খায়—উহাকে মারধর করে, তবু সে কিছু বলে না। হাবা প্রবেশ করিতেই তাহার হস্ত হইতে খাবার লইয়া দ্বিতীয় বালক ব্যতীত সকলেই আহার করিল এবং ক্রীড়া ও গীত আরম্ভ করিল। হাবার বাবা ও মা—প্রভাকর ও প্রভাকর-পত্নী, প্রবেশ করিলেন। মা পুত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু প্রভাকর উদাসীন। জনৈক প্রতিবেশী আসিয়া বলিল—'প্রভাকর, এই দিক দিয়েই মহাপুরুষ যাবেন.........ছেলেটাকে পায়ে ফেলে দাও।' দেখিতে দেখিতে শঙ্করাচার্য্য, সনন্দন, মণ্ডন মিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎমুখ, তোটকাচার্য্য, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণ প্রবেশ করিলেন। শঙ্করাচার্য্য দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—'হেথায় নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ অবস্থান কচ্ছেন'। প্রভাকর হাবাকে শঙ্করাচার্য্যের পদপ্রান্তে রক্ষা করিয়া হাবার প্রকৃতির বর্ণনা করিলেন—। শঙ্করাচার্য্য হাবার মস্তকে হস্তার্পণ করিতেই হাবা আত্মপরিচয় দিতে সংস্কৃত বলিতে আরম্ভ করিল এবং ছোট খাটো একটি বক্তৃতায় বলিল যে, সে শুদ্ধ আত্মা ইত্যাদি। ব্রহ্মতত্ত্ব করগত আমলকী ফলের ন্যায় হাবার হস্তগত দেখিয়া শঙ্কর তাহার নাম দিলেন হস্তামলক এবং তাঁহাকে সঙ্গী করিতে চাহিলেন। প্রভাকর-পত্নী মাতৃর ব্যাকুলতায় আক্ষেপ করিলে শঙ্কর অতীত ঘটনা বিবৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে শিশুটির মৃত দেহে একটি মহাপুরুষের আত্মা যমুনাতীর হইতে প্রবেশ করিয়াছিল। (অতিপ্রাকৃত ঘটনা নং ১৪)। প্রভাকর পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়া পুত্রকে শঙ্করাচার্য্যের পদে সমর্পণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। শঙ্করাচার্য্য তখন শিষ্যদের ভাষ্যের প্রশংসা করিতে

লাগিলেন এবং সুরেশ্বরের ভাবী জন্মের গতি-রূপ যে "বাচস্পতি মিশ্র" তাহা ব্যক্ত করিলেন। (**অলৌকিক শক্তি নং ৬**)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতোপরি কাপালিকের আশ্রমের নিকটবর্ত্তী বনে শঙ্করাচার্য্য। শান্তিরাম আসিয়া একটি অতি জটিল প্রশ্ন তুলিল —অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ এক ব্রহ্মই বিদ্যমান আর সকলই মায়া— এই মতের সঙ্গে দেবদেবী নোড়ানুড়ি নদনদী সব কিছুকেই মুক্তিদাতা বলিয়া স্তব রচনা করার সঙ্গতি কোথায়? তারপর বৈষ্ণব-শাক্ত-শৈব সকল সম্প্রদায়ের উপাসকদের তর্কে পরাজিত করাই বা কেন? —শঙ্করাচার্য্য পূজা স্তব যাগযজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পক্ষে যুক্তি দিলেন — 'যতদিন দেহবুদ্ধি রয়'……ততদিন প্রয়োজনীয়তা আছে।……উপাস্য বস্তুতে প্রিয়জ্ঞান হয় — 'ধ্যান-মুগ্ধ অহর্নিশি রহে, তারপর উপাস্য সহিত হেরে অভেদ আপনি।' আর হীনবুদ্ধি নরের বিদ্যাদম্ভ দূর করিতেই তর্কের প্রয়োজন। শান্তিরাম কথার ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিলেন '—মন পর্য্যন্ত বুঝতে পারি, তারপর আমার স্ব-স্বরূপ আবার কি?' শঙ্কর উহাকেই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন —"কার মন বল দেখি?" ইহার পরে এ বিষয়ে আলোচনা আর চলিল না। শঙ্কর প্রশ্নটিকে এড়াইয়া গেলেন — 'সাধন করো, সমস্ত বুঝবে।' শান্তিরাম সাধন-ভজনের ব্যাপারে থাকিতে চাহেন না। তাঁহার বিশ্বাস — গুরুর কৃপাই বড় কথা। তাঁহার শেষ কথা — 'যা করবার করবেন।' শান্তিরাম প্রস্থান করিলেন — গুরুর কৃপার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই।

প্রবেশ করিল — কাপালিক উগ্রভৈরব। তাহার পন্থা অদ্বৈত

পন্থা নহে। 'সিদ্ধাই-অর্জ্জন' তাহার কামনা। শঙ্করাচার্য্যের দ্বারাই সে সিদ্ধাই লাভ করিতে চাহে। শঙ্করাচার্য্যের কাছে তাহার প্রার্থনা—আপনি আমার মস্তক ভিক্ষা দিন। শঙ্কর সম্মত হইলেন এবং উগ্রভৈরবের আশ্রম-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

গণপতি প্রবেশ করিল—সে কাপালিকের শত শত কুৎসিৎ কর্ম্ম করিয়া অতি বিরক্ত এবং ব্যাকুল। সেই বলিয়াছিল—সে গুরুদেবকে খোঁজে, ওঁকে বলি দিতে চায়......। গণপতি অনুতাপ করিল এবং শঙ্করশিষ্যদের কাছে মার্জ্জনাও চাহিল। গণপতির মনে পড়িল 'আজ অমাবস্যা, আজ গুরুদেবকে বলি দেবার চেষ্টা পাবে!' সনন্দন ও শান্তিরাম মহাব্যাকুল হইয়া পড়িলেন তাঁহাদের তো জানাই আছে 'তিনি দয়াময়, যে যা প্রার্থনা করে, তারই প্রার্থনা রক্ষা করেন।......উনি পরকার্য্যে মস্তক দিতেও প্রস্তুত হবেন!' সকলেই কাপালিকের সন্ধানে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উগ্রভৈরবের আশ্রম। শঙ্করাচার্য্য ও উগ্রভৈরব। শঙ্করাচার্য্য মস্তক দেওয়ার জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। উগ্রভৈরব খড়্গ পূজা করিয়া খড়্গ গ্রহণ করিয়া প্রবেশ করিলেন। 'জয় ভৈরবজি' বলিয়া খড়্গোত্তোলন করিতেই দ্রুতবেগে সনন্দন প্রবেশ করিল—এবং "গর্জ্জন করিয়া সনন্দনের নৃসিংহমূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়া কাপালিককে বিদীর্ণ করণ"। (**অতিপ্রাকৃত ঘটনা নং ১৬**)। ক্রমে মণ্ডন মিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, শান্তিরাম, হস্তামলক ও গণপতি প্রবেশ করিলেন। শঙ্কর নৃসিংহদেবের স্তব (বাংলায়) পড়িতে লাগিলেন। শঙ্কর নৃসিংহ-রূপী পদ্মপাদকে প্রকৃতিস্থ হইতে আদেশ দিলেন। গণপতি সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিল এবং শঙ্করের মার্জ্জনা ভিক্ষা

করিল। শঙ্কর গণপতিকে ক্ষমা ও উপদেশ দান করিলেন। (সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাপালিক-গুরু ক্রকচের আশ্রম। ক্রকচ, কামকলা ও কাপালিকগণ। ক্রকচ তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন—আমাদের ক্রিয়াবলে সশিষ্য শঙ্কর ও সসৈন্য রাজা সুধন্বার বধসাধন করা সত্বর আবশ্যক। কামকলা প্রস্তাব করিল 'শঙ্করকে দলে টানিবার চেষ্টা করা যাউক।' সে প্রতিশ্রুত হইল—শঙ্করকে সে বশীভূত করিবে। ক্রকচ সসৈন্য সুধন্বাকে বাধা দিতে মায়া নদী প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত তান্ত্রিক-সম্প্রদায়কে প্রস্তুত করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বটবৃক্ষতল। কামকলার ধারণা—ক্রকচ মন্ত্রই জানে, রমণীর মন্ত্র অবগত নহে।......'আরে পুরুষ! নারীর নিকট তোদের দম্ভ কিসের!' শঙ্করাচার্য্যকে দেখিয়াই সে মাধুরীজাল বিস্তার করিতে প্রস্থান করিল।

প্রবেশ করিলেন শঙ্করাচার্য্য। সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসক, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শন সম্প্রদায় পরাজিত। পঞ্চোপাসকও পরাজিত—একমাত্র অ-জিত আছে কাপালিক। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের বিনাশ না করা পর্য্যন্ত শান্তি নাই।

'সঙ্গিনীগণসহ কামকলার পুনঃ প্রবেশ' ও "গীত"। কামকলা শঙ্করকে নারী-সম্ভোগের জন্য আমন্ত্রণ করিল। শঙ্কর অবিদ্যারূপিনী কামকলাকে 'জননী' বলিয়া স্বাগত করিলেন এবং কমণ্ডলু হইতে বারি নিক্ষেপ করিলেন। (অলৌকিক শক্তি নং ৭) কাম-

কলার দেহে অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল; কামকলা শঙ্করের কাছে আত্মসমর্পণ করিল এবং প্রতিজ্ঞাও করিল, 'তোমার শত্রুবিনাশে সহায় হব।' শঙ্কর তাহাকে কাপালিকের ভৈরব পূজায় বাধা সৃষ্টি করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। কামকলা প্রভৃতি প্রস্থান করিলে সনন্দন আসিয়া মায়ানদীর বাধার কথা নিবেদন করিলেন। শঙ্কর তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মন্দির-প্রাঙ্গন-মধ্যস্থিত হোমকুণ্ড। পূজারত ক্রকচ—ক্রকচ রুদ্র-ভৈরবের পূজায় রত। তাহার সঙ্কল্প—শত্রু বিনাশ। তখনই সুসজ্জিতা কামকলা প্রবেশ করিল। ক্রকচ কামকলার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল।—সেইক্ষণেই শঙ্করাচার্য্য প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"কাপালিক।" শঙ্কর নিজের পরিচয় দিলেন এবং কাপালিককে অদ্বৈত পন্থা গ্রহণ করিতে অথবা মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। ক্রকচ শঙ্করকেই মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে বলিলেন এবং আভিচারিক ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন—হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিলেন। বিকটাগণ আবির্ভূত হইয়া নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। (অতিপ্রাকৃত ঘটনা নং ১৫)।

শঙ্কর মহাবিদ্যাকে আবাহন করিল—বিকটাগণ অন্তর্হিত হইল। শঙ্কর কাপালিককে দেখাইলেন—মন্ত্র বিফল। ক্রকচ আবার আহুতি দিলেন—ভূতপ্রেতগণ আবির্ভূত হইল। শঙ্কর নন্দিকেশ্বরকে স্মরণ করিলেন, ভূতপ্রেতগণ অন্তর্হিত হইল। ক্রকচ শেষ চেষ্টা করিলেন—ভৈরবকে আহ্বান করিলেন। হোমকুণ্ড হইতে ভৈরব আবির্ভূত হইল। ভৈরব কাপালিককেই তিরস্কার করিলেন এবং শেষে শূলাঘাতে হত্যা করিলেন। শঙ্কর ভৈরবের নিকট দশসহস্র

কাপালিককে ভস্মসাৎ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। ভৈরব শিব-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রলয়াগ্নির কাছে আবেদন করিলেন—'কাপালিকগণকে ভস্ম করো—প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের ভস্ম করো—কপটাচারীরা ভস্ম হোক।' ভৈরব অন্তর্হিত হইলেন।

শান্তিরাম প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিলেন—'আশ্চর্য্য ঘটনা! মায়া-স্রোতকে এক বিদ্যুৎবরণী এক রমণী নিবারণ করিয়াছে··· কাপালিকগণকে—মহাঅগ্নি ভস্মসাৎ করিতেছে।' শঙ্কর তখন কামরূপ যাইবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন এবং সহসা সচকিৎ হইয়া — 'মা মা' করিয়া উঠিলেন। তারপর শিষ্যকে নির্দ্দেশ দিলেন 'তোমরা সকলে মিলিত হ'য়ে অদ্যই কামরূপ অভিমুখে অগ্রসর হও। আমি মাতৃদর্শনান্তর তথায় উপস্থিত হবো।' শঙ্কর বায়বীয় দেহীকে স্মরণ করিলেন এবং গগনমার্গে প্রস্থান করিলেন (**অতি প্রাকৃত ঘটনা নং ১৭**)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটী। শয্যাশায়িতা বিশিষ্টার নিকট মহামায়া ও জগন্নাথ।—বিশিষ্টার কণ্ঠাগত প্রাণ, শঙ্করকে দেখার জন্যই প্রাণ বাহির হইতেছিল না। শঙ্করের আগমন প্রতিক্ষণেই কামনা করিয়া তাহার সময় যাইতেছিল। জগন্নাথ অগত্যা মহামায়াকেই কড়া কথা বলিয়া প্রাণের জ্বালা কমাইতে চেষ্টিত। শঙ্করকেও এক হাত না লইয়া সে ছাড়িল না। বিশিষ্টা ব্যাকুল প্রাণে শঙ্করকে ডাকিতে লাগিলেন। তখনই শঙ্কর শূন্য হইতে অবতরণ করিলেন (**অতি প্রাকৃত ঘটনা নং ১৮**) এবং মাকে বলিলেন —'এই যে মা — আমি এসেছি।' জগন্নাথ শঙ্করকে স্নেহে-আনন্দে তিরস্কার করিতে লাগিলে মহামায়া তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বিশিষ্টা শঙ্করকে বলিলেন—'বাবা, আমার সময় উপস্থিত, পুত্রের কার্য্য করো।' শঙ্কর 'শিবের স্তব' পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বিশিষ্টা ডমরুধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন—শিবলোকে গতি হইতেছে। তাঁহার বড় ইচ্ছা নারায়ণলোকে যাইয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইবেন। শঙ্কর সঙ্গে সঙ্গেই 'নারায়ণের স্তব' পড়িলেন এবং বিশিষ্টা বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন — গোলোকবিহারী মুরলীধারীর পার্শ্বেই পারিষদ-রূপে তাঁহার স্বামী। (**অতি প্রাকৃত ঘটনা নং ১৯**)। পট পরিবর্ত্তন হইলে পূর্ব্বদৃশ্যই দেখা গেল : শঙ্কর, জগন্নাথ ও মহামায়া! জগন্নাথ শঙ্করকে স্বরূপতঃ চিনিয়া ফেলিল। তাঁহার মধ্যেও অদ্বৈতজ্ঞান — 'আমিই এক' — 'আমিই অনেক' — 'সেই-ই আমি' — 'সেই-ই আমি।'—জগন্নাথ প্রস্থান করিলে শঙ্কর ও মহামায়ার মধ্যে নিভৃতালোচনা হইল।—রামদাস ও সখারাম প্রবেশ করিয়া শঙ্করকে অযথা বকাবকি করিল, কিন্তু একঘরে হওয়ার ভয়ে প্রস্থান করিল। শঙ্করের ইচ্ছামাত্রেই শুষ্ককাষ্ঠে মাতৃদেহ আচ্ছাদিত হইল এবং করে অগ্নি প্রজ্জলিত হইল। "সহসা শুষ্ককাষ্ঠে শবদেহ আচ্ছাদিত ও অগ্নি প্রজ্জলিত" হইল। (**অতি প্রাকৃত ঘটনা নং ২০**)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

কামরূপ। কামাখ্যাদেবীর নাটমন্দির। অভিনবগুপ্ত, তৎশিষ্য ও পলায়িত বৌদ্ধ কাপালিকগণ। অভিনবগুপ্ত 'বাঙ্গাল'। তাঁহার কাছে 'শঙ্করটা তো সেদিনকার ছাওয়াল···।' তিনি সকলকেই আশ্বস্ত করিতে বলিলেন—'ভয়টা কিসের? আখ্‌বাএনে শঙ্কইরা আইসা পদসেবা ক'রুব।'···বৌদ্ধ কাপালিকগণ প্রস্থান করিলে 'শিষ্য' অভিনবকে শঙ্করের সহিত তর্কযুদ্ধে নামিতে নিষেধ করিল। সে গুরুকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে বলিল—'একটা রোগ চাইলা

নিয়া শঙ্করের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাও।' অভিনব স্থির করিলেন—'ভগন্দর রোগটা' চালান দিবেন।—মারণ করিবার বিঘ্ন আছে, কারণ বড় যোগী মারণে বিঘ্ন হইলেই আপন মরণ হইবে।

প্রবেশ করিলেন শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডনমিশ্র। শঙ্কর শিষ্যকে প্রশ্ন করিলেন—'আপনিই কি অভিনবগুপ্ত?' শিষ্য জানাইল যে তাঁহার গুরু পূজায় বসিয়াছেন। মণ্ডন মিশ্রকে লইয়া শিষ্যটি গুরুর সমীপে যাইতে প্রস্থান করিল। সেই সময়েই প্রবেশ করিলেন কামাখ্যাদেবী (**অতিপ্রাকৃত ঘটনা নং ২১**)। কামাখ্যাদেবী শঙ্করকে বলিলেন—'তুমি বৃথা পরিশ্রম ক'রে এদেশে এসেছ। এ কপটাচারী বামাচার প্রদেশে সরল অদ্বৈতপন্থা গৃহীত হবে না'।...শঙ্কর জননীর আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন।

কিন্তু তখনই প্রবেশ করিল—ভগন্দর ব্যাধি; সে শঙ্কর-দেহে প্রবেশানুমতি চাহিল। শঙ্কর অভিচার বিদ্যা শাস্ত্রমূলক এবং শাস্ত্র-রক্ষা বাঞ্ছনীয় বলিয়া ব্যাধিকে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতে নির্দ্দেশ দিলেন।

নবম গর্ভাঙ্ক

কামরূপ। শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম। সনন্দন, মণ্ডনমিশ্র, শান্তিরাম, গণপতি, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ।—শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ এবং হস্তামলকের করযোড়ে শঙ্করাচার্য্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান।" হস্তামলকের প্রার্থনা—"প্রভু, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।" হস্তামলক প্রভুর ভগন্দর রোগ প্রার্থনা করিলেন। তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান (**অতিপ্রাকৃত ঘটনা নং ২২**) করিয়া তাহার কারণ জানিয়া লইয়াছিলেন। সনন্দন 'গুরুদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই খলরোগ অভিনবগুপ্তের শরীরে প্রবেশ করাইতে সঙ্কল্প করিলেন।

অভিনব প্রবেশ করিলেন—তর্ক করিতে। কিন্তু সনন্দন মহাক্রোধে রোগটিকে চালনা করিল অভিনবের শরীরে। অভিনব 'মইলামরে' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া শঙ্করের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। অভিনব সশিষ্য পলায়ন করিলেন।

শঙ্করাচার্য্যের জয়ধ্বনি উঠিল। শঙ্করাচার্য্য তখন শিষ্যদের কাশ্মীর অভিমুখে গমন করিবার নির্দ্দেশ দিলেন—কাশ্মীরে সর্ব্ববিদ্যা-প্রকাশিনী সারদাদেবী বিরাজমানা।"

শিষ্যগণ প্রস্থান করিলে—শঙ্কর মহামায়ার প্রভাব স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিন্তা কে বলিবে, কতদিনে কার্য্য ফুরাইবে। এমন সময় প্রবেশ করিলেন গৌড়পাদ। গৌড়পাদকে দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। গৌড়পাদের প্রশংসা-বাক্যে তিনি কৃতার্থ হইলেন। বর দিয়া গৌড়পাদ প্রস্থান করিলেন। —মণ্ডলমিশ্র আসিয়া জানাইলেন—'রাজা সুধন্বা আপনার নিমিত্ত রথ লয়ে উপস্থিত আছেন।"

দশম গর্ভাঙ্ক

কাশ্মীর। সারদাপীঠ। মন্দির-রক্ষক চিন্তিত—'এতদিনে কি কাশ্মীরের গৌরব…এক বালক সন্ন্যাসী দ্বারা বিলুপ্ত হবে।…এই দুর্দ্দম বালক অদ্বিতীয় দ্বারপণ্ডিতদের প্রতিভা বিনষ্ট করিতেছে—যার মনে কি আছে—কে জানে!'

কয়েকজন পণ্ডিত প্রবেশ করিলেন—'সর্ব্বনাশ' ঘোষণা করিতে করিতে। দক্ষিণ দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত। দ্বারোদ্ঘাটনের পর "শঙ্করাচার্য্য ও সনন্দন, মণ্ডনমিশ্র, আনন্দগিরি তোটকাচার্য্য, হস্তামলক, চিৎসুখ, শান্তিরাম, গণপতি প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ ঘটিল। মন্দিররক্ষক শঙ্করকে কিছুতেই সারদা-

পীঠের ভদ্রাসনে স্থান দিতে প্রস্তুত হইলেন না। এমন সময় দৈববাণী শোনা গেল—"বৎস, তুমি একমাত্র এই আসনের যোগ্য। শঙ্করাচার্য্য সারদাপীঠে উপবেশন করিলেন। মন্দির-রক্ষক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সকলের মুখে নরশঙ্কর শঙ্করাচার্য্যের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। শঙ্কর শিষ্যদের দেশদেশান্তরে অদ্বৈতভাষ্য প্রচার করিতে আদেশ দিলেন এবং নিজে কেদারনাথ দর্শন করিয়া কৈলাস গমনের সঙ্কল্প করিলেন।

একাদশ গর্ভাঙ্ক

কৈলাস-সন্নিকটস্থ পর্ব্বত-প্রদেশ। মহামায়ার প্রবেশ ও গীতি। গানশেষে গণপতি প্রবেশ করিল এবং মহামায়াকে দেখিয়াই পলাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মহামায়ার ডাকে ফিরিল। মহামায়া তাঁহার উদ্দেশ্য জানাইলেন—'চোখ খুলে দিতে এসেছি।' খাঁটি পরিচয় না দিয়াই মহামায়া প্রস্থান করিলেন। গণপতি 'যেন আর এক রকম সব' দেখিতে লাগিল।

প্রবেশ করিলেন মণ্ডনমিশ্র ও সনন্দন। সনন্দনের প্রশ্ন—'সমস্ত ভারতে অদ্বৈতমত স্থাপিত হওয়ার সংবাদে সুরেশ্বর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল কেন?' মণ্ডন উত্তরে জানাইলেন—'ঘোর পর্ব্বতপ্রদেশে নিত্য রজনীতে বামাকণ্ঠে বিরহবিধুরা কোন নারী সকরুণ গান করে।' সনন্দনেরও স্মৃতিপথে পড়িল—'সেই এক নারী।' মণ্ডন বলিলেন—'সেই প্রধানা প্রকৃতি—তাঁহার ভয়—"লীলা বুঝি লোপ পায়, অচিরে বা শিবশক্তি হয় সংমিলিত।"

সেইক্ষণে শঙ্কর এবং শান্তিরাম, হস্তামলক, আনন্দগিরি চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য প্রভৃতি শিষ্যগণ প্রবেশ করিলেন। শান্তিরামের চোখে পড়িল—'গিরিশৃঙ্গ ভেদ করে সলিল উত্থিত হ'চ্ছে।' শঙ্কর

বুঝাইলেন—ভগবতী কিরূপ কৃপাময়ী। উষ্ণ প্রস্রবণ দ্বারা উত্তাপ সৃষ্টি করিতেছেন। সকলে শঙ্করের জয়ধ্বনি ঘোষণা করিলেন। শঙ্কর মহামায়ার উল্লেখ করিয়া বলিলেন—'উনিই আমায় সংসারে এনেছেন, আবার উনিই আমায় সংসার হ'তে ল'য়ে যাবার জন্য এসেছেন।' শিষ্যদের সান্ত্বনা দিয়া শঙ্কর কৈলাসসদনে প্রস্থান করিলেন।

পটপরিবর্ত্তন হইলে দেখা গেল কৈলাস, দেবগণবেষ্টিত বৃষভোপরি হরগৌরী। শঙ্কর বলিলেন—'বৎস, নরলীলা অবসান মম···কার্য্য অবসানে মম সম নিজস্থানে করিও প্রয়াণ···খেদ পরিত্যাগ করো। যে স্থলে বেদান্ত চর্চ্চা হবে, জেনো সেই স্থলেই আমরা যুগলে উপস্থিত হব।'···সমবেত সঙ্গীত উঠিল "বৃষভ-আসনে জগত পিতা"······

শঙ্করাচার্য্য সমালোচনা

মুখবন্ধে কয়েকটি কথা

রসাস্বাদনে প্রথম ও প্রধান চাহিদা একটি সহৃদয় হৃদয়—সমান হৃদয়। সমান হৃদয় না হইলে বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাব প্রভৃতি সংবাদ পূর্ণ আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে না ; এবং পারে না বলিয়াই স্রষ্টার সৃষ্টি মূল্যহীন তথা অসার্থক হইয়া যায়। ভবভূতি এই কারণেই —একজন 'সমানধর্ম্মা'কে খুঁজিয়াছিলেন— এককালে এবং একস্থানে তাঁহাকে না পাওয়া গেলেও হতাশার কারণ নাই,— কারণ কাল নিরবধি এবং পৃথ্বীও বিপুলা। রসাস্বাদনে সহৃদয় হৃদয় অপরিহার্য্য। এই হৃদয়ের অভাবে বা অপর্য্যাপ্ত সংভাবে রসাস্বাদন ব্যাহত হইতে বাধ্য।—কারণ, রস স্রষ্টার ভাষাময় সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার হৃদয়ের সংযোগেই উৎপন্ন।

এখন বড় প্রশ্ন—সহৃদয় হৃদয়ের লক্ষণ কি? হৃদয়ে কি থাকিলে হৃদয় সহৃদয় হয়? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, যে-হৃদয় স্রষ্টার হৃদয়-ভাবের সহিত ভাবে ও বিশ্বাসে এক তাহাকেই সমান হৃদয় বলা যায়। এই উত্তরটির একটু বিশেষ আলোচনা আবশ্যক।

মানুষের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক স্থায়িভাব (Psycho-Physical Disposition) আছে। এই মৌলিক স্থায়িভাবের সংখ্যা দশ বা দশের অধিকই— যতই হউক না কেন, মানুষ মাত্রেই উহারা বর্ত্তমান এবং সেই হিসাবে—অর্থাৎ স্থায়িভাবের দিক দিয়া, এক মানুষ অন্য মানুষের সহিত 'সমান হৃদয়'। কিন্তু এই স্থায়িভাবগুলির একটা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম থাকিলেও সমাজে সমাজে উহাদের প্রকাশগত পার্থক্য

আছে—বা রীতি আছে। এই ভাব-রীতিই প্রথায় পরিণত হয় এবং সেই সমাজের অনুভাব প্রকাশের বিশেষ রীতি হইয়া দাঁড়ায়। এই ভাব-রীতিই সমান-হৃদয়ের কেন্দ্রীয় উপাদান।

কিন্তু এই উপাদান ছাড়াও তাহাতে আরো অনেক কিছু থাকে এবং ঐ আরো অনেক কিছুতেই এক হৃদয়ের সহিত অন্য হৃদয়ের, এক যুগের হৃদয়ের সহিত অন্য যুগের হৃদয়ের বিশেষ এবং বড় পার্থক্য। —এই "আরো অনেক কিছু" ব্যক্তির বা যুগের ধারণা-প্রেরণা, বিশ্বাস-প্রবণতা প্রভৃতি।

এই সকল উপাদান দিয়াই "বাসনা-চক্র" গঠিত এবং ঐ 'বাসনা-চক্রের প্রকৃতির উপরেই রসাস্বাদনের তারতম্য নির্ভর করে। এই কারণেই বিশেষ এক যুগের বা বিশেষ ধরণের হৃদয়ের সৃষ্টি যুগান্তরের বা অন্য ধরণের হৃদয়ের কাছে যখন আবেদন করিতে যায়, তখন আবেদনের অনেকখানি এখানে ওখানে বাধিয়া নষ্ট হইয়া যায়—মনটা সহজভাবে এবং সর্ব্ববিষয়ে নড়িয়া উঠে না, ফলে রস-সৃষ্টি অব্যাহত গতিতে হইতে পারে না। এক কালের কাছে যাহা বিস্ময়কর, চমকপ্রদ এবং বিশ্বাস্য, অন্যকালের কাছে তাহাই হয়ত সাধারণ, হেয়, এবং অবিশ্বাস্য—ফলে হাস্যকর। এক কালের করুণ রীতি অন্যকালের কাছে হয়ত হাস্যকর হইয়া দাঁড়ায়। এক কালে যাহা শ্রোতার বা দর্শকের চোখের জল টানিয়া বাহির করিয়াছে, অন্যকালে তাহাই হয়ত হাসি ঠেলিয়া তুলে। বিশ্বাসের আবহাওয়ায় যাহা খুব স্বাভাবিক ও গম্ভীর, অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় তাহাই হয় অস্বাভাবিক এবং অতি হেয়—তথা হাস্যোদ্দীপক।

পৌরাণিক এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনাময় ধর্ম্মমূলক নাটকাদি আস্বাদনে এবং সমালোচনায় উল্লিখিত মীমাংসাটুকু বিশেষভাবেই স্মরণীয়। পৌরাণিক যুগে স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যে ব্যবধান খুব কমই ছিল; দেবতারা

ইচ্ছা হইলেই মর্ত্তে অবতীর্ণ হইতেন, আবার মর্ত্তের ধর্ম্মাত্মারা দৈবকৃপায় স্বর্গের সভাতে যাইয়াও বসিতে বসিতেন। দেবতার ঔরসে মানবীর গর্ভে সন্তানাদি হওয়া বা কোন দেবীর মানবকে পতিরূপে বরণ করা—সে যুগে অতি স্বাভাবিক ঘটনা। তখনকার যে কোন বড় বড় ব্যক্তি শাপভ্রষ্ট দেবতা বা সিদ্ধ পুরুষ। মোট কথা, সে-যুগে দেবতা এবং মানুষের সম্পর্ক অধিক ঘনিষ্ঠতর ছিল। দেবতাকে নরাকারে, নরকে দেবতারূপে একটু খুঁজিলেই পাওয়া যাইত। পৌরাণিক যুগ অবতারের যুগ, দেবলীলার যুগ, দেবতা-বিশ্বাসের যুগ; উহা অতিপ্রাকৃত ঘটনার যুগ, অলৌকিক শক্তির এবং নিয়তির ইচ্ছার যুগ। এই যুগের হাওয়াই পরবর্ত্তী যুগে প্রবাহিত হইয়াছে দেবতা-বিশ্বাসের এবং যোগ-সাধনায় তথা অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসের মাধ্যমে।

এই যুগকে ঠিক পৌরাণিক যুগ বলা যায় না বটে, কিন্তু পৌরাণিক যুগের বহু লক্ষণ এই যুগে আছে। এই যুগেও অবতার-বিশ্বাস আছে, দেবতার আবির্ভাব বা দর্শনদান আছে, যোগ-প্রভাব তথা অলৌকিক ঘটনা আছে। এই যুগকে যোগ-সাধনার বা দেবকৃপার যুগ বলা যায়—এই যুগ miracle-এর যুগ বা সাধক-যুগ।

এই যুগের আবহাওয়ায় এবং বিশ্বাস লইয়া যে নাটক রচিত, সেই নাটকের আস্বাদনে আধুনিক যুগের হৃদয় সম্পূর্ণ সহৃদয় হইতে পারে না। এবং পারে না বলিয়াই নাটকখানির সে বিচারে অবিচার হইবার সম্ভাবনা আছে বেশী। আধুনিক মনের কাছে অবতারবাদ, দেবতাবাদ এবং অলৌকিক ঘটনা শ্রদ্ধা পায় না। অবতারের কল্পনা, দেবতার আবির্ভাব এবং অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা তাহার গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়,—এবং মনকে অ-তন্ময় করিয়া ফেলে এবং ঘটনার আন্তরিকতা ও একাগ্রতা নষ্ট করিয়া দেয়।

আধুনিক যুগ বৈজ্ঞানিক মনোভাবের যুগ—কার্য্যকারণ-তত্ত্বের বিশ্বাসের যুগ,—মনস্তত্ত্ব-কৈবল্যের যুগ আধুনিক মনের কাছে অসাধারণ (abnormal) আছে, কিন্তু অতিপ্রাকৃত নাই; ভ্রান্তি (Illusion & hallucination) আছে, কিন্তু দেবতার আবির্ভাব নাই। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে বিশ্বাস—প্রত্যক্ষলব্ধ সত্যে বিশ্বাসই—আধুনিক মনের বড় বৈশিষ্ট্য। এই মনের সংখ্যা, গণনায় যত কমই হউক, ইহাই আধুনিক মন। এই মনের কাছে পৌরাণিক ও ধর্ম্মমূলক নাটকের আবেদন ততখানিই, যে পরিমাণে উহা হৃদয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপস্থাপনা হিসাবে সার্থক—যে পরিমাণে উহা কবি-কল্পনায় সমৃদ্ধ, চরিত্র-সৃষ্টিতে লক্ষণীয়। আধুনিক মনের কাছে ইহাদের সমাদর প্রাপ্তি স্বাভাবিক নহে—এবং উপেক্ষার জন্য ইহারা সমুচিত মূল্য হইতেও বঞ্চিত হইতে পারে। এই আশঙ্কা আছে বলিয়াই শঙ্করাচার্য্য নাটকের সমালোচনামুখে কথাটিকে একটু স্মরণ করা উচিত মনে করিলাম এবং পাঠকদিগকেও একটু স্মরণ করাইলাম।

শঙ্করাচার্য্য নাটকের জাতিপরিচয়

শঙ্করাচার্য্য একখানি পঞ্চাঙ্ক (৩৮ গর্ভাঙ্ক) প্রায়-পৌরাণিক মহাপুরুষ-চরিত নাটক—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী দার্শনিক শঙ্করাচার্য্যের অভিযানপূর্ণ জীবন-কাহিনীর নাট্য-রূপ। নাটকখানির বিষয় ঐতিহাসিক যুগেরই একজন মহাপুরুষের জীবন—৭ম বা ৮ম শতাব্দীর একজন দিগ্বিজয়ী দার্শনিকের বিচার-শক্তির মহিমা-খ্যাতি—এবং সেই হিসাবে নাটকখানি অপৌরাণিক বটে, কিন্তু নাট্যকারের নিজের বিশ্বাস-প্রবণতার ফলে এবং যুগধর্ম্মের প্রভাবে—শঙ্করাচার্য্যের জীবন-চরিত্রের অভাবেও বটে—

নাটকখানি আকারে-প্রকারে পৌরাণিক হইয়া পড়িয়াছে। পৌরাণিক নাটকের সমস্ত লক্ষণই নাটকে পাওয়া যায়। প্রস্তাবনা-দৃশ্যে দেবতার মর্ত্যে আগমনের কারণ বা সঙ্কল্প, অতিপ্রাকৃত ঘটনার বাহুল্যাদি এবং নররূপে দেবদেবীর অবতারের সাহায্যার্থে মর্ত্যে বিচরণ-আচরণ পর্য্যন্ত সব-কিছুই নাটকে প্রচুর পরিমাণে আছে। এই দিক দিয়া বলা চলে, শঙ্করাচার্য্য নাটকে অপৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে পৌরাণিক নাটক রচনার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এইরূপ হইবার কারণ — নাট্যকারের বিশ্বাস এবং যুগের প্রভাব। নাট্যকার রামকৃষ্ণের মধ্যেও অবতারবাদের বড় সমর্থন ও অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত যেমন পাইয়াছিলেন, তেমনি পাইয়াছিলেন দেবদেবীর আবির্ভাবের বা দর্শনদানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ—দেবকৃপার এবং যোগসাধনার প্রভাবের দৃষ্টান্ত। আর বিবেকানন্দের মধ্যে পাইয়াছিলেন শঙ্করাচার্য্যের নতুন সংস্করণকে—বিচারের দিগ্বিজয়ী অভিযানকে। বিবেকানন্দের অভিযান বেদান্তেরই অভিযান এবং অভ্যুত্থান; আর যেখানে বেদান্ত সেখানেই শঙ্করাচার্য্য, সুতরাং শঙ্করাচার্য্য তখন যুগেরই জিজ্ঞাস্য—শঙ্করাচার্য্য তখন জাগ্রত হিন্দুত্বের বিজয়-পতাকা-রূপে যুগমনের স্কন্ধে স্মরণীয় রূপে, মনের প্রকোষ্ঠে চিত্ররূপে লম্বিত। কিন্তু, যেহেতু নাট্যকার ছিলেন সংস্কারের দিক দিয়া পৌরাণিক যুগেরই মানুষ এবং যুগের হাওয়াই ছিল পৌরাণিকতায় পূর্ণ,—শঙ্করাচার্য্য-নাটকের আকার-প্রকার হইল পৌরাণিকপ্রায়। আর একটি কারণও ছিল বিশেষভাবে সক্রিয়। শঙ্করাচার্য্যের জীবন-কথা রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন। যেটুকুও পাওয়া গিয়াছে—তাহাও অলৌকিক রহস্যের আবরণে আবৃত—অতিপ্রাকৃত ঘটনায় সমাকীর্ণ। শঙ্করাচার্য্যের জীবনকথা ভাসমান তুষারপর্ব্বতের মত — মাত্র সামান্যাংশেই লৌকিক আর অধিকাংশই

অলৌকিকতার মধ্যে নিমজ্জিত। প্রকৃত জীবন-চরিতের অভাবের জন্যও নাটকখানি অতি নির্ব্বিঘ্নে পৌরাণিকপ্রায় হইতে পারিয়াছে।—নাট্যকার অনুকূল বাতাসে পাল তুলিয়া দিতে পারিয়াছেন। অতএব এইরূপ সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যাইতেছে যে— শঙ্করাচার্য্য নাটকখানি পৌরাণিকপ্রায় অপৌরাণিক 'মহাপুরুষ-চরিত' নাটক। (ইংরাজী মতে ইহা একখানি 'miracle-play' ছাড়া আর কিছুই নহে।)

নাটকের রস-পরিচয়

প্রথমেই প্রশ্ন জাগিবে—শঙ্করাচার্য্য প্রধানতঃ কোন রসের আলম্বন বিভাব? কারণ এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নাটকের প্রধান-রস-বিচার নিহিত আছে। আর এই উত্তর এক কথায় না দিলে প্রথম হইতেই শঙ্করাচার্য্যের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ-ধারা অনুসরণ করিয়া দেখিতে হইবে—দেখিতে হইবে কোন্ ভাবটি শঙ্কর-আলম্বনে নাটকে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

শঙ্কর অতিপ্রারম্ভেই অন্তরাত্মার অশরীরী নির্দ্দেশবাণী শুনিয়া নিজের স্বরূপ চিনিয়া ফেলিয়াছেন—উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি চৈতন্যস্বরূপ আর 'কার্য্যে নরকায়'। তাঁহার 'সন্ন্যাস গ্রহণে সাধ সদা মনে'। তিনি যতি-পন্থা-প্রার্থী। তাঁহার মনে আলোড়িত হয়—'এসেছি কি কাজে—কিবা কাজে যায় দিন'। তাঁহার দৃষ্টিও খুলিয়া গিয়াছে— স্পষ্টতই দেখিয়াছেন: 'ভীষণ তরঙ্গরঙ্গে খেলে মহামায়া··· জীবকুল ভাসমান মহান্ধকারে···ভ্রম-বলে রহে ভুলে কল্যাণ না চায়'। সঙ্কল্পও জাগে—'ছেদিব, ছেদিব মায়ার বন্ধন দৃঢ়'।

কিন্তু সংসার-ত্যাগের বড় বাধা—মায়ের ইচ্ছা। মায়ের অনুমতি না পাইলে কেমন করিয়া তিনি মাকে ছাড়িয়া যাইবেন? মায়ের প্রতি শঙ্করের মমতা না আছে এমন নহে। মায়ের প্রতি মমতাবশেই

শঙ্কর দূরবর্ত্তী নদীকে বাড়ীর নিকটবর্ত্তী করিয়া আনিয়াছিল কিন্তু তবু বৈরাগ্য প্রবল। কৌশলে মায়ের অনুমতি আদায় করিয়া শঙ্কর সন্ন্যাসী হইলেন। সংসারের অনিত্যতা—জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব মাকে অনেক কথা শুনাইয়া শঙ্কর গৃহত্যাগ করিলেন। এ পর্য্যন্ত শঙ্করের জীবনে বৈরাগ্যের চেতনাই প্রবল। সুতরাং শমই স্থায়ীভাব। অবশ্য 'শম' সাধারণ অর্থেই—religious instinct অর্থে।

তারপর গোবিন্দনাথকে গুরুপদে বরণ করা— সেখানেও গুরুভক্তি অপেক্ষা আত্ম-তত্ত্ব-বিশ্লেষণে শঙ্কর অধিক মগ্ন— এখানেও চিত্ত 'ব্রহ্মণি লগ্নঃ'। গুরুর 'কি নাম তোমার' এই প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলিলেন— 'চিদানন্দ শিবময় স্বরূপ আমার'...দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে মণিকর্ণিকার ঘাটেও শিব-স্তোত্র পাঠ এবং শেষ পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্বে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে অবস্থান।

ইহার পরেই শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানবীরত্বের অভিযান। প্রথমেই ব্যাসের সহিত তর্ক — অবশ্য নেপথ্যে। ক্রমে, বৃদ্ধ বৌদ্ধ কাপালিককে কমণ্ডলু হইতে জল নিক্ষেপ করিয়া নিস্পন্দ করা, মণ্ডনমিশ্রকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করা—উভয়ভারতীকেও পরাজিত করিতে অমরক রাজার মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা এবং উভয়ভারতীকে বিনা তর্কে পরাজিত করা—উগ্রভৈরবের সিদ্ধির জন্য আত্মবলি দিতে স্বীকার করা, তথা উগ্রভৈরবকে বধ করা, কাপালিক ক্রকচের হত আভিচারিক ক্রিয়ার যুদ্ধ, কামাখ্যায় অভিনব গুপ্তকে পরাজিত করা এবং শেষে কাশ্মীরের সারদাপীঠের পণ্ডিতদিগকে পরাজিত করিয়া সারদাপীঠে উপবেশন — এইগুলিই শঙ্করাচার্য্যের মোট কার্য্যাবলী—কোনটি জ্ঞানবীরত্বের, কোনটি বা যোগপ্রভাবের, কোনটি বা দৈবকৃপার। কিন্তু বড় কথা এই যে, কোন তর্কযুদ্ধই [illegible] হয় নাই, মাত্র যুদ্ধের বর্ণনা ও ফলই জানা যায় এবং শঙ্করের

বিপ্লবীরত্ব অনুমানই করিতে হয়। দৈবকৃপার স্থলগুলি দৃষ্ট হইলেও তাহা শঙ্করের যোগপ্রভাবের নিদর্শন হইতে পারে নাই। মাত্র দুই একটি স্থলেই যোগপ্রভাব দৃশ্য অবস্থায় পাওয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় নাটকখানিকে **জ্ঞান-বীর-রসাত্মক** বলিবার একটা ঝোঁক আসিতে পারে না কি? কিন্তু আসিলেও তাহা বলা সঙ্গত না। কারণ কিছু কিছু আগেই উল্লিখিত হইয়াছে এবং বিশেষ কারণ এই যে, নাটকখানিতে বীরত্ব অপেক্ষা শমই প্রধান ভাব হইয়া পড়িয়াছে— আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ নাটকের আদি-মধ্য-অন্ত ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। অদ্বৈততত্ত্ব সেই নাটকের প্রধান রস— অন্য সব সহকারী-মাত্র। অদ্বৈত-তত্ত্ব-রসকে 'শান্ত' ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। অতএব নাটকখানিকে শান্তরসাত্মকই বলা যুক্তিযুক্ত।

নাটকের অন্যান্য রস

(ক) **বাৎসল্য**—শান্ত বা অদ্বৈততত্ত্বের ভাবের পরেই নাটকে এই রসটির প্রাধান্য দেখা যায়। শঙ্করাচার্য্যের মাতা বিশিষ্টা এই রসের প্রধান অবলম্বন। স্নেহপরায়ণা মাতার প্রাণবান চরিত্র বহন করেন এই বিশিষ্টা। পুত্রের জন্য তাঁহার আতঙ্ক ও ব্যাকুলতা যত তীব্র, তত তীব্রই তাহার স্বল্পভাষিনী নিরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠশোচনা। পুত্রের বিচ্ছেদে তাঁহার মাতৃত্বের কাতর অনুনয় প্রাণস্পর্শী— আমি বিদায় দেবো তো বলেছি! আব একটিবার দেখে বিদায় দেবো।" তাঁহার চেতনা কখনও মূর্চ্ছায় আচ্ছন্ন, কখনও উন্মত্তপ্রায়।— কখনও মূর্চ্ছা, কখনও ভ্রান্তি বা ভাবসম্মিলন খুবই হৃদয়স্পর্শী। তাঁহার ভুল হয়— 'শঙ্করের মা ডাক কাণে আসে।' তখনই ছুটিয়া বাহিরে আসেন—'কেরে, আমায় মা বলে ডাকলি! শঙ্কর এলি'! যেমন অন্ন তেমনই পড়িয়া থাকে—একটা ভাতও দাঁতে কাটেন না, কাঁদিয়া

কাঁদিয়া চক্ষু অন্ধপ্রায়—সন্তানের চিন্তায় পাগলিনী! সন্তান-বিচ্ছেদ কাতরা মায়ের এদৃশ্য বাৎসল্যের চমৎকার আলেখ্য সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ শিউলিনীর মধ্যেও এই রসের আভাস পাওয়া যায়। জাতিতে ছোট হইলেও সন্তানের জন্য ব্যথা এবং স্নেহ তাহার সকল মায়ের মতই বড়! তৃতীয়তঃ, ইহারই একটি চমৎকার রূপ পাওয়া যায়—জগন্নাথের মধ্যে। শঙ্করকে সে 'ছোট ভাইয়ের মত' দেখে এবং ঐ দেখা আন্তরিকতায় এবং নিষ্ঠায় অতুলনীয়। জগন্নাথ পুরাতন ভৃত্য—কিন্তু শঙ্করের জগাদাদা! এই বন্ধনেই সে একেবারে আবদ্ধ। শঙ্করের জন্য সে কড়া কথা শুনাইতে পারে—এমন কি শঙ্করের মাকেও, মহামায়া তো কোন ছার!

(খ) **হাস্যরস**—জগন্নাথ ও মহামায়ার আলাপে সামান্য আভাসমাত্র দেখা যায়, তারপর মণিকর্ণিকার ঘাটে, সুরাপানমত্ত চণ্ডালদের কথার ভঙ্গিমাতেও হাসি আভাসিত হয়। শঙ্করশিষ্যদের মধ্যে কেবল গণপতির কথার মধ্যেই এই রসের আভাস পাওয়া যায়। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মণ্ডনমিশ্রের তর্ক-তন্ময়তার আতিশয্যেও সামান্য একটু রসের সৃষ্টি হইয়াছে। তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে উগ্রভৈরব ও গণপতির কথোপকথনেও এই রস আভাসিত। পঞ্চম অঙ্কে অষ্টম গর্ভাঙ্কে অভিনব গুপ্ত এই রসের প্রধান স্রষ্টা। অভিনব গুপ্তের অতি-পূর্ব্বীয় উচ্চারণ-ভঙ্গিমাই ('বাঙালে' উচ্চারণ) হাস্যরসের পুষ্টির উপকরণ হইয়াছে।

(গ) **ভয়ানক রস**—চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে উগ্রভৈরবের আশ্রমে শঙ্করাচার্য্যকে বধ করিবার জন্য খড়্গোত্তোলনে অতি সামান্য মাত্রায় আভাসিত। ঐ অঙ্কেরই ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে বিকটাগণের আবির্ভাবে ও গীতে এবং ভূতপ্রেতগণের আবির্ভাবে, নৃত্যগীতে অতি স্থূল প্রক্রিয়ায় রসটি আভাসিত হইয়াছে।

(ঘ) **বীভৎস রস**—দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাশ্রমে বৃদ্ধ বৌদ্ধ কাপালিক ও শিষ্যগণের বচনে ও আচরণে সামান্যমাত্রায় আভাসিত। বালকের হৃদ্‌পিণ্ডের দ্বারা প্রস্তুত সুরার কথা—মাতৃহস্তে বালকের বক্ষোবিদারণেব কথা—জুগুপ্সাজনক।

(ঙ) **অদ্ভুত রস**—অলৌকিক শক্তি—অতিপ্রাকৃত ঘটনা নাটকে বহুস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সব স্থলে বিস্ময়ভাবই জাগ্রত হয় (অন্ততঃ জাগ্রত করা উদ্দেশ্য)। (অতিপ্রাকৃত ঘটনা 'নাটকে শঙ্করাচার্য্য'-অধ্যায়ে বড় হরফ দিয়া উল্লিখিত করা হইয়াছে)।

(চ) **করুণ রস**—তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শিউলিনীর (মৃতপুত্রা) শোচনায় করুণের স্পর্শ পাওয়া যায়। তবে রসে পরিণত হয় নাই, রসের আভাস মাত্র।

নাটকের ভাবপরিমণ্ডল

(১) নাটকের প্রধান ভাব—অদ্বৈততত্ত্ব। শঙ্করদর্শনের মূল তত্ত্বই অদ্বৈততত্ত্ব। (২) দ্বিতীয় এবং আনুষঙ্গিক ভাব জগতের অনিত্যতা; জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব অর্থাৎ মায়াবাদ এবং জীবনের স্বরূপ বিচার। (৩) তৃতীয় জ্ঞানযোগের প্রাধান্য-খ্যাতি। কর্ম্মের প্রয়োজন জ্ঞানের জন্যই। ("সর্বং কর্মাখিলং পার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"—গীতা স্মরণীয়।) কর্ম্মজন্য যে স্বর্গলাভ তাহা নশ্বর কারণজন্য বস্তুমাত্রই নশ্বর। (৪) স্বরূপ দর্শনেই অনন্তে বিশ্রাম। (৫) ত্রিতাপ জ্বালার (ত্রিবিধ দুঃখ) হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে, শান্তিলাভ করিতে হইলে বিবেক আশ্রয় করিতে হইবে (বিবেকখ্যাতি!) এবং গুরুর কৃপা না হইলে সম্ভব নহে—

> ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তি পূজামূলং গুরোঃপদম্
> মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা।

(৬) জ্ঞানযোগেই বিবেকখ্যাতি সম্ভব। এই জন্য 'সার পন্থা সন্ন্যাস গ্রহণ!' (৭) মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিতে হইলে স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে—উপলব্ধি করিতে হইবে 'চিদানন্দ শিবময় স্বরূপ আমার'.........'সত্য নিত্য আনন্দ স্বরূপ।' (৮) সত্য কি তর্কবলে প্রতিষ্ঠা করা যায়? যায় না—"মীমাংসা সম্ভব নহে তর্কবলে কভু' (তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ): 'তর্কযুক্তি শক্তিহীন সত্য নিরূপণে'। (৯) তবে তর্কের প্রয়োজন কোথায়? 'তর্কবুদ্ধি নাশ-হেতু তর্ক প্রয়োজন।' (১০) দর্শন পরস্পর-বিরোধী হইলেও কুতর্করত জনের নিরাশ কারণেই দর্শনের প্রয়োজন। (১১) নির্মল হৃদয়েই সত্যের উদয়: 'সত্যমূর্ত্তি নাহি হয় দর্শনে দর্শন'। (১২) 'একজ্ঞানে বহুজ্ঞান ক্ষয়' পায়। (১৩) কিন্তু "একজ্ঞান জন্মিবে কেমনে? আমা হ'তে প্রিয় আর কি আছে আমার? পুত্র পরিবার......প্রিয় তাহা আমার বলিয়ে। ‡ ব্রহ্মবস্তু প্রিয় মম আমার সমান, জন্মিলে এ জ্ঞান, আমি তিনি ভেদ নাহি রহে। প্রিয়জ্ঞানেই এ জ্ঞান জন্মে ব্রহ্মসনে।" প্রিয়জ্ঞানেই 'অহং-নাশ' হয়, ক্ষুদ্র আমি অসীম হয়। যেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় অমনি 'অহম্' বিলুপ্ত হইয়া যায়; সোঽহং ভাবের উদয় হয়, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার লয় পায়; আত্মজ্ঞানে অবস্থান ঘটে (তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্)। (১৪) এই মহাজ্ঞান সাধন-সপেক্ষ। (১৫) সাধন—নিবৃত্তি (সেই জন্যই সন্ন্যাস শ্রেয়)। (১৬) নিবৃত্তিই যদি শ্রেয় হয় তবে কার্য্য করার আবশ্যকতা কি? আবশ্যকতা আছে। দেহধারী মাত্রেই মায়ার অধীন। 'মায়া কার্য্যে নিয়োগ করিছে নিরন্তর'। (১৭) তবে কার্য্য দুই প্রকার—সৎ এবং অসৎ। অসৎ কার্য্য জ্ঞানকে আবৃত করে, আর সৎকার্য্য-অনুষ্ঠানে কার্য্য ক্ষয় হয়। কার্য্যাবসান না হইলে প্রারব্ধ গঠিত দেহ ক্ষয় হইবে

---

‡ রামকৃষ্ণকে গিরিশ যে কথা বলিয়াছিলেন

না। "কার্য্যে কার্য্যক্ষয় বিনা বন্ধন না যায়"। কারণ "বিদ্যা বা অবিদ্যা মায়া উভয়ই শৃঙ্খল ; স্বর্ণলৌহ শৃঙ্খলের ভেদ যেমতি" ······উভয়েই বন্ধন···। (১৮) প্রারব্ধ বলবান। (১৯) তারপর, ব্রহ্মছাড়া সবাই তো মায়া। তবে পূজা-স্তব-যাগযজ্ঞের প্রয়োজন কোথায় ? প্রয়োজন আছে। 'যতদিন দেহ-বুদ্ধি রহে, পূজাস্তব-যাগযজ্ঞ অতি প্রয়োজন'। মুক্ত-আত্মারাও পূজারত থাকেন, কারণ সমাধি ব্যতীত দেহবুদ্ধি যায় না। উপাস্য বস্তুতে প্রিয়-জ্ঞান, প্রিয়জ্ঞান হইতে ধ্যানধারণ, ধ্যানে ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন, ক্রমে অভেদজ্ঞান। এই জন্যই দেবদেবী উপাসনার প্রয়োজন। ‡ (২০) তবে শাক্ত-বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের সহিত তর্ক করা কেন ? —এক সম্প্রদায় বিদ্যাদম্ভভরে 'হীনজ্ঞান করে মূঢ় ভিন্ন সাধকেরে, অহঙ্কারে ভাবে ভ্রান্ত অন্য সম্প্রদায়'। এই অহঙ্কার-মত্ত ভ্রান্তদের সহিতই তর্ক। 'ইষ্ট যাঁর প্রিয় নিজসম, তর্কে রহে বিরত সে মহাজন সনে'। (রামকৃষ্ণের প্রভাব লক্ষণীয়)। অস্তি ভাতি প্রিয়— এই মহাবাক্যত্রয়ে 'সমুদয় বেদার্থ স্থাপিত।' এই মহাবাক্য স্থাপনের জন্যই তর্ক। (২১) বৈষ্ণববর সেই প্রিয়কে স্বামীর সমান মনে করে, শাক্তরা পত্নীজ্ঞানে তাঁহাকে ভজনা করে। আসল কথা —"প্রকৃতি-প্রভেদে প্রিয় যে সম্বন্ধ যার, সেইরূপ সম্বন্ধ করে ঈশ্বরের সনে।" (২২) যোগ-সাধনারও প্রয়োজন আছে। অভিচার ক্রিয়াদি শাস্ত্র সম্মত বটে, তবে সাধনার বিকৃতি! ষট্‌পদ্ম ভেদ করাই যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।—ব্রহ্মরন্ধ্রেই মুক্তিপথ। *

---

‡ (অদ্বৈততত্ত্বে পৌঁছিবার উপায় স্বরূপে উপাসনার প্রয়োজন)

* ষট্‌পদ্ম :—

১। মূলাধার (পায়ুদেশের কিছু ঊর্দ্ধে, ৪টি দল) কুণ্ডলিনী শক্তির বাসস্থান

২। স্বাধিষ্ঠান (লিঙ্গমূলে অবস্থিত ৬টি দল) বারুণী শক্তি [৩১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

তবে 'যোগমার্গ কর্ম্মমার্গ আদি, বিরচিত সময়-উচিত প্রয়োজনে।' কিন্তু এখনকার মুক্তিপন্থা—আত্মার বিকাশ, অবিদ্যা-বিনাশ, ব্রহ্ম-জ্ঞানে আত্মদর্শন। সুতরাং দেখা যাইতেছে—

হিন্দু দর্শনের সার কথা এবং হিন্দু উপাসনার প্রচলিত রীতি অতি সুন্দরভাবেই নাটকে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। অবশ্য বিকৃত-উপাসনা-পদ্ধতির পরিচয়ও বেশ পাওয়া যায় না এমন নহে। ভাবোপস্থাপনা বিষয়ে নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সিদ্ধান্ত বা সমালোচনা

শঙ্করাচার্য্যের জীবন অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করা শুধু সহজ ব্যাপার নহে— বলা চলে অতি সু-দুঃসাধ্য ব্যাপার। ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে শঙ্করাচার্য্য একজন দার্শনিক— একজন অদ্বিতীয় তর্কযোদ্ধা— এক কথায় বলিতে শঙ্করাচার্য্য একজন মনন-সর্ব্বস্ব ব্যক্তি। তাঁহার জীবনে কর্ম্মমহিমা (action) আছে বটে, কিন্তু সে কর্ম্ম মনের বা বুদ্ধির। তিনিও একজন বীর, তবে তিনি বলবীর নহেন— বিদ্যাবীর — তর্কবীর। আরো একটা কারণ আছে : শঙ্করাচার্য্য বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের যেমন প্রতিষ্ঠাতা তেমনি অন্যান্য মতবাদের খণ্ডনকারীও। অন্যান্য মতবাদের খণ্ডনই শঙ্করা-চার্য্যের জীবনের বড় কীর্ত্তি। শঙ্করের শক্তির উপর যথার্থতঃ

[৩১৭ পৃষ্ঠার পর]

৩। মণিপুর (নাভিমূলে অবস্থিত ১০টি দল) লাকিনী শক্তি
৪। অনাহত (হৃদয়ে " ১২টি দল) কাকিনী শক্তি
৫। বিশুদ্ধ (কণ্ঠদেশে " ১৬টি দল) শাকিনী শক্তি
৬। আজ্ঞা (ভ্রূমধ্যে " ২টি দল) হাকিনী শক্তি
৭। সহস্র দল (মস্তিষ্কে " ৫০টি দল) শিব শক্তি

শিব সংহিতা এবং ষট্‌চক্রনিরূপণ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য]

আলোকপাত করিতে হইলে, শঙ্করের প্রকৃত পরিচয় দিতে হইলে দার্শনিক ও তার্কিক শঙ্করাচার্য্যকেই দৃশ্য করিয়া তুলিতে হইবে। এই জন্য অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক—শঙ্করদর্শনের পরিচ্ছন্ন ধারণা, নানামত খণ্ডনের জন্য শঙ্কর পূর্ব্বপক্ষের এবং সিদ্ধান্তপক্ষের যে যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই সকল যুক্তির সুষ্ঠু জ্ঞান। এই গুণপনা নাট্যকারের না থাকিলে শঙ্করাচার্য্য বিষয়ে উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিতে চাওয়া বা যাওয়া অনধিকার চর্চ্চা ছাড়া আর কিছুই নহে। ঐ ধরণের নাটক শঙ্করাচার্য্যের জীবন-কাহিনীর উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধে রচিত বর্ণনা হইতে পারে, কিন্তু সার্থককাম নাটক নিশ্চয়ই নহে।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে এ কথা অনেকখানি সত্য না হইলেও একেবারে মিথ্যাও নহে। শঙ্করদর্শনের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে গিরিশ-চন্দ্রের ধারণার পরিমাণ যথেষ্ট, কিন্তু একথাও সত্য যে ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের শঙ্করের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় গিরিশচন্দ্রের ছিল না। আর তাহা থাকিলেও নাটকে তাহার প্রমাণ যথেষ্ট নাই। যেখানে শঙ্কর-দর্শনের মূলতত্ত্বের—অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহা সুন্দর ও সুষ্ঠু হইয়াছে, কিন্তু যেখানেই ভিন্নমত খণ্ডনের চেষ্টা করা হইয়াছে, সেখানেই পাশ কাটাইয়া 'নেপথ্যে' চলিয়া যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়াছে। কেবল মণ্ডন মিশ্রেরই সহিত যাহা একটু তর্কাতর্কি হইয়াছে, কিন্তু তাহাও শঙ্কর-পরিচায়ক নহে। প্রায় সব তর্কই 'নেপথ্যে' এবং উল্লেখে। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা—সব দর্শনের সিদ্ধান্তকেই শঙ্কর খণ্ডন করিয়াছেন—মাত্র 'উল্লেখে'। তারপর শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি দর্শনও একই প্রকারে খণ্ডিত হইয়াছে। কেবল বৌদ্ধ কাপালিককে করিয়াছেন 'নিষ্পন্দ', তাহাও কমণ্ডলুর জলের ছিটা দিয়া এবং উগ্র ভৈরবকে

মারিয়াছেন সনন্দনের মধ্যে নৃসিংহ-মূর্তি নারায়ণকে স্মরণ করিয়া বা করাইয়া। আর 'ক্রকচ'কে হত্যা করাইয়াছেন ভৈরবের শূলের আঘাতে। অভিনব গুপ্তের পরাজয় তর্কে নহে— নিজেরই অসতর্ক আভিচারিক ক্রিয়ার হাতে এবং কাশ্মীরের সারদাপীঠের দিক্‌পাল সদৃশ পণ্ডিতদের পরাজয়ও বর্ণনায় বা উল্লেখে। জনৈক পণ্ডিতের মুখে শোনা গেল— একে একে বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, সৌগত, মীমাংসক প্রভৃতি অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণ পরাস্ত হইয়া দ্বার ত্যাগ করিয়াছেন, দিগম্বরপন্থী পথরোধ করিলেও—নিশ্চয় বিফল।

বোধ হয়, শক্তিহীনতার জন্যই নাট্যকার এইরূপ করিয়াছেন —যৌগিকশক্তি তথা অতিপ্রাকৃত ঘটনাকেই বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন; মননের দীপ্তি সৃষ্টি করিতে না পারায় অতিপ্রাকৃত ঘটনার বাহুল্য দ্বারা 'action' সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন।— শঙ্করাচার্য্যের জীবনীর অভাব বা অলৌকিক ঘটনাময়তা নাট্যকারকে সাহায্য করিয়াছে মাত্র। অতএব বিষয়টির উপস্থাপনাকে অতুলনীয় বা পরাকাষ্ঠা বলা চলে না। ইহাই নাটকখানি সম্বন্ধে প্রথম কথা। কাহিনীর ও ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি এবং সেই শক্তির আদর্শ অভিব্যক্তির মাত্রা সম্বন্ধেই এই কথা। এই কথা, নাটকখানি কি হইতে পারিত বা কি হইলে আশানুরূপ হইত, এবং কি হইয়া উঠে নাই, সেই সম্বন্ধেই কথা। সুতরাং ইহা নাটকের বহিরঙ্গের বা আঙ্গিকের আলোচনা নহে, ইহা অন্তরঙ্গেরই আলোচনা —আদর্শ মূর্তিরই আলোচনা। এই আলোচনা নাটকের গঠন সম্বন্ধীয় আলোচনারই অন্তর্ভুক্ত।

নাটকের গঠন

এই প্রসঙ্গেই নাটকের গঠন সম্বন্ধে কথা উঠিতেছে। এই

ধরণের চরিত-নাটকে সন্ধি-বিভাগ সুস্পষ্ট করিয়া তোলা বা বজায় রাখা কাহিনী-পরিকল্পনার বিশেষ শক্তিমত্তার উপরেই নির্ভর করে। বিশেষতঃ যেখানে "বিষয়-ঐক্য" থাকে না,—"ব্যক্তির-ঐক্যই" যেখানে একমাত্র ঐক্য—সেখানে সুস্পষ্ট সন্ধি-বিভাগে কাহিনীকে কল্পনা করা বা বিভক্ত করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই নাটকেও সে ত্রুটি কম নহে। প্রথমতঃ নাটকখানি অপ্রযোজ্যরূপে দীর্ঘ। অভিনয়কালে সময়-সংক্ষেপার্থ একাধিক গর্ভাঙ্ক (মোট ৩৮টির মধ্যে ১১টি—প্রথম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কের শেষভাগ, দ্বিতীয় অঙ্কের ৫ম গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্কের ৩য় ও ৫ম, চতুর্থ অঙ্কের ৩য় এবং পঞ্চম অঙ্কে ১ম, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ৯ম ও ১০ম গর্ভাঙ্ক) পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। তবে অতিদীর্ঘতা অভিনয়-কালের হিসাবের দিক দিয়া দোষাবহ হইলেও নাটকের শৈল্পিক গঠনের সহিত স্বতোবিরোধী নহে। শৈল্পিক গঠনের ত্রুটি প্রধানতঃ ঐক্যঘটিত ত্রুটি, সন্ধিবিভাগ-ঘটিত ত্রুটি—আয়তন-সুষমার ত্রুটি। কৌতূহলোদ্দীপক ও সরস ঘটনা বিন্যাসের দ্বারা আয়তন-সুষমার ত্রুটি অনেক সময় ঢাকা না যায় এমন নহে, কিন্তু আয়তন-বিশেষজ্ঞের চোখে উহা ধরা না পড়িয়া যায় না। যে-কোন মূল্যবান কিছু দিয়া ক্ষতিপূরণ করা হউক না কেন, ত্রুটিকে ত্রুটিই বলিতে হইবে, অন্ততঃ যে-পর্য্যন্ত না বিধান-শাস্ত্র হইতে বিধিটিকে অপসারিত করা হয়।

এই হিসাবেই, শঙ্করাচার্য্যের সন্ধি-বিভাগে ত্রুটি ধরা যায়। গর্ভ-সন্ধি বা বিমর্ষ সন্ধি যেমন পরিস্ফুট হয় নাই, উপসংহার তেমনি শক্তিহীন এবং আকস্মিক হইয়াছে। এই সকল কারণেই, নাটকখানি গঠনের দিক দিয়া যতটা 'নাট্যরূপে কাহিনী' হইয়া উঠিয়াছে, ততটা 'কাহিনীর নাট্য-রূপ' হইতে পারে নাই। যে-কোন কাহিনীকে কথোপকথন-বন্ধে উপস্থাপিত করিলেই "নাটক"

হয় না। "সন্ধি" নাটকের পক্ষে অপরিহার্য্য (সন্ধি পাঁচটিই হউক আর তিনটিই হউক)।

তারপর ঘটনা-সংস্থান তথা কর্ম্মোদ্দীপনার (action) কথা ধরা যাউক। ঘটনা-সংস্থাপনে নাট্যকার অতিপ্রাকৃতের শরণ লইয়াছেন বেশী। ফলে,নাটকে অতিপ্রাকৃতের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে বলা যাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্যের প্রচলিত জীবনীতে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বা অলৌকিক শক্তির কথা না আছে এমন নহে, কিন্তু নাটকে উহার প্রয়োগ আতিশয্য দোষে পরিণত হইয়াছে।

নাটকে action

এই সকল ঘটনা দ্বারাই নাট্যকার নাটকে অতি সহজ উপায়ে কর্ম্মদীপনা (action) সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন এবং সৃষ্টি করিতে সক্ষমও হইয়াছে। অতিপ্রাকৃত ঘটনায় যাঁহারা পূর্ণ আস্থা রাখিবেন, তাঁহাদের কাছে কর্ম্ম-দীপনার মাত্রা খুবই যথেষ্ট হইবে, কিন্তু যাঁহারা উহাতে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে উহার প্রভাব খুব বেশী কার্য্যকরী হইবে না— যাহাকে ঠিক মন বসা বলে তাহাতে ব্যাঘাত ঘটিবেই। তবে ঘটনার আকস্মিকতা ও অসাধারণতা ক্রিয়া-প্রবাহের একতানতা নষ্ট করিয়া চেতনাকে সচকিত করিয়া তুলিবেই এবং অন্ততঃ সেইটুকু ক্রিয়া সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত হইবে। অতএব বলা যাইতে পারে, যে উপায়ে নাটকের ক্রিয়া-প্রাণতা প্রধানতঃ বজায় রাখা হইয়াছে, তাহা শিল্পের দিক দিয়া খুব প্রশংসনীয় নহে। চরিত্রের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বের স্ফুরণে ভাবদ্বন্দ্বের সংঘাতে এবং পরিস্থিতির চিত্তাকর্ষকতা হইতে যে ক্রিয়া-উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয় তাহাই শৈল্পিক মূল্যের দিক দিয়া বেশী প্রশংসার্হ। শঙ্করাচার্য্য নাটকে প্রধানতঃ বাহিরের

ঘটনা দ্বারাই চমৎকার সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেই কারণেই 'action'কে প্রথমশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।

চরিত্র সৃষ্টি

তারপর—চরিত্র-সৃষ্টির কথা। গিরিশচন্দ্রের চরিত্রে আর আর কিছু থাক আর না থাক—একটি বস্তুর অসদভাব প্রায়ই ঘটে না। সে বস্তুটি—অনুভব-তীব্রতা। এই অনুভব-তীব্রতাকেই চরিত্রের প্রাণ-স্পন্দন বলা যাইতে পারে। কারণ নিরাবেগ চরিত্র নাটকের পক্ষে—নিষ্প্রাণ। এই শঙ্করাচার্য্য নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে—সকল চরিত্রই অনুভব-তীব্র এ কথা বলা না গেলেও, এইটুকু অন্ততঃ বলা যায় যে অধিকসংখ্যক চরিত্রেই প্রাণধর্ম্ম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে 'বিশিষ্টা', জগন্নাথ, মণ্ডন মিশ্র ও শঙ্করাচার্য্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্টার বিচ্ছেদ-কাতর মাতৃত্বের স্ফুরণ, জগন্নাথের সেবাপরায়ণতাজনিত অনুভব-চাঞ্চল্য, মণ্ডন মিশ্রের শাস্ত্র-তন্ময়তা, এবং শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত-অনুভূতি এবং অদ্বৈত-প্রাণতা যথেষ্ট ভাবোদ্দীপক। অপ্রধান চরিত্রগুলিও একেবারে নিষ্প্রাণ নহে। কিন্তু কোন চরিত্রেই গভীর ভাবদ্বন্দ্বের সংঘর্ষ নাই; একাধিক ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের জটিলতা বা গভীরতা নাই; তবে কয়েকটি নররূপী দেবতার চরিত্রসৃষ্টিতে নাট্যকার রূপকধর্ম্মী চরিত্র সৃজনের চমৎকার ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। মহামায়া চরিত্রটি মহামায়ারই চমৎকার প্রতিনিধি। রূপক চরিত্রের মত তাহাতে খানিকটা আবছায়া থাকিলেও চরিত্রের বাক্য ও ব্যবহারে মহা-মায়া-তত্ত্ব অতি সুন্দরভাবেই আরোপিত হইয়াছে। তারপর মণিকর্ণিকার ঘাটের 'চণ্ডাল'ও সার্থক সৃষ্টি। এই ধরণের রূপক-ধর্ম্মী চরিত্রসৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্রের দক্ষতা বাস্তবিকই লক্ষণীয়।

চরিত্রের চাল-চলনে বাচন-ভঙ্গিমায় রূপ ও আরোপের একটি অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যায়। এই ধরণের চরিত্র হইতে যে রস পাওয়া যায় তাহা ভাব-সঙ্গতির রস। সেই হিসাবেই চরিত্রগুলি খুবই রসাত্মক। একাধারে "রূপে ও আরোপে সত্য" চরিত্র-সৃষ্টি সৃষ্টি-দক্ষতারই নিদর্শন।

প্রকাশ-শক্তি

'প্রকাশ' কথাটি ব্যাপক-অর্থে—সমগ্র সৃষ্টি-ক্ষমতাই। ইহার মধ্যে কাহিনী-কল্পনা, পরিস্থিতি-স্থাপনা, চরিত্র-বিশ্লেষণ বা বিকাশন, ভাবিক ও বাচিক বিন্যাস সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু বিশেষ অর্থে প্রকাশ-শক্তি বলিতে সমালোচকরা ধরেন—ভাব-বিস্তারকে এবং বচন-বিন্যাসকেই। ভাব-ধারণা ও ভাব-বিস্তার এক হিসাবে এক বটে, কিন্তু ধারণার সহিত বিস্তারের একটু পার্থক্যও আছে। ধারণাটি যখন নানা কল্পনা-রূপের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে তখনই তাহা 'বিস্তার'—তাঁহার অন্য নাম কল্পনা-মহিমা। বচন-বিন্যাস ইহারই একটি বিশেষ পরিণাম, তবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য না আছে এমন নহে। শঙ্করাচার্য্য নাটকে 'ভাব-ধারণা' আছে বটে, কিন্তু খাঁটি 'ভাব-বিস্তার' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা নাই। সুতরাং কল্পনা-মহিমায় নাটকখানি তেমন মহিমান্বিত নহে। তারপর বচন-বিন্যাস—নাট্যকার পাত্রোচিত ভাষা প্রয়োগ করিবার রীতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রায় ক্ষেত্রেই ঔচিত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু দু'এক স্থলে একটু এদিক ওদিকও হইয়া গিয়াছে। অভিনব গুপ্তের মুখে পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষা দিয়া নাট্যকার চরিত্রটিকে খুবই লঘু করিয়া ফেলিয়াছেন—হাস্যরসের আলম্বন হিসাবে তাহার যতই সামর্থ্য থাক না কেন। অধিকন্তু চরিত্রটির

বচন-ভঙ্গিমা সর্ব্বত্র যথার্থ হয় নাই। ৫ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে—অভিনবের উক্তি—হাহ হাহ আমার অভিচারের বলটা হাহো—বগন্দরে জেরে ফেলেচে—সম্পূর্ণ সুষ্ঠু হয় নাই। 'জেরে ফেলেচে' পূর্ব্ববঙ্গীয় কথা নহে যশোহরীয় ভঙ্গি। পূর্ব্ববঙ্গীয় উচ্চারণ—'জাইর‍্যা ফ্যালচে।

যাহাই হউক পাত্রোচিত বচন-বিন্যাসের চেষ্টা নাট্যকার কবি যথাসাধ্য করিয়াছেন (এক অভিনবগুপ্ত বড় এবং সাংঘাতিক ব্যতিক্রম)। তারপর, ভাষা অলঙ্কৃত না হইলেও, মাধুর্য্য-গুণ-বর্জ্জিত নহে। সহজ ভাষায় ভাবোদ্দীপনা করাই নাট্যকারের—প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য। তবে একটি বিষয়ে নাট্যকার প্রথম শ্রেণীর দক্ষতা দেখাইয়াছেন—এই বিষয়টি গীত রচনা। মহামায়ার গান সম্বন্ধে ভৃত্য জগন্নাথ যাহা মন্তব্য করিয়াছে তাহার সহিত মতৈক্য বোধ হয় প্রত্যেকেরই—'ভূতুড়ে গানও এমন মিষ্টি হয়' এই মন্তব্যটি ষোল আনা যথার্থ। মহামায়ার গান, চণ্ডালবেশী মহাদেবাদির গান, শিউলিপল্লীর বালকগণের গীত, বালকগণের ক্রীড়া-গীত, বিকটাগণের ও ভূতপ্রেতগণের নৃত্যগীত পর্য্যন্ত ভাবে-ভাষায় চিত্তাকর্ষক। (বিকটাগণের এবং ভূতপ্রেতগণের গীতে ও উক্তিতে শেক্‌সপীয়রের ভূতপ্রেতের প্রভাব আছে)। পাত্রোচিত হাল্‌কা ভাষায় ভারি ভারি ভাব প্রকাশ করা সহজ ব্যাপার নহে। এই বিষয়ে নাট্যকারের দক্ষতা, বলা চলে, অতুলনীয়। শক্তিমান শব্দশিল্পীর পরিচয় এই সকল গীতাদির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে।

উপসংহার

নাটকখানির পরিপাটি বিশ্লেষণের পরে, রসাত্মক সৃষ্টি হিসাবে উহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া আমরা এই সিদ্ধান্তেই

পৌঁছিতে পারি যে, নাটকখানির গঠন-ত্রুটি, বিষয়ের আদর্শ উপস্থাপনার ত্রুটি এবং অন্যবিধ ত্রুটি আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নাটকখানি মূল্যবান। শঙ্করদর্শনের মূলতত্ত্বটিকে এবং শঙ্করাচার্য্যের জীবনের ঘটনাকে শঙ্করাচার্য্যের চরিত্রের মাধ্যমে সরসভাবে অভিব্যক্ত করার যে মূল্য, সে মূল্য নাটকখানির যথেষ্ট আছে। অতএব নাটকখানি আবেদন-শক্তিতে খুব দুর্ব্বল নহে। অবশ্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে প্রথমশ্রেণী হইতে ইহাকে বাদ দিতে হইবে।

ব্যাসকৃত মহাভারতে ভীষ্মকথা

[আদিপর্ব্বে—৯৬—১০৫ ;

সভাপর্ব্বে—৩৮, ৪০, ৪২, ৪৪, ৬৯, ৭৩ ;

বনপর্ব্বে—২৮২ ;

বিরাটপর্ব্বে—২৮, ৫২, ৬৪ ;

উদ্‌যোগপর্ব্বে—৪৯, ৬২, ১২৫, ১২৬, ১৩৮, ১৫৫, ১৬৭, ১৭২—১৯৫ ,

ভীষ্মপর্ব্বে—৪৩, ৫২, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৭, ৮০, ৬৭, ৯৭, ৯৮, ১০৪, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১২১, ১২২ ;

শান্তিপর্ব্বে—৩৭, ৪৭, ৭৫, ১৩৪, ১৮১, ২৭২……]

শান্তনু-গঙ্গা কথা

ইক্ষাকুবংশে মহাভিষ নামে এক (সত্যবাক্ ও সত্যবিক্রম) রাজা ছিলেন। সহস্র অশ্বমেধ এবং শত রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া তিনি ইন্দ্রকে তুষ্ট করিয়া স্বর্গে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। একদিন দেবগণ ব্রহ্মার উপাসনার জন্য সম্মিলিত হইলে রাজর্ষিগণের সহিত মহাভিষও সেখানে আসন গ্রহণ করিয়া উপাসনায় অংশ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এমন সময় সেখানে গঙ্গা প্রবেশ করিলেন। বায়ুতাড়নায় গঙ্গার দেহবাস স্খলিত হইল এবং তাহা দেখিয়া দেবগণ অধোমুখ হইলেন, কিন্তু মহাভিষ 'অশঙ্কো দৃষ্টবান্নদীম্'। ব্রহ্মা এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া রাজর্ষি মহাভিষকে অভিশাপ দিলেন—"জাতো মর্ত্ত্যেষু পুনর্লোকানবাপ্স্যসি" এবং গঙ্গাও—"সা তে বৈ

মানুষে লোকে বিপ্রিয়াণ্যচরিষ্যতি।" ইহার পর রাজর্ষি রাজা প্রতীপকে পিতারূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। (প্রতীপং রোচয়ামাস পিতরং ভূরিতেজসম্)।* ওদিকে গঙ্গাও তাঁহাকে মনে মনে ধ্যান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে নষ্ট-রূপ বসুগণকে দেখিয়া, অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বসুগণ কহিলেন—"শপ্তাঃ স্মো বৈ মহানদি!" ব্রহ্মবাদী বশিষ্টের অভিশাপ—

> যস্মাম্মে বসবো জহ্রুর্গাং বৈ দোগ্ধ্রীং সুবালধিম্
> তস্মাৎ সর্ব্বে জনিষ্যন্তি মানুষেষু ন সংশয়"।
>
> (৯৯ অধ্যায়, আদিপর্ব্ব)

বসুগণ গঙ্গার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন—

> "ত্বমস্মান্মানুষী ভূত্বা সৃজ পুত্রান্ বসূন ভুবি"।
>
> (৯৬ অধ্যায়, আদিপর্ব্ব)

গঙ্গা বলিলেন—"মর্ত্ত্যে তোমাদের কর্ত্তা হইবেন কে? উত্তরে বসুগণ কহিলেন—"প্রতীপের পুত্র শান্তনুই যোগ্য ব্যক্তি"!

গঙ্গাও এই কথা সমর্থন করিলেন এবং কহিলেন—'তোমাদের জন্মমাত্রই জলে নিক্ষেপ করিব, কিন্তু তাঁহাকে একটি পুত্র দিতেই হইবে। তখন বসুগণ উত্তর করিলেন—আমাদের প্রত্যেকের শক্তি হইতে একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে সেই পুত্রটিই তাঁহার থাকিবে'; কিন্তু "ন সম্পৎস্যতি মর্ত্ত্যেষু পুনস্তস্য তু সন্ততিঃ।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া গঙ্গা ও বসুগণ প্রস্থান করিলেন।

* * * *

মৃগয়াশীল রাজা শান্তনু একদিন মৃগ অন্বেষণ করিতে করিতে গঙ্গার তটদেশে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে—'দদর্শ পরমাং

---

* [শান্তনু, প্রতীপের পুত্র—অভিশপ্ত মহাভিষ]

প্রিয়ম্'। সেই দিব্যাভরণভূষিত নারী-মূর্ত্তি দেখিয়া শান্তনুর রোমহর্ষ হইল এবং চক্ষু দ্বারা রূপ অবিরাম পান করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না। শেষে রাজা তাঁহাকে কহিলেন—'দেবী, দানবী, গন্ধর্ব্বী, অপ্সরা, যক্ষী, পন্নগী বা মানুষী যাহাই হওনা কেন, শোভনে, তুমি আমার ভার্য্যা হও।' গঙ্গা সম্মত হইলেন, তবে সর্ত্ত করিলেন,

—যৎ তু কুর্য্যামহং রাজন্। শুভং বা যদি বা হশুভম্।

ন তদ্বারয়িতব্যাঽস্মি ন বক্তব্যা তথাঽপ্রিয়ম্।—

রাজা শান্তনু সব সর্ত্তই মানিয়া লইলেন এবং গঙ্গা মানুষী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রাজার সহবর্ত্তিনী হইলেন। কালক্রমে বসুগণ জন্মগ্রহণ করিলেন এবং গঙ্গাও নিয়ম মত একে একে জলে নিক্ষেপ করিলেন। অষ্টম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে রাজা দুঃখার্ত্ত চিত্তে কহিলেন—

—মা বধীঃ কস্য কাসীতি কিং হিনৎসি সুতানিতি

পুত্রঘ্নি! সুমহৎ পাপং সম্প্রাপ্তং তে সুগর্হিতম্।

গঙ্গা নিজে পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন—'আমি চলিলাম, এই পুত্র তোমার থাকিল'। (পুত্রং পাহি মহাব্রতম্) এই বলিয়া গঙ্গা কুমারকে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন।—

এতদাখ্যায় সা দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত।

আদায় চ কুমারং তং জগামাথ যথেপ্সিতম্। (৯৮—আদি)

এই ঘটনার অনেককাল পরে, রাজা শান্তনু একদিন মৃগয়া করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে চারুদর্শন একটি কুমার শরসন্ধানে গঙ্গাপ্রবাহকে নিরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শান্তনু তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু কুমার—"স তু তং পিতরং দৃষ্টা মোহয়ামাস মায়য়া" এবং সহসা অন্তর্হিত হইল। রাজা তখন গঙ্গাকে পুত্রটিকে দেখাইতে অনুরোধ করিলেন। গঙ্গা পুত্রকে লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'এই সেই অষ্টম পুত্র। এই পুত্র

সর্ব্বশাস্ত্রবিদ হইয়াছে। বশিষ্ঠের নিকট হইতে এ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে। উশনার মত শাস্ত্রজ্ঞ! যত শাস্ত্র আছে সবই ইহাতে প্রতিষ্ঠিত। শস্ত্রবিদ্যায় এ জামদগ্ন্য (তব পুত্রো মহাবাহো সাঙ্গোপাঙ্গং মহামুনি। ঋষিঃ পরৈরনাধৃষ্যো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্)। 'এই বীরপুত্রকে তুমি গৃহে লইয়া যাও।' গঙ্গার বাক্যে প্রীত হইয়া শান্তনু পুত্রকে লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং দেবব্রতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

সত্যবতী প্রসঙ্গ

এইভাবে চারি বৎসর অতীত হইলে, রাজা শান্তনু একদা 'যমুনা'-নদীর তটদেশস্থ এক বনপ্রদেশে বিচরণ করিতে করিতে অনির্দ্দেশ্য এক উত্তম গন্ধ আঘ্রাণ করিলেন। সেই গন্ধ অনুসরণ করিয়া চারিদিক অনুসন্ধান করিতে করিতে—দদর্শ তদা কন্যাং দাশানাং দেবরূপিণীম্। রাজা তাঁহার পরিচয় লইলেন এবং—"স গত্বা পিতরং তস্যা বরয়ামাস তাং তদা"। দাশরাজ সমভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন—একটি সর্ত্তে কন্যা আমি দিতে পারি; "অস্যাং জায়েত যঃ পুত্রঃ স রাজা পৃথিবীপতে। ত্বদূর্দ্ধমভিষেক্তব্যো নান্যঃ কশ্চন পার্থিব।" রাজা শান্তনু এই সর্ত্ত পালন করিতে সক্ষম হইলেন না। হস্তিনাপুরে আসিলেন, কিন্তু কন্যার চিন্তাদাহে তাঁহার সমস্ত দেহ-মন দগ্ধ হইতে লাগিল।

দেবব্রত পিতার দৈন্য লক্ষ্য করিয়া পিতাকে একদিন বলিলেন—"পিতা! সর্ব্বত্রই আপনার সুমঙ্গল, অথচ আপনি দুঃখিত এবং সর্ব্বদাই কি যেন ধ্যান করেন। আপনি বিবর্ণ ও কৃশ হইয়া পড়িয়াছেন। আপনার ব্যাধির কারণ আমাকে বলুন।" দেবব্রতের কথা শুনিয়া শান্তনু বলিলেন—"সত্যই আমি চিন্তাকুল। তুমি আমার একমাত্র

পুত্র। জগতের অনিত্যতার কথা ভাবিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন—কারণ 'কথঞ্চিৎ তা পাদেয়। বিপত্তৌ নাস্তি নঃ কুলম্'—তোমার কোনরূপ বিপত্তি ঘটিলে আমার বংশ থাকিবে না। অবশ্য তুমি একাই একশত পুত্র হইতে শ্রেষ্ঠ। তবু শাস্ত্রের বিধি—এক পুত্রত্ব—অনপত্যত্ব কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্। এই সব কথা ভাবিয়াই আমি চিন্তাকুল।"

পিতার মুখের কথা শুনিয়া দেবব্রত পিতার মনের কথাও বুঝিয়া ফেলিলেন এবং তখনই বৃদ্ধ অমাত্যদের নিকটে যাইয়া ভিতরকার ব্যাপার শুনিয়া দাশরাজার সমীপে যাইয়া দাশরাজকন্যাকে প্রার্থনা করিলেন।

দাশরাজ যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া এবং শান্তনুর নানারূপ প্রশংসা করিয়া কহিলেন—"এ প্রস্তাব খুবই আনন্দদায়ক, তবে কন্যার পিতা হিসাবে কয়েকটি কথা বলিতে চাহি।—সপত্নতা দোষ বড় বলবান্। আর তোমার মত ব্যক্তি যাহার সপত্ন, সে গন্ধর্ব্ব বা অসুর যাহাই হউক না কেন, তাহার আর নিস্তার নাই। ইহাই এস্থলে বড় বিচার্য্য বিষয়।" দাশরাজের অভিপ্রায় বুঝিয়া দেবব্রত প্রতিজ্ঞা করিলেন—

'যোহস্যাং জনিষ্যতে পুত্রঃ স নো রাজা ভবিষ্যতি।' দাশরাজ এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দেবব্রতকে প্রশংসা করিলেন, কিন্তু কন্যাদান সম্বন্ধে মত দিলেন না। আরো একটা 'কিন্তু' তুলিলেন—'তবাপত্যং ভবেদ্ যৎ তু তত্র নঃ সংশয়ো মহান্'—কিন্তু তুমি না হয় সিংহাসন দাবী করিবে না, কিন্তু তোমার পুত্রেরা দাবী করিবে না এ নিশ্চয়তা কোথায়?

দাশরাজের মনোভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ভীষ্ম পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলেন—"অদ্য প্রভৃতি মে দাশ! ব্রহ্মচর্য্যং ভবিষ্যতি।"—আজ হইতে আমি চিরব্রহ্মচারী হইলাম। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া দেব-অপ্সরাগণ ও রাজর্ষিরা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন

এবং নাম রাখিলেন—ভীষ্ম। তখন দেবব্রত সত্যবতীকে কহিলেন—"মাতা! রথে আরোহণ করুন। নিজ গৃহে চলুন।" এইভাবে দেবব্রত সত্যবতীকে আনিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন। পিতা সমস্ত সংবাদ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পুত্রকে ইচ্ছামৃত্যু দান করিলেন। (১০০ অধ্যায়—আদিপর্ব্ব)।

কিছুকাল মধ্যেই সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু শান্তনু অধিককাল পুত্রদের মুখ দেখিতে পারিলেন না। কালের ডাক পড়িতেই তিনি চলিয়া গেলেন। তখন ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে বসাইয়া সত্যবতীর মতানুসারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। চিত্রাঙ্গদও অকাল মৃত্যুর মুখে পড়িলেন—গন্ধর্ব্বরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া। ভীষ্ম বালক বিচিত্রবীর্য্যকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন এবং মাতার নির্দ্দেশ অনুসারে রাজধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন।

কাশীরাজকন্যা কাহিনী

বিচিত্রবীর্য্য যৌবনে পদার্পণ করিলে ভীষ্ম ভ্রাতার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলেন। তখনই তিনি শুনিলেন যে, কাশীরাজের তিন কন্যা স্বয়ংবরা হইতে ইচ্ছা করিয়াছে। মাতার অনুমতি লইয়া ভীষ্ম সশস্ত্র হইয়া বারানসী গমন করিলেন এবং সভায় সমবেত রাজন্যবর্গকে ও কন্যাত্রয়কে দর্শন করিলেন। ভীষ্মকে একাকী এবং বয়োবৃদ্ধ দেখিয়া কন্যাত্রয়— "অপাক্রামন্ত তাঃ সর্ব্বা বৃদ্ধইত্যেব চিন্তয়া"। ক্ষত্রিয়গণও হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—"ভীষ্ম শুনা যায় পরম ধর্ম্মাত্মা। বৃদ্ধ হইয়াছে—তবু কি নির্লজ্জ। ভীষ্ম ব্রহ্মচারী—ইহা মিথ্যা কথা।"

রাজন্যবর্গের পরিহাসবাক্য শুনিয়া ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং

—"ভীষ্মস্তদা স্বয়ং কন্যা চরয়ামাস তাঃ প্রভু।" কন্যাদিগকে রথে তুলিয়া লইয়া ভীষ্ম উপস্থিত ক্ষত্রিয়বীরদের যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কিন্তু—'স ধনূংষি ধ্বজাগ্রানি বর্ম্মাণি চ শিরাংসি চ। বিচ্ছেদ সমরে ভীষ্মঃ শতশোহ সহস্রশঃ।' শেষ পর্য্যন্ত মহাবাহু শাম্বরাজ রণে যোগ দিলেন। কিন্তু ভয়ংকর যুদ্ধ করিয়াও, শাম্বরাজ পরাজিত হইলেন। ভীষ্ম কাশীরাজকন্যাসহ হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যকে কন্যা সমর্পণ করিলেন।

বিবাহের আয়োজন হইতেই জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা নিবেদন করিলেন —'আমি শাম্বরাজকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি—আর আমার পিতার কামনাও তাহাই।' অম্বার মনের কথা শুনিয়া ভীষ্ম অম্বাকে শাম্বরাজের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন এবং অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিলেন। (১০৩ অধ্যায়— আদিপর্ব্ব)।

কিন্তু শাম্বরাজ অম্বাকে গ্রহণ করিলেন না—অধিকন্তু নানারূপ বাক্যে পীড়ন করিলেন। অম্বা অনেকবার অনুনয় করিলেন, কিন্তু শাম্বরাজ অটল থাকিয়াই বার বার তাহাকে প্রত্যাখান করিলেন এবং—"গচ্ছ গচ্ছেতি তাং শাম্বঃ পুনঃপুনরভাষত"। শোকে ক্ষোভে কাঁদিতে কাঁদিতে অম্বা প্রস্থান করিলেন (১৭৪ অধ্যায়, উদ্যোগপর্ব্ব)। অম্বা লজ্জায় পিতৃ-ভবনে ফিরিয়া গেলেন না। তাহার মনে চিন্তা উঠিল—আমার এই অবস্থার জন্য কে দায়ী?—আমি নিজে? না ভীষ্ম? অথবা মূঢ় পিতা? ধিক্ আমাকে, ধিক্ ভীষ্মে, ধিক পিতাকে, ধিক্ শাম্বরাজকে। তবে—ভীষ্মই এই অবস্থার মূল কারণ—'অনয়স্যাস্তু মুখং ভীষ্মঃ শান্তন বো মম'।—প্রতিশোধ আমাকে লইতেই হইবে—

'সা ভীষ্মে প্রতিকর্ত্তব্যমহং পশ্যামি সাম্প্রতম্।
তপসা বা যুধা বাপি দুঃখ হেতুঃ সঃ মে মতঃ।'

এইরূপ সঙ্কল্প লইয়া অম্বা এক আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানেই রাত্রিযাপন করিলেন। সেই আশ্রমে শৈখাবত্য নামে বৃদ্ধ তপস্বী ছিলেন। তিনি অম্বার কাহিনী শুনিয়া বড়ই দয়ার্দ্র চিত্ত হইলেন এবং তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আশ্রমের কেহ বলিলেন—"পিতার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া সমীচীন"; কেহ বলিলেন—'শাম্বপতির নিকটে লইয়া যাইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত করাই উচিত।" কেহ বলিলেন—'না তাহা অনুচিত, কারণ আগেই শাম্বপতি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।' শেষ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই পিতার নিকট প্রেরণ করাই সমীচীন মনে করিলেন। কিন্তু অম্বা তপশ্চর্য্যা ছাড়া আর কিছুই করিতে সম্মত হইল না। এই সময় এক রাজর্ষি সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ও সব বৃত্তান্ত শুনিয়া অম্বাকে আশ্রয় দিলেন এবং বলিলেন—

"গচ্ছ দদ্বচনাদ্রামং জামদগ্ন্যং তপস্বিনম্।
রামস্তে সুমহদ্দুঃখং শোকঞ্চৈবাপনেষ্যতি ॥"

মহেন্দ্র পর্ব্বতে রামের আশ্রম। আমার কথা তাঁহাকে বলিলে নিশ্চয়ই তিনি তোমার উপকার করিবেন। তখনই রামের শিষ্য অকৃতব্রণ সেখানে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমবাসিগণের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনিয়া অকৃতব্রণ ভীষ্মকেই দোষী বলিয়া অভিযুক্ত করিলেন এবং বলিলেন—"তস্মাৎ প্রতিক্রিয়া যুক্তা ভীষ্মে কারয়িতুং তব"। অম্বারও সেই কামনা। অকৃতব্রণের সহিত অম্বা রামের আশ্রমে গেলেন। রামের কাছে অম্বা কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার কাহিনী বর্ণনা করিলেন এবং বার বার অনুরোধ করিলেন—"জাহি ভীষ্মং মহাবাহো যথা বৃত্রং পুরন্দর।" রাম কহিলেন—'আমি ব্রহ্মবিদগণের হেতু ছাড়া অন্য কোন হেতুতে অস্ত্র ধারণ করিতে চাহি না। শাম্ব বা ভীষ্ম আমার কথাতেই বশীভূত হইবে। অতএব শোক পরিহার কর।'

অম্বা কহিলেন—'প্রভু! আমার এক কামনা—ভীষ্মকে আপনি পরাভূত করুন'। তারপর, রাম অম্বাকে লইয়া ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ভীষ্ম গ্রহণ করিলেন না।

ফলে রামের সহিত ভীষ্মের তুমুল যুদ্ধ। প্রথমতঃ বাক্, এবং শেষে প্রকৃত যুদ্ধই বাধিয়া গেল। রামকে ভীষ্ম বলিয়াছিলেন—"আপনি অনেকবার ক্ষত্রিয়দের পরাভূত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তখন ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করে নাই। আপনার সে দর্প আমি চূর্ণ করিব।" কুরুক্ষেত্রে উভয়পক্ষই প্রস্তুত হইল। গঙ্গাদেবী উভয়কেই বিরত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিশেষ ফল হইল না।

ভীষ্ম রামকে ভূমিষ্ঠ দেখিয়া বলিলেন—'আপনি সশস্ত্র এবং রথস্থ হইয়া যুদ্ধে আগমন করুন। অলৌকিক শক্তিবলে রাম রথ বর্ম্মাদি ভূষণে ভূষিত হইলেন। যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল—ভীষণ যুদ্ধ। গঙ্গাদেবীকে পর্য্যন্ত একবার আসিতে হইল—ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্য। ওদিকে রামকে রক্ষা করিবার জন্য জমদগ্নিকেও হস্তক্ষেপ করিতে হইল। দেব-দেবর্ষিদের এবং গঙ্গার অনুরোধে রাম নিবৃত্ত হইলেন। ভীষ্মকে রাম কহিলেন—

"ত্বৎসমো নাস্তি লোকেঽস্মিন্ ক্ষত্রিয় পৃথিবীচর।"

(১৮৭ অধ্যায়, উদ্‌যোগ)

তখন রাম অম্বাকে কহিলেন—"তুমি স্বচক্ষেই দেখিলে—আমি যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াও ভীষ্মকে পরাজিত করিতে পারিলাম না, অতএব—যথেষ্টং গম্যতাং ভদ্রে কিমন্যদ্বা করোমি তে।" অম্বা বিদায় লইলেন এবং তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। দ্বাদশবর্ষ অতি-মানুষ তপস্যা করিয়া অম্বা কামচারিণী হইয়া উঠিলেন এবং 'কুটিলা' নামে এক নদী হইয়া কিছুকাল অবস্থান করিলেন। পরে

শিবের তপস্যা করিলে শিব তুষ্ট হইলেন এবং ভীষ্ম-পরাজয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি বলিলেন—

"হনিষ্যসি রণে ভীষ্মং পুরুষত্বঞ্চ লপ্স্যসে।
স্মরিষ্যামি চ তৎ সর্ব্বং দেহমন্যং গতা সতী ॥
দ্রুপদস্য কুলে জাতা ভবিষ্যসি মহারণ।"

"ভবিষ্যামি পুমান্ পশ্চাৎ কস্মাচ্চিৎ কাল পর্য্যায়াৎ" এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া অম্বা কাষ্ঠ-চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। (অম্বা—শিখণ্ডী)

সভাপর্ব্বে ভীষ্ম

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসভায় 'প্রধান অর্ঘ্য ব্যক্তি কে' যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম কৃষ্ণের নাম করিতেই শিশুপালপ্রমুখ রাজগণ তীব্র প্রতিবাদ ও কৃষ্ণনিন্দা করিতে লাগিলেন। ভীষ্মকেও ছাড়িয়া দিলেন না। যুধিষ্ঠির শিশুপালকে অনেকবার অনুনয় করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। তখন ভীষ্ম কৃষ্ণের প্রশংসা করিলেন, তথা প্রমাণ করিলেন— কৃষ্ণই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম। শিশুপাল তবু নিরস্ত হইলেন না। তখন ভীষ্ম শিশুপালের জন্মকথা বিবৃত করিলেন এবং সমাগত রাজবৃন্দকে জানাইলেন— সোহহং ন গণয়াম্যেতাংস্তৃণেনাপি নরাধিপান্"। নরাধিপগণ ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভীষ্ম শান্ত গাম্ভীর্য্যে কহিলেন—

"পশুবদ্‌ঘাতনং বা মে দহনং বা কটাগ্নিনা।
ক্রিয়তাং মূর্দ্ধ্নি বো ন্যস্তং ময়েদং সকলং পদম্" ॥

তারপর—যুদ্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল বধ।

* * * *

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের ঘটা দেখিয়া দুর্য্যোধন সন্তাপে জ্বলিতে লাগিলেন। পিতার কাছে ক্ষোভ জানাইলেন। অন্ধ-

পিতা প্রথমে পুত্রকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনের অনন্য—শকুনি ভরসা দিলেন—দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবের সর্ব্বস্ব হরণ করা একমাত্র পথ এবং অমোঘ উপায়। নিরুপায় ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে পাঠাইলেন যুধিষ্ঠিরাদিকে আমন্ত্রণ জানাইতে। দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল, বারবার যুধিষ্ঠির পরাজিত হইতে লাগিলেন—শেষ পর্য্যন্ত দ্রৌপদীকে পণ রাখা হইল। সে বারেও যুধিষ্ঠির পরাজিত। সভামধ্যে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে উপস্থিত করিলেন—কর্ণের পরামর্শে বস্ত্রহরণের চেষ্টা হইল। দ্রৌপদী বিলাপ করিলেন—মর্ম্মান্তিক, তেজস্বীও বটে। ভীষ্ম মুখ না খুলিয়া পারিলেন না—

দ্রৌপদীকে বলিলেন—ধর্ম্মের তত্ত্ব বড় দুর্জ্ঞেয়।—

"বলবাংশ্চ যথা ধর্ম্মং লোকে পশ্যতি পুরুষঃ।
স ধর্ম্মো ধর্ম্মবেলায়াং ভবত্যভিহতঃ পরঃ॥
ন বিবেক্তুঞ্চ তে প্রশ্নমিমং শক্নোমি নিশ্চয়াৎ।
সূক্ষ্মত্বাদ্ গহনত্বাচ্চ কার্য্যস্যাস্য চ গৌরবাৎ।"

শীঘ্রই কুরুগণ বিনষ্ট হইবে। তোমার এই দুরবস্থা, বোধহয়, ধর্ম্মেরই অভিপ্রেত। (ধর্ম্মমেবাম্নবেক্ষসে)। তুমি জিত কি অজিত এ বিষয়ে যুধিষ্ঠিরই বড় প্রমাণ।

বনপর্ব্বে ও বিরাটপর্ব্বে ভীষ্ম

গন্ধর্ব্বদের সহিত যুদ্ধে দুর্য্যোধনাদি পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। পাণ্ডবরা তাঁহাদের মুক্ত করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। এই সময়েই ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের কহিলেন— "আমি পূর্ব্বেই তোমাদের মানা করিয়াছিলাম। শত্রুরা তোমাদের পরাজিত ও বন্দী করিল; শেষে পাণ্ডবরা তোমাদের মুক্ত করিল। ইহাতেও

তোমাদের লজ্জা হয় না। তোমাদের সকলেরই বিক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। দুর্মতি কর্ণের বিক্রম ও আস্ফালনও বেশ দেখা গেল। কর্ণ পাণ্ডবদের পায়ের যোগ্যও না। এই কারণেই আমি সন্ধির কথা বলিয়াছি—এখনও বলি। সন্ধি ছাড়া বংশ রক্ষার কোনও উপায়ই নাই।" (বনপর্ব্ব)

কীচক-বধের সংবাদ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতি উদ্বিগ্ন হইলেন এবং সন্দেহ করিলেন—পাণ্ডবরা নিশ্চয়ই জীবিত আছে। ভীষ্ম নিশ্চিত সিদ্ধান্ত জানাইলেন—পাণ্ডবরা ধর্ম্মপরায়ণ এবং সুনীতিবিদ্, অতএব তাহাদের বিনাশ অসম্ভব। শেষ পর্য্যন্ত বিরাটের গোধন হরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল। (আশ্চর্য্যের বিষয়) ভীষ্মও যোগদান করিলেন। বিরাটরাজ্যে বিরাট যুদ্ধ হইল। ভীষ্ম প্রমুখ সকলেই পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। (বিরাট পর্ব্ব)

উদ্‌যোগপর্ব্বে ভীষ্ম

ভীষ্ম নরনারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে কর্ণ ভীষ্মকে ঠেস দিয়া কথা কহিলেন—আস্ফালনও করিলেন—"অহংহি পাণ্ডবান্ সর্ব্বান্ হনিষ্যামি রণে স্থিতান্।" কর্ণের এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—'যে কথা শুনিলে, ইহার এক কলাও পূর্ণ হইবে না। এই দুর্মতি সূতপুত্রের জন্যই দুর্য্যোধনের আজ এই অবস্থা। গন্ধর্ব্বযুদ্ধে এবং ঘোষযাত্রায় যখন তোমার পুত্রগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তখন এই মহাবীর কর্ণ, যিনি এখন ষাঁড়ের মত চীৎকার করিতেছেন (য ইদানীং বৃষায়তে)—কোথায় ছিলেন? ইহাদের সব কথাই মিথ্যা,—তারপর সঞ্জয় পাণ্ডবগণের বীর্য্যমহিমা কীর্ত্তন করিলে ধৃতরাষ্ট্র খুব অনুতাপ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনকে

তিনি উপদেশ দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দুর্যোধন আত্মশ্লাঘায় মাতিয়া উঠিলেন—

"পরা বুদ্ধিঃ পরং তেজো বীর্য্যঞ্চ পরমং মম।
পরা বিদ্যা পরো যোগো মম তেভ্যো বিশিষ্যতে ॥
পিতামহশ্চ দ্রোণশ্চ কৃপঃ শল্যঃ শলস্তথা।
শাস্ত্রেষু যৎ প্রজানন্তি সর্ব্বং তন্ময়ি বিদ্যতে ॥"

কর্ণও খুব উৎসাহ যোগাইলেন—আবার ঘোষণাও করিলেন—'আমি পিতামহ থাকিতে যুদ্ধে অস্ত্র ধরিব না'। এই বলিয়া কর্ণ প্রস্থান করিলে ভীষ্ম হাসিয়া কহিলেন—'সূতপুত্র সত্যপ্রতিজ্ঞ, সন্দেহ নাই। কিন্তু কাহার নিকট হইতে তিনি এই যুদ্ধের ভার গ্রহণ করিবেন? আমি শত্রুপক্ষের সহস্র অযুত যোদ্ধাকে নিজেই নিহত করিব।"

(শ্রীকৃষ্ণের দূতরূপে কুরুসভায় গমন) এবং সেই প্রসঙ্গেই ইহার পর,—দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মের উপদেশবাক্য (অধ্যায়—১২৫, ১২৬, ১৩৮) ইত্যাদি।

তারপর ভীষ্ম সেনাপতিপদে বৃত হইলেন। রথাতিরথ সংখ্যানে কর্ণকে অর্দ্ধরথী গণনা করায় কর্ণের সহিত ভীষ্মের কলহ বাধিল। (১৬৭ অধ্যায়)। শেষে ভীষ্ম কর্ত্তৃক অম্বোপাখ্যান বর্ণনা (১৭২-১৯৪)।

ভীষ্মপর্ব্বে ভীষ্ম

যুদ্ধারম্ভ হইল। ক্রমে ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের শক্তিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। যুদ্ধের তীব্রতায় দুর্য্যোধন সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐকান্তিকতার সহিত যুদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেন। ভীষ্ম ভীষণভাবে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতে শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত চক্রগ্রহণ করিতে হইল। ভীষ্ম কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"এহেহি দেবেশ জগন্নিবাস নমোহস্তুতে মাধব চক্রপাণে।
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ রথোত্তমাৎ সর্ব্বশরণ্য সংখ্যে।
ত্বয়া হতস্যাপি মমাস্ত কৃষ্ণঃ শ্রেয়ঃ পরস্মিন্নিহ চৈব লোকে।
সম্ভাবিতোহস্ম্যন্ধকবৃষ্ণিনাথ লোকৈস্ত্রিভির্বীর তবাভিযানাৎ।"

—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দিলে কৃষ্ণ ফিরিয়া গেলেন।

ভীষ্ম ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা তাঁহার হাতে প্রাণ হারাইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির শোকসন্তপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে ভীষ্মবধের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হইল—ভীষ্মের নিকটেই উপায় জিজ্ঞাসা করা উচিত। ভীষ্ম উপায় বলিয়া দিলেন—শিখণ্ডী সম্মুখে আসিলেই তিনি অস্ত্র ত্যাগ করিবেন। যথাকালে শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। বাণে বাণে ভীষ্মের দেহ আচ্ছাদিত হইয়া গেল। ভীষ্ম ভূপতিত হইলেন—চারিদিকে হাহাকার উঠিল। কুরু-পাণ্ডব সকলেই শোকার্ত্তচিত্তে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ভীষ্ম সকলকেই বাক্যে অভ্যর্থনা করিলেন—পরে কহিলেন 'আমার শির ঝুলিয়া আছে—উপাধানের ব্যবস্থা কর।' রাজগণ মৃদু উপাধান আনয়ন করিলে ভীষ্ম হাসিয়া কহিলেন—

'নৈতানি বীর শয্যাসু যুক্তরূপানি পার্থিবাঃ।'

তখন অর্জ্জুনকে কহিলেন—'ধনঞ্জয় আমার মাথাটা ঝুলিয়া আছে—উপযুক্ত উপাধানের ব্যবস্থা কর।' অর্জ্জুন বাণদ্বারা উপাধান করিয়া দিলেন। পিপাসার্ত্ত ভীষ্ম জল চাহিলেন। রাজগণ সুগন্ধি জল আনিয়া দিলেন। ভীষ্ম এবারেও হাসিয়া অর্জ্জুনকে জল দিতে বলিলেন। অর্জ্জুন বাণ-দ্বারা জল তুলিয়া ভীষ্মকে পান করাইলেন। শেষে ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবের সহিত সন্ধি করিতে কহিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। একে একে সকলেই স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ভীষ্ম স্থির হইয়া রণশয্যায় শায়িত। একাকী। ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন কর্ণ। ভীষ্মের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া কর্ণ অশ্রুনেত্রে তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিলেন এবং কহিলেন—'হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আপনি যাহাকে কোনদিনই ভাল চোখে দেখেন নাই আমি সেই রাধেয়।' চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ভীষ্ম চারিদিকে চাহিলেন এবং রাক্ষগণকে সরিয়া যাইতে নির্দ্দেশ দিলেন; পরে কহিলেন "এস এস বুকে এস প্রিয়! তুমি রাধেয় নও, তুমি কৌন্তেয়! তোমার প্রতি আমার কোন দ্বেষ নাই। এইরূপ মৃত্যুর জন্মই তোমাকে আমি পরুষ বাক্য বলিয়াছি। পাণ্ডবরা তোমার ভাই। তুমি তাহাদের সহিত মিলিত হও—এই আমার ইচ্ছা।" কর্ণ সবিনয়ে কহিলেন—'আমি জানি, আমি সূতজ নহি। কিন্তু দুর্য্যোধনের ধন-ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করা উচিত নহে। আর—ন চ শক্যমবস্রষ্টুং বৈরমেতৎ সুদারুণম্—ধনঞ্জয়ের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করিবই তবে—প্রীত মনেই করিব।' তখন ভীষ্ম বলিলেন—"তবে তাহাই কর। ক্রোধহীন হইয়া নিষ্কামভাবে যুদ্ধ কর। তাহা হইলেই—ক্ষাত্রধর্ম্ম-জিতান্ লোকানবাপ্স্যসি ন সংশয়। কর্ণ, আমিও যুদ্ধ প্রশমের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বন্ধ করিতে পারি নাই।" তারপর কর্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিলেন।

শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম

অধ্যায়—৩৭, ৪৭—৭৫, ১৩৪, ১৮১, ২৭২।

" ৩৭—ভীষ্ম প্রশংসা,

" ৪৭—ভীষ্মকৃত কৃষ্ণস্তব,

" ৭৫—যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মোপদেশ,

" ১৩৪—ভীষ্মোপদেশ,

" ১৮১—যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে ভীষ্মের উত্তর,

" ২৭২— ঐ

কাশীদাসী মহাভারতে ভীষ্ম

শান্তনু ও গঙ্গা

ইক্ষ্বাকুনন্দন মহাভিষ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং প্রচুর দান-ধ্যানাদি করিয়া অতুল কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। একদিন ব্রহ্মার সভায় দেবগণের এবং মুনিগণের সহিত তিনি সমান আসনে বসিয়াছিলেন, এমন সময় গঙ্গাদেবী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গার দিকে মহাভিষ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিতে গঙ্গাও দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন না। ফলে—

"দোঁহার দেখিয়া দৃষ্টি কহে প্রজাপতি
মোর লোকে আসি রাজা করিলা অনীতি।
ব্রহ্মলোকে আসি কর মনুষ্য-আচার
মর্ত্ত্যে জন্ম লয়ে ভোগ কর পুনর্ব্বার।"

মহাভিষকে সোমবংশে জন্ম গ্রহণ করিতে হইল—রাজা প্রতীপের পুত্ররূপে। প্রতীপ-পুত্রই শান্তনু।

ওদিকে, গঙ্গাও মর্ত্ত্যে জন্ম লইতে অগ্রসর হইবেন, পথে দেখিলেন—অষ্টবসু বিরস বদনে দণ্ডায়মান। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া গঙ্গা জানিতে পারিলেন—অষ্টবসুও একই শাপে অভিশপ্ত, বশিষ্ঠের অভিশাপে—নবজন্ম লইতে হইবে। বসুগণ গঙ্গাকে অনুরোধ করিলেন—

"আমা সবাকার তুমি হও গর্ভধারিণী

জন্মমাত্র ভাসাইয়া দিও তব নীরে

গঙ্গা রাজী হইলেন এবং কুরুবংশের প্রতীপ রাজার রূপগুণে প্রীত হইয়া—'দক্ষিণ উরুতে গিয়া বসিল রাজার' এবং বলিলেন—"তোমারে ভজিনু আমি হও মোর পতি।" রাজা প্রতীপ যুক্তি দিলেন—দক্ষিণ উরুতে যে বসে সে পুত্রবধূই হইতে পারিবে—বধূ নহে। গঙ্গা নিরস্ত হইলেন এবং অঙ্গীকার করিলেন—"বরিব তোমার পুত্রে……….।"

তারপর—"হস্তিনা নগরে রাজা শান্তনু হইল।" এবং একদিন মৃগয়া করিতে জাহ্নবীর তটে গেলেন এবং একা একা ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেখানেই গঙ্গার সহিত তাঁহার দেখা এবং আত্ম-নিবেদন—'তোমাতে মজিল মন হও মোর নারী।'

গঙ্গা এই সর্ত্তে রাজি হইলেন—

'আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কাজ
আমারে নিষেধ না করিবা মহারাজ।'

এবং রাজা গঙ্গাকে লইয়া হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একে একে বসুগণ গঙ্গার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং জন্মের পরেই গঙ্গা

"জলেতে ডুবিয়া মর পুত্রপ্রতি বলে।
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত।
তারপর— একে একে গঙ্গাদেবী করিল নিপাত।
পুত্রশোকে শান্তনুর দহে কলেবর।"

অষ্টম কুমার জন্ম গ্রহণ করিলে গঙ্গা যখন পুত্রকে লইয়া গঙ্গায় ফেলিতে অগ্রসর হইলেন, শান্তনু নিয়মভঙ্গ না করিয়া পারিলেন না। 'ক্রুদ্ধ হইয়া নরপতি গঙ্গা প্রতি বলে—'পাষাণ শরীর তোর বড়ই নির্দ্দয়' এবং 'এত বলি কোলে নিল আপন তনয়।' গঙ্গা আত্ম-পরিচয় এবং বসুগণের শাপের বিবরণ শুনাইয়া বিদায় চাহিলেন এবং বলিলেন—

"মায়ের বিহনে পুত্র দুঃখিত হইবে
সে কারণে মম সহ তব পুত্র যাবে।
পালন করিয়া সুত যৌবন সঞ্চারে
তোমারে আনিয়া দিব কত দিনান্তরে।"

এই বলিয়াই গঙ্গা অন্তর্হিত হইলেন এবং "কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা গেল নিজস্থান"।

কিছুকাল পরে, রাজা একদিন মৃগয়া করিতে যাইয়া "এক রথে ভাগীরথী-তীরে" ং আচম্বিতে গঙ্গাকে এবং এক বীরকে দেখিলেন। শান্তনুকে দেখিয়াই বীর গঙ্গার মধ্যে মিলাইয়া গেল—রাজাও চিন্তিত ও বিষণ্ণ চিত্তে সেখানে বসিয়া রহিলেন। গঙ্গা সদয় হইয়া সপুত্র উপস্থিত হইলেন এবং পুত্রের পরিচয় দিলেন —

"দেবব্রত নাম ধরে তনয় তোমার।
এ পুত্রের গুণ রাজা না যায় কথনে।
অস্ত্র-শস্ত্র শিক্ষা কৈল বশিষ্ঠের স্থানে॥
দেবগুরু দৈত্যগুরু সম শাস্ত্রে জ্ঞান
অস্ত্র বিদ্যা জানে ভৃগুরামের সমান।"

শুভক্ষণে দেবব্রত যুবরাজ হইলেন।

দাশরাজকন্যা দেবব্রতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজা শান্তনু—

'স্বচ্ছন্দে মৃগয়া করি ভ্রমে নববীর
একদিন গেল রাজা যমুনার তীর।—'

কালিন্দীর তীরে মৃগ অন্বেষণ করিতে করিতে রাজা এক 'সুগন্ধ' পাইলেন এবং আমোদিত হইয়া গন্ধ অনুসরণ করিয়া—"আচম্বিতে নৌকা জলে দেখিল যুবতী"। রাজা পরমা সুন্দরী কন্যাকে দেখিয়াই মুগ্ধ হইলেন এবং পরিচয় লইয়া জানিলেন যে, কন্যাটি দাশ রাজার দুহিতা। তারপরেই—

'কন্যার বচনে রাজা গেল শীঘ্রগতি
যথায় কন্যার পিতা দাশের বসতি।'

দাশ রাজা আদর আপ্যায়ন করিয়া আগমন হেতু জিজ্ঞাসা করিতেই রাজা বলিলেন—'তোমার যে কন্যা আছে মোরে কর দান'। দাশ রাজা রাজোচিত সতর্কতার সহিত নিবেদন করিলেন—'সত্য কর ধর্ম্মপত্নী করিবে কন্যায়'। আর—

'আমার কন্যার যেই হইবে কুমার
সেই জনে দিবে তুমি রাজ্য অধিকার।'

এই সত্যে রাজা বদ্ধ হইতে পারিলেন না— 'উঠিয়া নৃপতি দেশে করিল গমন'। কিন্তু দাশকন্যাকে রাজা কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না—'অনুক্ষণ চিত্তে রাজা নহে বিস্মরণ' এবং 'কন্যার ভাবনা ভাবি রহে মনোদুঃখে।'

পিতাকে দুশ্চিন্তিত ও দুঃখিত দেখিয়া দেবব্রত একদিন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্রের জিজ্ঞাসা শুনিয়া রাজা অতি কৌশলে একাধিক পুত্রের প্রয়োজন দেখাইয়া বিবাহের ইচ্ছাটি ব্যক্ত করিলেন—'এক পুত্র পুত্র নহে বংশের কারণ'। পিতার উত্তর শুনিয়া দেবব্রত বিজ্ঞ মন্ত্রিগণের নিকট গেলেন এবং ভিতরের সংবাদ সব শুনিলেন—'নাহি দিলা সেই কন্যা তোমার কারণ'। তৎক্ষণাৎ দেবব্রত রথে চড়িয়া দাশ রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন "আমার জনকে তুমি কন্যা দেহ দান"। দাশরাজ শান্তনুর বংশগৌরব ও রূপগুণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া কৌশলে সর্ত্তটি উত্থাপন করিলেন :

"কন্যা দান করিলে শান্তনু নরবরে।
বৈরানল প্রজ্বলিত হইবে যে পরে।
তোমা হেন পুত্র যাঁর বাক্যের ভাজন

তাঁর কি উচিত পুনঃ পত্নীর গ্রহণ।
তোমার মহিমা যত বিখ্যাত সংসারে
তোমার ক্রোধেতে ইন্দ্র-আদি দেব ডরে।”

দেবব্রত দাশরাজের বক্তব্য সহজেই অনুমান করিতে পারিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন—

“পিতার বিবাহ হেতু করি অঙ্গীকার
আজি হৈতে রাজ্যে মম নাহি অধিকার।
তোমার কন্যার গর্ভে যে হবে কুমার
হস্তিনা নগরে তার হবে রাজ্যভার।”

দাশরাজা সবিনয়ে ‘পাছে দ্বন্দ্ব করিবে তোমার পুত্রগণ’ এই বলিয়া ‘কিন্তু’ তুলিলেন; দেবব্রতও পিছাইলেন না—

“তোমার অগ্রেতে আমি করি অঙ্গীকার
বিবাহ না করিব এ প্রতিজ্ঞা আমার।”

এই অঙ্গীকার শ্রবণে সকলেই বিস্মিত হইল। চারিদিকে ধন্য ধন্য শব্দ উঠিল, পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবগণ ডাকিয়া বলিলেন, ‘ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈলা ভীষ্ম তব নাম’। কৈবর্ত্তরাজ সন্দেহশূন্য মনে সত্যবতীকে দেবব্রতের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। দেবব্রত সত্যবতীকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন—“নিজ গৃহে চল মাতা চড় আসি রথে।” হস্তিনা নগরে আসিয়া দেবব্রত পিতার গোচরে সত্যবতীকে অর্পণ করিলেন। শান্তনু পরম বিস্মিত! পুত্রকে বর দিলেন “ইচ্ছামৃত্যু হবে তুমি আমার বচনে।”

এই ঘটনার কিছুকাল পরে সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ নামে প্রথম পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল এবং দ্বিতীয় পুত্র হইল ‘বিচিত্রবীর্য্য’। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই শান্তনুকে ভৌতিক কলেবর ত্যাগ করিতে হইল এবং এই শিশুদের পালনের ভার পড়িল ভীষ্মের উপর। ভীষ্ম

অভিভাবক-রূপে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শিশু দুইটির বয়স বাড়িতে লাগিল। এই সময়েই চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব-রাজের সহিত যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ফলে, বিচিত্রবীর্য্য সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

কাশীরাজ্যের স্বয়ম্বর

এই সময়ে কাশীরাজ তিন কন্যার জন্য স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেন। এই সংবাদ শুনিয়াই ভীষ্ম কাশীরাজ্যে উপস্থিত হইলেন এবং সভার ভিতর যাইয়া বলিলেন—

'আমার বচন শুন কাশীর ঈশ্বর।
আমার অনুজ আছে শান্তনু নন্দন
তার হেতু তব কন্যা করিনু বরণ।'

এই বলিয়া তিন কন্যাকে রথে চড়াইতেই তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বেশী যুদ্ধ হইল শাম্বের সহিত।

'হস্তিনী কারণে যেন ক্রোধে হস্তিবর
ধাইয়া আইল তেন শাম্ব নৃপবর।'

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত 'পলাইয়া যায় শাম্ব ভূমে বহি কাট।' কন্যা লইয়া ভীষ্ম হস্তিনাপুরে গেলেন। বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের উদ্যোগ হইল। কন্যাত্রয়ের মধ্যে অম্বা শাম্বের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ভীষ্মের নিকট অম্বা মনের কথা বলিল—

"সভামধ্যে দেখিয়া সকল রাজগণে
শাম্বেরে বরিতে আমি করিয়াছি মনে।
পিতার সম্মতি আছে দিবেন শাম্বেরে
আমার বিবাহ দেহ আনিয়া তাঁহারে।"

অম্বার নিবেদন শুনিয়া ভীষ্ম তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। অম্বা শাম্বের

কাছে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু শাম্ব অম্বাকে গ্রহণ করিলেন না; তাড়াইয়া দিলেন। অম্বা কাঁদিয়া আসিয়া ভীষ্মকে জানাইল— "তুমি বলে নিলে তাই শাম্ব তেয়াগিল।" কিন্তু ভীষ্ম ধর্ম্মের বিচারে অম্বাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। অম্বা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া চলিয়া গেল "প্রতিহিংসা সাধিবারে সঙ্কল্প করিয়া।" অম্বা সোজাসুজি জমদগ্নি-সুত পরশুরামের স্মরণ লইল এবং সব কথা জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিল। ক্ষত্রকুলান্তক বীর ভীষ্মকে ডাকিয়া বলিলেন, অম্বাকে বিবাহ কর। ভীষ্ম নিজ প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও, রামের ক্রোধ প্রশমিত করিতে পারিলেন না। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। "কেহ না লঙ্ঘিল সত্য, বাধিল সমর"। শেষ পর্য্যন্ত—

'তুষ্ট হয়ে জামদগ্ন্য অস্ত্র তেয়াগিল
বীরত্ব বাখানি আসি ভীষ্মে আলিঙ্গিল।'

রাম অম্বাকে বলিলেন 'যাহ কন্যা নিজস্থানে বিধি তোমা বাম।' এই কথা শুনিয়া অম্বা পরম দুঃখিত হইল এবং অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া ভীষ্ম বধের সঙ্কল্প লইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল।

এদিকে অকালেই অপুত্রক অবস্থায় বিচিত্রবীর্য্য যক্ষ্মারোগে মারা গেলেন। সত্যবতী বংশরক্ষার জন্য ভীষ্মের কাছে আবেদন করিলেন, "পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ"। ভীষ্ম মাতা সত্যবতীকে বলিলেন—

"আমার প্রতিজ্ঞা মাতা জানহ আপনে
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে তোমার কারণে।
ত্রিভুবনে কেহ যদি দেয় অধিকার
তথাপি না লব রাজ্য সত্য অঙ্গীকার।
যাবৎ শরীরে মোর আছয়ে পরাণ
না ছুঁইব রামা সত্য নহে মোর আন।"

তখন ভীষ্ম এক উপায় স্থির করিলেন। বেদব্যাসের দ্বারাই বংশ রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যবস্থার ফলেই ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জন্ম হইল এবং বিদুরও জন্ম গ্রহণ করিলেন। "তিন পুত্রে ভীষ্ম বীর করেন পালন। নানা অস্ত্র শস্ত্র বিদ্যা করান পঠন।" বিবাহের বয়স হইতেই ভীষ্ম যদুবংশীয় সুবল নামক রাজার কাছে দূত পাঠাইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের জন্য গান্ধারীকে প্রার্থনা করিলেন। সুবল ভীষ্মের ভয়ে অন্ধ ছেলের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। পাণ্ডুর বিবাহের জন্যও পাত্রী চাই। কৃষ্ণের পিতামহ 'শূর' কুন্তীভোজ নৃপতিকে যে কন্যাটি দান করিয়াছিলেন, সেই কন্যাটির স্বয়ংবর হইল। পৃথা পাণ্ডুকে বরণ করিয়া উল্লসিত হইলেন। ইহার পরেই 'বংশ বৃদ্ধি হেতু আর বিবাহ কারণে' ভীষ্ম মদ্ররাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া শল্যের ভগিনী মাদ্রীকে পাণ্ডুর জন্য প্রার্থনা করিলেন। যথাকালেই বিবাহ নিষ্পন্ন হইল। এই সময় পাণ্ডু দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া অগণিত ধনরত্ন ও অতুল যশোমহিমা লইয়া ফিরিলেন। এই কারণে—

'পাণ্ডুর প্রতি বড় প্রীত গঙ্গার নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি করে মস্তক চুম্বন॥'

কিন্তু পাণ্ডু 'যতেক আনিল দ্রব্য ধৃতরাষ্ট্র দিল'। তারপর ভীষ্ম বিদুরের বিবাহ দিলেন দেবক রাজার কন্যা 'পরাশরী'র সহিত।

কালক্রমে কুন্তীর গর্ভে দৈব-নিয়োগে যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল-সহদেব জন্ম গ্রহণ করিল এবং গান্ধারীও শতপুত্রের জননী হইলেন। পাণ্ডু অকালে বন-প্রদেশে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে— পঞ্চ পাণ্ডবের লালন-পালনের ভার বৃদ্ধ ভীষ্মের উপরেই পড়িল।

এদিকে দুর্য্যোধন ভীষণ ঈর্ষান্বিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে অপসারিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্রও স্নেহান্ধ হইয়া ষড়যন্ত্রে

যোগ দিলেন—পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন—জতুগৃহে পোড়াইয়া মারিবার আয়োজন ব্যর্থ হইল—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় রাজন্যবর্গকে পাণ্ডবরা পরাজিত করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র চিন্তিত হইয়া মন্ত্রণা সভা ডাকিলেন। এই সভায় ভীষ্ম স্পষ্ট কথা শুনাইলেন—

'কি বুদ্ধি হইল তোমার না জানি কারণ
বারণাবতেতে পাঠাইলা পুত্রগণ ;
না জানি তথায় কি কৈল পুরোচন
জতুগৃহে দগ্ধ কৈল বলে সর্ব্বজন।
ত্রিভুবন জুড়ি মম অকীর্ত্তি হইল,
আপনি থাকিয়া ভীষ্ম এতেক করিল।
যদবধি জতুগৃহ হইল দাহন
তোমাদিগে নাহি চাহি মেলিয়া নয়ন।'

ভীষ্ম নির্দ্দেশ দিলেন—"কর পাণ্ডুপুত্রগণ সঙ্গেতে মিলন"... 'অর্দ্ধরাজ্য দিয়া কর পাণ্ডবেরে বশ'। ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুর প্রভৃতির পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের আনিতে বিদুরকে প্রেরণ করিলেন এবং পাণ্ডবগণকে খাণ্ডবপ্রস্থে রাজ্য স্থাপন করিতে দিলেন।

সভাপর্ব্বে ভীষ্ম

ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন। ভীমার্জ্জুনাদি ভ্রাতৃগণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমস্ত নৃপতিদের পরাজিত করিলেন। ভীষ্মও আমন্ত্রণে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া যজ্ঞের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ শেষ হইলে দক্ষিণা-দানের পর্ব্ব। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—

'বহুদূর হইতে আইল রাজগণে।
যজ্ঞ হইল পূর্ণ তোমার ভবনে।

সবাকারে পূজা কর বিবিধ বিধানে ॥

....

শ্রেষ্ঠ জন জানি আগে পূজহ প্রথমে।

যুধিষ্ঠির সহদেবকে স্মরণ করিতেই সহদেব অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। যুধিষ্ঠির পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কাহাকে পূজিব আগে শ্রেষ্ঠ কেবা কহ'। ভীষ্ম বলিলেন—'বৃষ্ণি বংশে বিষ্ণু-অবতার, সর্ব্ব আগে অর্ঘ্য দেহ চরণে তাঁহার...... তাঁর অগ্রে অর্ঘ্য পায় হেন নাহি আর' এই কথা বলিতেই অলক্ত অনলে ঘৃতাহুতি পড়িল। ভীষ্মকে চেদিরাজ এক পাশ হইতে গালি আরম্ভ করিলেন। ভীষ্মও শান্ত ও গম্ভীর উত্তর দিলেন এবং শিশুপালের জন্ম-বিবরণ শুনাইলেন। শিশুপাল আরো চটিয়া গেলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণের হস্তেই প্রাণ হারাইলেন।

এই ব্যাপারে, দুর্য্যোধন ঈর্ষানলে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন। অন্ধ পিতার কাছে দ্যূত-ক্রীড়ার দ্বারা পাণ্ডবদের সর্ব্বস্ব হরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে অসম্মত হইলেও, শেষ পর্য্যন্ত অনুমতি দিলেন। বিদুর ইন্দ্রপ্রস্থে প্রেরিত হইলেন। যুধিষ্ঠিরকে বিদুর সব কথা জানাইলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন— ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞা গুরুআজ্ঞা। অধিকন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম দ্যূতে কিংবা যুদ্ধে আবাহন করিলে আবাহন গ্রহণ করা—

"বিশেষে আমার সত্য প্রতিজ্ঞা বচন।
দ্যূতে কিংবা যুদ্ধে আমি না ফিরি কখন।"

পাশা খেলিয়া যুধিষ্ঠির সর্ব্বস্ব হারাইলেন—দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া হারাইলেন। দুঃশাসন কেশাকর্ষণ করিয়া দ্রৌপদীকে সভাস্থলে লইয়া আসিল। ভীষ্ম—ধার্ম্মিক, অধোমুখ। দ্রৌপদী ভীষ্মকে দেখিয়া বলিলেন—

"এই ভীষ্ম দ্রোণ দেখ আছেন সভাতে।
ধার্ম্মিক এ দুই বড় খ্যাত পৃথিবীতে॥"

ভীষ্ম উত্তর দিলেন—"কহিতে না পারি আমি ইহার বিধান।
ধর্ম্ম সূক্ষ্ম বিচারিয়া কহিতে প্রমাণ॥
অন্য দ্রব্যে অন্যের নাহিক অধিকার।
দ্রব্য মধ্যে গণ্য হয় ভার্য্যা কিবা আর॥
....
রাজ্য দেশ ধন জন সব যদি যায়
যুধিষ্ঠির মুখে নাহি মিথ্যা বাহিরায়॥
হারিল বলিয়া মুখে বলিয়াছে বাণী
কি কহি ইহার বিধি কিছু নাহি জানি॥"

—ভীষ্ম এই কথা বলিয়াই নিঃশব্দ রহিলেন।

অন্যান্য পর্ব্বে ভীষ্ম

পাণ্ডবগণ বনে চলিয়া গেলেন। প্রজারা—

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুরের প্রতি
ধিক্কার ও তিরস্কার করে নানা জাতি। (বনপর্ব্ব)

বিরাট রাজার গৃহে পাণ্ডবরা এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়া ছিলেন। এই বৎসর শেষে, কৌরবগণ বিরাটের গো-ধন হরণ করিতে আসিয়া পাণ্ডবদের হস্তে পরাজিত হন। অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে ভীষ্ম পরাজিত এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। (বিরাটপর্ব্ব)

পরে ভীষ্মের দশ দিন যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা—কর্ণ-দুর্য্যোধন-ভীষ্মের মন্ত্রণা,—কৃষ্ণার্জ্জুন কর্তৃক ছলে দুর্য্যোধনের মুকুট আনয়ন—ভীষ্ম কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ—ভীষ্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের খেদোক্তি। (ভীষ্মপর্ব্ব)

ভীষ্মের নিকট যুধিষ্ঠিরের গমন—ভীষ্মের যোগকথন—ভীষ্ম কর্তৃক [illegible] স্তব—ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ। (শান্তিপর্ব্ব)

ভীষ্ম নাটকে কাহিনী সংযোজনা

কাহিনী পৌরাণিক ঐতিহাসিক বা সামাজিক যাহাই হউক,—নাট্যকারের উদ্দেশ্য সেই কাহিনীকে নাট্যরূপ দেওয়া এবং নাট্যকারের কৃতিত্ব—ঐ কাহিনীর নাট্যরূপকে **গঠনে সুসঙ্গত, ভাবে সমৃদ্ধ** এবং **রসে প্রাণবান** করিয়া তুলিবার শক্তির মধ্যেই। এই ব্যাপারে নাট্যকারের স্বাধীনতা না আছে এমন নহে। তিনি ঘটনাকে সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট করিতে পারেন—চরিত্রের মানসিক আচরণকে বিস্তারিত করিতে পারেন—মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাবনাকে বিকশিত করিয়া দেখাইতে পারেন। কিন্তু এই স্বাধীনতা একেবারে নিরঙ্কুশ নহে। বিশেষতঃ পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রযোজনায়—যে কাহিনী বা যে চরিত্র বহুপ্রচারের ফলে সুপরিচিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে সেই কাহিনীর রূপায়নে নাট্যকার নিরঙ্কুশ কল্পনায় মাতিতে পারেন না। গণ-চেতনার সংস্কারই সেখানে কবির কল্পনাকে সীমায়িত করিয়া থাকে। কারণ কবি সংজ্ঞানেই করুন বা অসংজ্ঞানেই করুন, জনচিত্তের বাসনা-কামনার সহিত অভিযোজন না করিয়া পারেন না। কোন সৃষ্টির সৌন্দর্য্য বা আনন্দ-মূল্য শেষ পর্য্যন্ত জনচিত্তের অভিমুখী কামনার উপরেই অনেকটা নির্ভর করে। কামনার এবং সংস্কারের অতি-প্রতিকূল কল্পনা কখনও অবাধ সৌন্দর্য্যবোধ তথা আনন্দ জাগাইতে পারে না। এই কারণেই পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকাদি রচনায় কবি প্রথার দ্বারা অনেক পরিমাণে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হন। প্রথিত প্রসিদ্ধির আয়তনের মধ্যে না থাকিলে কবির রচনা আকুণ্ঠ সমর্থন কিছুতেই পাইতে পারে না। অতএব, কাহিনীর রসোত্তীর্ণ নাট্যরূপই বড় কথা হইলেও পৌরাণিকতা

এবং ঐতিহাসিকতাও উপেক্ষার কথা নহে। অন্ততঃ বিচারকালে নাটকের নাটকত্ব যাচাই করিবার সঙ্গেই পৌরাণিকতা বা ঐতিহাসিকতা যাচাই করাও বাঞ্ছনীয়।

ভীষ্ম কাহিনীকে নাট্যরূপ দেওয়া এক হিসাবে খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত—প্রায় পাঁচ-পুরুষের কাহিনীকাল-ব্যাপী একটি জীবনের সমগ্র কাহিনীকে নাট্যরূপ দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে রসধারা অক্ষুণ্ণ রাখা খুবই দুঃসাধ্য কাজ। প্রথমতঃ, বিষয়-ঐক্য (unity of scheme) বলিতে সাধারণত যাহা বুঝায় তাহা রক্ষা করা সম্ভব হয় না—দ্বিতীয়তঃ, বহুকালের ব্যবধানে ঘটিত ঘটনাগুলিকে নাটকীয় সন্ধিতে সাজাইয়া তোলা একটা মহাসমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। দর্শকের মধ্যে কালপরম্পরার এবং ঘটনাপ্রবাহের সংস্কার জন্মাইয়া কাহিনীকে রসাত্মক রূপ দেওয়া খুব বড় প্রতিভারই কাজ। যেখানে কাহিনী একটি বিষয়েই বা লক্ষ্যেই সীমাবদ্ধ, সেখানে আদি-মধ্য-অন্ত বিভাগে কাহিনীকে বিভক্ত করা খুব কঠিন কাজ নহে, কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে—যেখানে বহুকালের ব্যাপ্তিতে এবং কৃতিতে জীবন বিরাট ও বিচিত্র, সেখানে কাহিনীকে সন্ধি-সমন্বিত করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবই হয় না বা হইলেও খুব কষ্টেই সম্ভব হয়। এই ধরণের চরিত্র-নাটক নাট্যসাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা এবং এই শাখার বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি-চরিত্রের বা কেন্দ্রেরই ঐক্য—বিষয়ের ঐক্য নহে।

ভীষ্ম নাটকের প্রযোজনায় নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ উল্লিখিত সমস্যার সম্মুখেই পড়িয়াছেন।—ভীষ্মের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ভীষ্ম-জীবনকে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সমস্যার সমাধান একভাবে তিনি করিয়াছেন বটে, কিন্তু সমাধানটি প্রথম শ্রেণীর সমাধান হইতে পারে নাই। কাহিনীর সন্ধি-বিভাগে নাট্যকার সূক্ষ্ম তৌল-জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেন নাই। প্রথমদিকের বিষয়েই নাটকখানি

বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—অম্বাকাহিনী নাটকে অনেকখানি স্থান জুড়িয়া বসায় নাটকখানি ঠিক সুসমঞ্জস আকার ধারণ করিতে পারে নাই।—ঘটনা-সংযোজনা বিশ্লেষণ করিলেই বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

প্রথমে আছে—প্রস্তাবনা দৃশ্য। বসুগণের অভিশাপ এবং গঙ্গার মর্ত্তে দেহধারণের ও ভীষ্মের জন্মকথার বিস্তারিত বিন্যাস। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নাট্যকার মহাভারতীয় সামান্য একটি উল্লেখকেই বিস্তারিত ঘটনার রূপ দিয়াছেন—রাম ও ভীষ্মের কথোপকথনে। দ্বিতীয় দৃশ্যে নাট্যকার ব্যবহিত ঘটনাকে একত্র বা সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন। সত্যবতীর সহিত শান্তনুর সাক্ষাৎকারকে নাটকীয় করিতে যাইয়াই তিনি এইরূপ সংশ্লেষণ ঘটাইয়াছেন। কিন্তু এই সংশ্লেষণ নিন্দনীয় না হইলেও উভয়েরই কথোপকথন খুব প্রশংসনীয় হয় নাই। শান্তনুর গঙ্গা-প্রেমকে এইভাবে হেয় করা নাটকের জন্যই অনুচিত হইয়াছে। শান্তনুর মনের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে।—অধিকন্তু এই দৃশ্যে ঘটনাকে বিপরীত ভাবে ঘটানো হইয়াছে। মহাভারতে (ব্যাসের, কাশীদাসের) পাওয়া যায় শান্তনুই দাশরাজার কাছে নিজে গিয়াছিলেন এবং কন্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এখানে শান্তনু সত্যবতীর কাছে নিজেই বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তাঁহার পিতাকে লইয়া আসিতে বলিয়াছেন। এই জন্যই নাট্যকারকে নতুন একটি দৃশ্য যোজনা করিতে হইয়াছে। এই দৃশ্যটি এক হিসাবে কল্পিত। কারণ মহাভারতে আছে—ভীষ্ম পিতাকে অন্যমনস্ক এবং বিষণ্ণ দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং কারণ জানিয়া প্রতিকার করিতে—দাশরাজের গৃহে গিয়া প্রতিজ্ঞাদি দ্বারা দাশরাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া সত্যবতীকে হস্তিনাপুরে আনিয়াছিলেন। এখানে ঘটনা অন্যরূপ। এখানে সত্যবতী প্রবেশ করিতেই 'বিমাতা' এবং পরবর্ত্তী বাগ্‌বিন্যাসে মহাভারতীয় গাম্ভীর্য্য ও চমৎকারিত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে। ব্যাসের

মহাভারতে দাশরাজের কথার বাঁধুনি খুবই চমৎকার। নাট্যকারের কল্পনায় দাশ অতি লঘু হইয়া পড়িয়াছে এবং ভীষ্মেরও স্থানকাল যথাযথ হয় নাই।—প্রথম অঙ্কে ভীষ্মের প্রথম অধ্যায় শেষ।

তারপর অম্বা-কাহিনীর উপস্থাপনা চলিয়াছে দুই অঙ্কের— সাত ও পাঁচ, মোট বারটি দৃশ্য ব্যাপিয়া। এই দুই অঙ্কে অমিতব্যয়িতা বা অতিব্যয়িতা খুবই বেশী হইয়াছে। এই দুই অঙ্কে ঘটনা সংশ্লেষ তো হয়ই নাই বরং ঘটনার অতিবিস্তারই ঘটিয়াছে। বিস্তার মাত্রই আপত্তিকর নহে, তবে তখনই আপত্তিজনক, যখন তাহা নাটকের গঠনের ভারসাম্য নষ্ট করে অথবা চরিত্রের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া দাঁড়ায়। এখানে অতি-বিস্তার ভারসাম্য নষ্ট করিয়াছে বলা যাইতে পারে। অম্বা-কাহিনীকে এতবড় মর্য্যাদা এবং এতখানি স্থান দেওয়া অনুচিতই হইয়াছে। অম্বা চরিত্রটির ভাবাবেগ-তীব্রতা ও কল্পনা-সৌন্দর্য্য যতই থাকুক,—গঠনের সামঞ্জস্যের দিক দিয়া চরিত্রটি অতি স্ফীত হইয়া পড়িয়াছে। ভীষ্মের জীবনের দুইটি ঘটনাই নাটকের অর্দ্ধেকখানি জুড়িয়া ফেলিয়াছে (১০৫ পৃষ্ঠা—২০৩ পৃষ্ঠার মধ্যে); এই কারণেই অন্যান্য প্রধান প্রধান ঘটনা প্রত্যক্ষ উপস্থাপনার বাহিরে পড়িয়া গিয়াছে। তৃতীয় অঙ্ক পর্য্যন্ত ভীষ্ম মাত্র জীবনের প্রথম অধ্যায়েই রহিয়া গিয়াছেন।

চতুর্থ অঙ্কে—এক লাফে উদ্যোগ পর্ব্বে। সভাপর্ব্বের বনপর্ব্বের এবং বিরাটপর্ব্বের ভীষ্মকে প্রত্যক্ষতঃ পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ সভাপর্ব্ব ভীষ্মের একটা চরম উত্তেজনার এবং পরীক্ষার ক্ষণ। এখানে ভীষ্মের প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা একান্তই বাঞ্ছনীয়। নাট্যকার বর্ণনা-যোগে সভাপর্ব্বের এবং বিরাটপর্ব্বের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তৃতীয় দৃশ্যে, ভীষ্ম সভাপর্ব্বে কেন চুপ করিয়াছিলেন তাহার কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন। এই কারণটি নাট্যকারের নিজের কল্পনা এবং

সেই হিসাবে অ-মহাভারতীয়। মহাভারতে ভীষ্ম দ্রৌপদীকে যে যুক্তি দিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার গুরুত্ব ও সঙ্গতি সহজেই পাওয়া যায়। নাট্যকারের যুক্তি যেমন অ-মহাভারতীয় তেমনি দুর্ব্বল। এই দৃশ্যেই শিখণ্ডীর প্রবেশও অনধিকার—তবে বেশ নাটকীয় এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। চতুর্থ দৃশ্যটি নাটকে অবান্তর। কৃষ্ণভক্তিরস আদায় করাই এই দৃশ্যটির উদ্দেশ্য। পঞ্চম দৃশ্যটি ভাবে ও ভাষায় বেশই সমৃদ্ধ এবং চিত্তাকর্ষক; ভীষ্ম ও শিখণ্ডীর সাক্ষাৎকার তথা উভয়ের ভাবোদ্দীপনা খুবই সুন্দর রূপ পাইয়াছে; তবে এখানে এই সাক্ষাৎকারটি কবি-কল্পিত।—অধিকন্তু এই দৃশ্যের শেষে ভীষ্মের স্বগতোক্তি কাব্য-মহিমায় উজ্জ্বল এবং দ্যুতির প্রবেশ কল্পনামাত্র।

পঞ্চম অঙ্কে ভীষ্মপর্ব্বের কাহিনী। প্রথম অঙ্কের আরম্ভ শকুনি দুঃশাসন ও কর্ণের তামাসা দিয়া এবং শেষ পাণ্ডবদের ও কৌরবদের যৎসামান্য বাগ্‌বিন্যাসে। দ্বিতীয় দৃশ্যে মহাভারতীয় ঘটনাই উপস্থাপিত; কিন্তু মহাভারতে ভীষ্ম পরাজয়ের উপায় বাতলাইয়া দিয়াছিলেন; এখানে ভীষ্ম বলিয়াছেন—'এখনও আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়নি, সুতরাং আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলুম না'। এখানেও কৃষ্ণভক্তিরসের আধিক্য। তৃতীয় দৃশ্যে প্রথমাংশে বলরাম সাত্যকির ফষ্টামির ভিতর দিয়া কৃষ্ণভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার—তারপর যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণকে ভীষ্মবধের উপায় জিজ্ঞাসাদি অ-মহাভারতীয় কল্পনার উচ্ছ্বাস—শিখণ্ডীকাহিনী লইয়া খানিকটা ফেনিল বর্ণনা। চতুর্থ দৃশ্যের প্রথমাংশ ভীষ্ম ও রামের কথোপকথন নিছক কল্পনা। পঞ্চম দৃশ্যে নাট্যকার বল্গাহীন কল্পনায় মাতিয়াছেন। দুর্য্যোধনের সহিত রণক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সাক্ষাৎকার, মুকুট গ্রহণ এবং সেই মুকুট পরিয়া ভীষ্মকে ছলনা করা কল্পনার দিক দিয়া

যত লোভনীয়ই হউক—ঘটনা হিসাবে অ-ভারতীয়। ষষ্ঠ দৃশ্যে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বাণ হরণ এবং অর্জ্জুন প্রস্থান করিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও ভীষ্মের সহিত কথোপকথন ও কবি-কল্পিত ঘটনা। সপ্তম দৃশ্যে সাত্যকি ও শিখণ্ডীর কথোপকথনে পুরাতন শিখণ্ডী-কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি—তারপর 'স্থলান্তরে' কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত ভীষ্মের প্রথমে বাক্ পরে বাণ যুদ্ধ। শেষ দৃশ্য—'পট পরিবর্ত্তন'। শর-শয্যায় ভীষ্ম পার্শ্বে পরশুরামের উপস্থিতি কল্পিত—পরবর্ত্তী ঘটনা মহাভারতীয়; তবে শেষে কৃষ্ণের প্রবেশ ও পদতলে উপবেশন—শান্তিপর্ব্বে ঘটনা হিসাবে আংশিক সত্য। কৃষ্ণ ভীষ্মকে দেখিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু পদতলে বসেন নাই। এখানে নাট্যকার ঘটনা-সংশ্লেষ করিয়াছেন। এই ধরণের সংশ্লেষণ অবশ্য প্রশংসনীয়।

ভীষ্ম নাটকের সমালোচনা

সাধারণ পরিচয়

"ভীষ্ম" পঞ্চাঙ্ক একখানি পৌরাণিক নাটক—মহাভারতের বীর-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় ও অটল-প্রতিজ্ঞ দেবব্রত ভীষ্মের সমগ্র জীবন-চরিতের নাট্যরূপ। এই হিসাবে ভীষ্ম একখানি পৌরাণিক চরিত-নাটক।—(একখানি মহানাটক ?)

বাস্তবিক, এই ধরণের নাট্য রচনাকে নাটক না বলিয়া মহা-নাটক বলাই সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত। ইহাতে না আছে বিষয়ের ঐক্য না আছে স্থানের ঐক্য—না আছে কালের ঐক্য। বিশেষতঃ একটি যুগব্যাপী জীবনের আদ্যন্ত কাহিনী যেখানে রূপায়নের বিষয়—সেখানে পঞ্চসন্ধিতে কাহিনীকে বিভক্ত করা,—সমস্ত ঘটনাকে কার্য্যকারণের বাঁধুনিতে গ্রথিত করিয়া একটা জৈবিক সত্তায় পরিণত করা খুবই দুঃসাধ্য—বা অসাধ্য ব্যাপার বলা যাইতে পারে। এই কাল-বিস্তারকে ও ঘটনা-বাহুল্যকে শাসন করা—একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। অতএব, এই ধরণের রচনাকে, যাহার বিষয় একটি যুগব্যাপী বহুমুখী জীবন, পৃথক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করাই সমীচীন। কাব্য ব্যাপক হইয়া 'মহা-কাব্য' হইয়াছে, গল্প উপন্যাসে—এমন কি নানাপর্ব্বিক মহোপন্যাসে পরিণত হইয়াছে, নাটক মহানাটকে পরিণত হইলে দোষের কি আছে ? বার্ণার্ড শ' মহাশয়ের Back to Methusela নামক নাটকে এবং আমাদের অনেক ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটকে মহানাটকের দিকেই বিশেষ ঝোঁক রহিয়াছে। এই সকল নাটকের

শ্রেণী-পরিচয় পুনর্ব্বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাহাই হউক, ভীষ্মকে আমরা পৌরাণিক চরিত-নাটক বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারি। তবে এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে না বলিলে নহে যে, নাটকখানি যাত্রা-নাটক না হইলেও—নাটকে যাত্রা-নাটকের লক্ষণ সামান্য কিছু-কিছু পাওয়া যায় ('দ্যুতির গীত'গুলি দ্রষ্টব্য)। তবে উহা জাতিপাত ঘটায় নাই।

রস পরিচয়

নাটককে বলা হয় দৃশ্যকাব্য। 'দৃশ্য'এর অর্থ 'অভিনেয়' এবং উহা নাটকের বিশেষ ধর্ম্ম। কিন্তু সাধারণ ধর্ম্ম—কাব্যত্ব: আর কাব্যের লক্ষণ, এক কথায় 'আত্মা'—রস (বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্ —সাহিত্যদর্পণ)। অতএব নাটকের আত্মাও সেই হিসাবে রস। বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী সংযোগে রসনিষ্পত্তি ঘটিয়া থাকে—অর্থাৎ স্থান-কালের বিশেষ পরিবেশে (উদ্দীপন বিভাব) বিশেষ পাত্র-পাত্রীর (আলম্বন বিভাব) হৃদয়ভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি সৃষ্টি করাই কাব্য-সৃষ্টি এবং এই সৃষ্টি দেখিয়া দর্শকের মনে যে ভাবোপলব্ধিজাত আনন্দ, সেই আনন্দের নামই রস। নাটকে মাত্র একটি ভাবেরই রূপায়ণ থাকে এমন নহে। নানাভাবের রূপায়ণ থাকে।—তবে একটি ভাবকে প্রধানভাবে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এই প্রধানভাবের নাম অনুসারেই আমাদের সাহিত্য শাস্ত্রে নাটকের পরিচয় দেওয়া হয়। নাটকখানি পড়ার বা দেখার পরে মনে যে-ভাবটি স্থায়িভাবে থাকে, সেই ভাবটিকেই প্রধান ভাব বলা হইয়া থাকে এবং এই প্রধান ভাবটিকে উপলব্ধি করাই—বা আবিষ্কার করাই রসনিরূপণের প্রথম ও প্রধান কাজ।

'ভীষ্ম' নাটকে আমরা সাহিত্য-শাস্ত্রের নির্দেশ প্রয়োগ করিয়া দেখি—নাটকে বীর, হাস্য নানারস থাকিলেও প্রধান রস ইহাদের কোনটিই না, প্রধান রস—'শান্ত'। নাটকখানি পাঠ করিবার পরে মন শান্তরসে আপ্লুত হইয়া থাকে। ভীষ্মের বীরত্ব—জ্ঞানবীরত্ব, ধর্ম্ম-বীরত্ব, বল-বীরত্ব এবং অটল-প্রতিজ্ঞত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজ করে—স্থির নিয়তি-আনুগত্য, বিশ্ববিধানের কাছে অক্ষুব্ধ আত্মসমর্পন, —কৃষ্ণের কাছে শান্ত আত্ম-নিবেদন। ভীষ্ম আগাগোড়া আত্ম-সচেতন, মানসনেত্রে অতীত ও ভবিষ্যৎ তাঁহার কাছে সুস্পষ্ট। এই কারণেই ভীষ্ম প্রায় নির্বন্দ্ব—তাঁহার পতন একটা বিরাট ব্যক্তিত্বের পতন হইলেও পরিণাম শোকাবহ হইয়া পড়ে নাই—ট্র্যাজেডি-করুণ হইয়া উঠে নাই। তাঁহার জীবন আদ্যন্ত নিয়তি-চালিত একটা অভিশাপের অনুবাদমাত্র। তাই তাঁহার বীরত্ব, ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, বলবীর্য্য সব-কিছু একটা দৈব-ইচ্ছার রূপেই দেখা দিয়াছে। মর্ত্ত্য হইয়াও ভীষ্ম অমর্ত্ত্য হইয়াই রহিয়াছেন। ফলে, ভীষ্মের পতনে দৈবী ইচ্ছারই একটা মহা-পূর্ত্তির উপলব্ধি ঘটে। পতনের শোচনীয়তা আত্মসমর্পনের শান্ত সন্তোষের মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়। গোড়ার দিকে ভীষ্মের মধ্যে ধর্ম্মবীরত্ব বড় হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, শেষের দিকে বল-বীরত্বের সঙ্গে ভক্তিভাবের কথা, আত্মসমর্পণের ভাবই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। তাহা যদি না দিত অর্থাৎ বীরত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া 'শম' যদি প্রধান হইয়া না উঠিত, তাহা হইলে ভীষ্মের পতন অনিবার্য্যভাবেই ট্র্যাজেডি-করুণ হইয়া দাঁড়াইত। এই বিশেষ কারণেই নাটকখানি শান্তরসাত্মক হইয়া পড়িয়াছে।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ভীষ্মের মধ্যে মাতৃভক্তির মহিমা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আর দেখানো হইয়াছে সত্যের জন্য সঙ্কল্প। তৃতীয় দৃশ্যেও এই মাতৃভক্তির ভাবই প্রকটিত হইয়াছে।

ভীষ্মের আত্মত্যাগ পিতার জন্য নহে—সত্যবতীর জন্যই। "তোমার কি হবে মা?" এই চিন্তাতেই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। কারণ সত্যবতী ভীষ্মের চোখে—যে জগদম্বিকা সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থান করছেন, ...তাঁর প্রতিনিধি। এই জ্ঞানেই ভীষ্ম সত্যবতীকে বলিয়াছেন—'সর্ব্বকল্যাণময়ি শরণ্যে। আমি তোমার পাদমূলে মস্তক অবনত করছি, মুগ্ধ সন্তানকে আশ্রয় দাও।' **দ্বিতীয় অঙ্কের** দ্বিতীয় দৃশ্যে ভীষ্ম অন্তর্মুখী হইয়া আত্মবিশ্লেষণ পরায়ণ। তৃতীয় দৃশ্যে কাশীরাজের সভায় ভীষ্মের বল-বীর-রসাত্মক প্রকাশ। চতুর্থ দৃশ্যে ভীষ্মের উদার ভাব। সপ্তম দৃশ্যে ভীষ্ম নিজের 'গুহ্যকথা' নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। "আমি নরনারায়ণের আগমন প্রতীক্ষায় এই সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করে বসে আছি।"—এই সব কথা বলিয়া ভীষ্ম শান্তরসের বীজ স্থাপনা করিয়াছেন এবং শেষের দিকে গুরু রামের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া এক সঙ্গে শৌর্য্যবীরত্ব ও ধর্ম্মবীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। **তৃতীয় অঙ্কের** দ্বিতীয় দৃশ্যে রাম ও ভীষ্মের যুদ্ধ—শৌর্য্যবীরত্ব আভাসিত। পঞ্চম দৃশ্যে শৌর্য্যবীরত্ব অভিব্যক্ত। **চতুর্থ অঙ্কের** তৃতীয় দৃশ্যে ভীষ্ম কর্ত্তৃক আত্ম-আচরণ ব্যাখ্যা তথা ধর্ম্মবীরত্বের প্রতি আলোকপাত।—এই দৃশ্যেরই শেষে শিখণ্ডীর মধ্যে ভীষ্ম নিয়তিকেই দেখিলেন।

ভীষ্ম আত্মসচেতন হইলেন—নিয়তির কাছেই যেন আত্মসমর্পণ করিলেন—বিদুরকে বলিলেন :

> চলিতে চলিতে শুন কথা,
> আনন্দ বারতা—
> ঈশ্বর প্রেরিত এই বালক সুন্দর
> মুহূর্ত্তে মুছিয়া নিল বিষাদ আমার।

শান্তরস এখানে অঙ্কুরিত। পঞ্চম দৃশ্যে এই শান্ত সমর্পণই

পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভীষ্ম 'মৃত্যুমূর্তি' দেখিয়াছেন। বালক শিখণ্ডীকে দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইয়াছেন—তবে তাঁহার কথা 'নহি ভীত হে বিদুর। শিখণ্ডীর মূর্তি হেরি পুলকিত আমি।'

ভীষ্ম স্পষ্টভাবেই জানেন—'অনুস্মৃতি করিছে সে যথার্থ আমার।' ভীষ্মের নিয়তির কাছে আত্মসমর্পন করিলেন—এ আত্মসমর্পন অক্ষুব্ধ ও অশান্ত।

'চলে যা' জীবনে ইচ্ছা

নিয়তিরে রুদ্ধ করিবার—(অবশ্য নিয়তিরে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা কোথাও নাই)

শেষে স্বগতোক্তিতে ভীষ্ম শান্তরসকেই অভিব্যক্ত করিয়া তুলিয়াছেন :

—হে বিশ্ব জননী মায়া

এতদিনে বুঝিয়াছি করুণা তোমার।

মৃত্যু নহে শিখণ্ডিনী—পদছায়া তব—

তাহার অবশিষ্ট কামনা (স্তুতির কাছে যাহা প্রকাশিত) "অবশিষ্ট মাত্র দরশন একরথে নর-নারায়ণ"।—শান্তরস এখানে আরো মধুর।

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রণবীর ভীষ্মের আভাস পাওয়া যায় ; কিন্তু বড় হইয়া উঠিয়াছে—যেখানে কৃষ্ণ সেখানে ধর্ম্ম, যেখানে ধর্ম্ম সেখানে জয়। শেষের দিকে রণবীর ও ধর্ম্মবীর এবং কৃষ্ণভক্ত ভীষ্মেরই রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। "একবার সে যুগল-মূর্তি এক রথে দেখলে" কর্ণের মুখে নাকি আর ঐরূপ বাক্য নির্গত হইবে না!—চতুর্থ দৃশ্যে দেবব্রতের স্বরাজ্যে যাওয়ার উদ্যোগ সম্পন্ন-প্রায়। রাম আকাশবাণী লইয়া উপস্থিত। ভীষ্মের চোখেও—ভাবী ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ।

ভীষ্ম বিধাতার লিপিকে শিরোধার্য্য করিলেন—শান্ত ভাবেই

তাঁহার জ্ঞাননেত্রও উন্মীলিত—ভীষ্ম জানেন, "জীব নিত্যব্রহ্মের স্বরূপ, কভু নাহি মরে, চিরদিন লীলায় বিচরে ধরা মাঝে। জন্মে মৃত্যু, মৃত্যু পরে পুনর্জ্জন্ম তার। এই প্রভু জীবের সংসার।" আর তাঁহার সর্ব্ববাঞ্ছা পূর্ণ—চিত্তের পূর্ণ বিশ্রাম। একটু পরে (দুর্য্যোধন ও কর্ণ প্রবেশ করিলে) অবশ্য দুর্য্যোধনের কটুবাক্যে ভীষ্ম কিছু পরিমাণ ক্রুদ্ধ হইলেও শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণে পঞ্চমুখ—"তুমিই যে আমার সব বাসুদেব। আমার সত্য, আমার ধর্ম্ম, আমার জয়-পরাজয়, মান-অপমান, সমস্তই তুমি"—সঙ্গোপনে পাইয়া 'বৃদ্ধ হ'তে অতিবৃদ্ধ হে চির কিশোর'কে প্রণতি জানাইয়া ভীষ্ম আত্মনিবেদন করিলেন। সপ্তম দৃশ্য—স্থলান্তরে ভীষ্ম—'একরথে নরনারায়ণ' দেখিয়া বাণে পুষ্পোপহার দিয়াছেন। কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া শৌর্য্যের উদ্দীপনা দেখাইলেও শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণের কাছে আত্মনিবেদন বেশী উচ্চারিত হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণকে তিনি দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন—কৃষ্ণময় জগৎ দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।—তাহার উপলব্ধি—'ধরণীর প্রতি পরমাণুতে তুমি; স্থলে তুমি, জলে তুমি, অনলে তুমি, অনিলে তুমি। প্রতি শরমুখে তুমি অনন্ত কোমলতা মাখিয়ে এই যে আমার সর্ব্বদেহ আবৃত করে অবস্থান করছ'। ভীষ্মের মুখে আত্মসমর্পণ সমুচ্চারিত হইয়াছে—'বাসুদেব, বাসুদেব, বাসুদেব—আমাকে বিশ্রাম দাও—বিশ্রাম দাও'। এই বিশ্রাম বা শমই শান্তরসের স্থায়ীভাব। আর ঐ ভাবই শেষ পর্য্যন্ত নাটকে স্থায়ীভাবে পরিণত হইয়াছে। অতএব নাটকখানির প্রধান রস—শান্ত।

নাটকে অন্যান্য রস

(ক) শৃঙ্গাররস—শান্তনুর মধ্যে শৃঙ্গার রসের আভাস মাত্র

পাওয়া যায়—দুই এক স্থলে বিপ্রলব্ধ শৃঙ্গার 'রসের সীমায়' পৌঁছিয়াছেও। অম্বা ও শাল্বের আলম্বনে (২য় অঃ ১ম দৃশ্য) এই ভাবের অবতারণা আছে—তবে অভিব্যক্তি রসে পরিণত হইতে পারে নাই। ২য় অঙ্ক ৫ম দৃশ্যে অবমানিতা নায়িকার রূপ পাওয়া যায়: অম্বার মধ্যে ব্যাহত বাসনার আগ্নেয় উদ্‌গার চমৎকারীরূপে রসে পরিণত হইয়াছে।

(খ) **বীররস**—ভীষ্মের মধ্যে এই ভাবই অন্যতম প্রধান ভাব: কখনও ধর্ম্মবীরত্ব—কখনও শৌর্য্যবীরত্ব। পরশুরামে (শাল্বে অতি সামান্য) প্রধানত এই ভাবই প্রবল। পরশুরামের সহিত এবং কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত ভীষ্মের যুদ্ধে এই ভাবেব প্রকৃত রস-পরিণাম ঘটিয়াছে।

(গ) **বাৎসল্য**—গঙ্গা এবং সত্যবতীর মধ্যে এই স্নেহ-স্থায়িভাবের প্রধান প্রকাশ পাওয়া যায়। ভীষ্মের মধ্যেও পাণ্ডবগণের নিমিত্ত এই ভাবের স্পন্দন সামান্য মাত্রায় দেখা যায়।

(ঘ) **হাস্যরস**—প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সত্যবতী ও শান্তনুর কথোপকথনের একটি কথা হাস স্থায়িভাবে সামান্য একটু আলোড়ন জাগাইয়া দেয়—শান্তনু স্ত্রীর শোকে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন কিন্তু বিবাহও করিতে চাহেন। সত্যবতীর মুখে শোনা যায়—'তবে? তবে তুমি বিবাহের কথা বললে কি করে? এই বুঝি তোমার শোকের পরিণাম?'—এই দৃশ্যেই শান্তনু গঙ্গার মুখে এই ধরণের কথা দ্বারা হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। তৃতীয় দৃশ্যে দাশরাণীর উক্তি অতি লঘু হইয়া পড়ায় হাস্যরসের ধার ঘেঁষিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে স্বয়ম্বর সভায় "সকলে"র কথায় (মাইনে পায় না) সামান্য একটু অবতারণার চেষ্টা দেখা যায়। পঞ্চম দৃশ্যে 'বৃক' এই রসের প্রধান আলম্বন হইয়াছে, এখানে হাস-ভাবটি রসে পরিণত হইয়াছে।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে—মহারাজ দ্রুপদ হাস্যরসের আলম্বন হইয়াছেন। 'বিরাট' শব্দটিকে নানাভাবে প্রয়োগ করিয়া এবং আরো কয়েকটি শব্দ এবং বাগ্‌বিন্যাস লইয়া দ্রুপদ যে খেলা দেখাইয়াছেন, তাহা বেশ রসাত্মক লইয়াছে। চতুর্থ দৃশ্যে 'সাত্যকি'র উক্তিতেও এই রসের অবতারণা আছে।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসন সকলেই আলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বক্রোক্তির প্যাঁচ সকলেই যথাসাধ্য দিয়াছেন—তবে খুব উচ্চাঙ্গের প্যাঁচ নহে। ৫ম অঙ্কের ৩য় দৃশ্যে সাত্যকি ও বলদেবের কথোপকথনের লক্ষ্য কৃষ্ণভক্তি হইলেও, উক্তি ও অবস্থা হাস্যরসাত্মক হইয়া পড়িয়াছে। (লঘু মাধ্যমে গুরু বিষয়ের অবতারণা—গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের অনুকরণে)। পঞ্চম দৃশ্যে শকুনি ও দুঃশাসনের আচরণ ও বচন হাস্যরসাত্মক হইয়াছে।

(ঙ) **রৌদ্ররস** (ক্রোধ স্থায়ীভাব)—এই ভাবটির একমাত্র আলম্বন আছে এবং আলম্বনটি খুবই শক্তিমান। প্রতিহিংসাপরায়ণ অম্বার মধ্যেই এই ভাবের চিত্তাকর্ষক বিকাশ ঘটিয়াছে।

নাটকের ভাবপরিধি

১। পরাতত্ত্বীয় বা দার্শনিকভাব—

(ক) জগৎ কৃষ্ণময়। অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণই একমাত্র শরণ্য। যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মঃ যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।

(খ) জীব নিত্য ব্রহ্মের স্বরূপ, কভু নাহি মরে,
চিরদিন লীলায় বিচরে ধরা মাঝে।
জন্মে মৃত্যু, মৃত্যু পরে পুনর্জ্জন্ম তার।
(আত্মার অমরত্ব ও জন্মান্তরবাদ প্রচার)

(গ) বিধাতার লিপি নিয়তি অবশ্যম্ভাবী।—ব্যক্তি নিমিত্ত মাত্র। কালস্রোতে কর্ম্মের ফুৎকারে—বিশ্বমাত্র।

(ঘ) কিন্তু কর্ম্মের শক্তিও কম নহে। তপস্যার বল বিধাতার বাধাকেও অতিক্রম করিতে পারে (দ্রঃ—বিধি বাধা দিতে এলেও আজ আমাকে আবদ্ধ করতে পারবে না। আমি ভীষ্মকে বধ করব না, বধ করবে আমার তপস্যা।—শিখণ্ডী, ২০২ পৃঃ)। নিষ্কাম বা নিরহঙ্কার কর্ম্মই শ্রেয়। (ভীষ্মের জীবন কর্ম্মসন্ন্যাসেরই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত)। আশ্রমধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠা থাকিলেই যথেষ্ট, মুক্তির বা স্বর্গের জন্য আশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করার প্রশ্নই উঠে না। কর্ত্তব্য পালনই যথার্থ ধর্ম্মাচরণ। সত্যই মুক্তিপ্রদ এবং সত্যস্বরূপ ভগবান কৃষ্ণ সত্যেরই বাধ্য। সত্যমেব জয়তে।

২। নারী-সম্পর্কিত মনোভাব—

(ক) 'আছে চির প্রথা, এ সংসারে জঞ্জাল ঘটায় নারী'। অবশ্য "তবে"ও আছে— 'নারী হতে জন্মে পাপ, নারী হতে পুনঃ তার ক্ষয়'—।

(খ) কিন্তু নারী সম্বন্ধে নাট্যকারের মনোভাব অনুকূল না হইলেও 'মাতা' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পৃথক। — মাতা জগদম্বিকার প্রতিনিধি (ভীষ্ম —২৫ পৃষ্ঠায় 'যে জগদম্বিকা সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থান করছেন, তুমি তাঁর প্রতিনিধি'), মাতা সর্ব্বকল্যাণময়ী।

(গ) নারী সম্বন্ধে আর একটি মনোভাবও নাট্যকার ব্যক্ত করিয়াছেন: উহা নাট্যকারের সমসাময়িক স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধ-মনোভাবের ছদ্মবেশী প্রকাশ। অম্বার উক্তি স্ত্রী-স্বাধীনতা পৃষ্ঠ-পোষকদেরই প্রতি সতর্কবাণী: "আপনার কন্যা পুরুষ হৃদয় নিয়ে জন্ম গ্রহণ করতে পারে না। আপনার বোঝা উচিত ছিল, যতই অম্বাকে আপনি পুরুষের ন্যায় প্রস্তুত করতে চেষ্টা করুন না,

তথাপি আমি নারী।" নাট্যকারের বক্তব্য এই—পুরুষের প্রেমাভাস প্রাপ্ত হইলেই নারী-হৃদয় উদ্বেলিত হইতে বাধ্য……।

(ঘ) অধিকন্তু ক্ষত্রিয় রমণীর মনোভাব প্রকাশ প্রসঙ্গে শক্তি উদ্বোধনের চেষ্টাও নাট্যকার করিয়াছেন। বীর্য্যোপাসনা করিয়া নাট্যকার দুর্ব্বলকায় দুলাল-প্রকৃতি দেশবাসীর সংবিদ্ ফিরাইতেও সচেষ্ট হইয়াছেন।—ক্ষত্রিয় রমণীর কাছে—

"স্বামীর বীরত্বগর্ব্ব একমাত্র অলঙ্কার তার
বীরত্ব স্বামীর রূপ, বীরত্ব যৌবন
বীরত্ব তাহার পূর্ণ জ্ঞানের গরিমা।
বীরত্ব-বিহীন যেবা—
সে অভাগ্য, মদনের মূর্ত্তি যদি ধরে,
সে অপূর্ব্ব দেবরূপ
বীরাঙ্গনা চক্ষে ধরে মর্কটের শোভা।"

নির্বীর্য্য মদনকে মর্কট বলার মধ্যে বীরাঙ্গনার অভিমান এবং বীর্য্যবত্তার প্রতি শ্রদ্ধা উভয়ই ব্যক্ত হইয়াছে। আধুনিক মনের একটা আকাঙ্খা সুন্দর একটি অবকাশে পুরাতন চরিত্রের মুখে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

প্রকাশ-মহিমা বা কাব্যত্ব

প্রকাশ-মহিমা বা সৌন্দর্য্য (beauty of expression) বলিতে প্রধানতঃ আলঙ্কারিক বা কল্পনাগত সৌন্দর্য্য বুঝাইলেও প্রকাশ-সৌন্দর্য্যের উহা একদিক মাত্র—এ কথা প্রথমেই মনে করা দরকার। 'Poetry in Drama' সম্বন্ধে যত বাদ-প্রতিবাদ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ঐ অলঙ্কার-প্রয়োগ বা কল্পনা-বিস্তারকে কেন্দ্র করিয়াই। কিন্তু প্রকাশ-মহিমা বলিতে প্রধানতঃ diction

বা আলঙ্কারিক প্রয়োগাদির বৈশিষ্ট্য বুঝাইলেও উহা আসলে সমগ্র রচনার বৈশিষ্ট্যই—অর্থাৎ রচনার সর্ব্ববিধ উপকরণের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যই।

রচনার উপকরণ প্রধানতঃ দুইটি—(১) কাহিনী-কল্পনা বা পরিস্থিতি রচনা, এবং (২) চরিত্র-সৃজন অর্থাৎ (ক) চরিত্রের **ভাবাবেগ, (খ) আবেগ-বিস্তার বা কল্পনা-বিস্তার**—চরিত্রের হৃদয়ের এবং বুদ্ধির প্রকাশ ইত্যাদি। এই সব বিষয়ে নাট্যকারের মধ্যে যে পরিমাণ প্রকাশ-সৌন্দর্য্য পাওয়া যায় নাটকের প্রকাশ-মহিমা নির্দ্ধারণে তাহাই নিরূপণীয়। মোটকথা, প্রকাশ-মহিমা নিরূপণে পরিস্থিতি রচনা, চরিত্র-সৃষ্টি এবং চরিত্রের কল্পনা-শক্তি ও মানস-সম্পদ এই সবই বিচার্য্য বিষয়।

প্রথমতঃ দেখা যায়, ভীষ্ম নাটকে পরিস্থিতি-কল্পনার চমৎকারিত্ব বিশেষ কিছু নাই (শিখণ্ডীর সহিত ভীষ্মের সাক্ষাৎকার বাদে); এবং এই কথাই মনে হয়, মহাভারতের কাহিনীতে পরিস্থিতি-কল্পনার যে বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়, নাট্যকার তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। দ্বিতীয়তঃ, চরিত্র, দুই একটি বাদ দিলে, অসম্পূর্ণ; অর্থাৎ চরিত্রের হৃদয় ও মন খুব লক্ষণীয়ভাবে প্রকাশ পায় নাই। প্রধান চরিত্র 'ভীষ্ম' প্রায় নির্দ্বন্দ্ব। 'প্রায় নির্দ্বন্দ্ব' বলার তাৎপর্য্য এই যে, চরিত্রটিতে দ্বন্দ্ব চমৎকার-রূপে প্রকাশিত হয় নাই—দুই এক স্থলে মাত্র আভাসিতই হইয়াছে।

ভীষ্মের ভাবাবেগ-পরম্পরার একটা সুসঙ্গত রূপ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। শিখণ্ডীর সহিত সাক্ষাৎকারে চরিত্রটির মধ্যে কল্পনার উচ্ছ্বাস জাগিয়াছে বটে, কিন্তু উভয় চরিত্রের আচরণে অনেক 'কিন্তু' থাকিয়া গিয়াছে। ভীষ্ম ও শিখণ্ডী বড় বেশী মাত্রায়

জাতিস্মর হইয়া পড়ায় চরিত্র দুইটির ব্যবহারিক সত্তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জোর কমিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে ভীষ্মের অন্তঃসমীক্ষণ-প্রয়াস- -স্বপ্নরাজ্যের গোপনচারিণীর অনুসন্ধান—কবি-কল্পনার দিক দিয়া বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ভীষ্মের চরিত্রে প্রাঙ্‌নিবিষ্ট সংস্কারের আকর্ষণ চরিত্রটিকে রহস্যময় ও বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে।

সংসারের কোলাহল করি অতিক্রম
অতি সূক্ষ্ম ষড়জ-ঝঙ্কার থাকে থাকে ধীরে,
আঘাত করে সে এই দেহ পুরদ্বারে।

নির্জ্ঞান চিত্তের বুদ্‌বুদ্‌ ভীষ্মের চেতনায় ভাসিয়া উঠিয়া স্বপ্ন জাগায়, এই কল্পনায় চরিত্রটিকে একদিকে গভীর এবং কল্পনাময় করিয়াছে। এইরূপ আত্মনিমগ্ন অবস্থায় চরিত্রটি যে কল্পনা বিস্তারে সমৃদ্ধ হইয়াছে তাহা কবি-কর্ম্মের হিসাবে প্রথম শ্রেণীর না হইলেও একেবারে উপেক্ষণীয় বা অলক্ষণীয় নহে। শিখণ্ডীর সহিত সাক্ষাৎকারেও চরিত্রটি ভাবাবিষ্ট ও কল্পনামুখর হইয়া উঠিয়াছে।

দীপ্ত হুতাশনে, সহস্র লেহনে
নারীত্ব মুছিয়া নেছে
কিন্তু রে বিদুর, দেখ চেয়ে,
প্রতিহিংসা পারেনি মুছিতে।

—এই উক্তি যথার্থই কবি-কর্ম্ম। তারপর চতুর্থ অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যেও শিখণ্ডীর সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া ভীষ্ম কল্পনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন।

দেখিয়া জাগিল স্মৃতি
তৃণ হ'তে যেন হুতাশন্।
মুহূর্ত্তে ভুলিল, তৃণ ভস্ম হ'ল

অনুতাপে দগ্ধ হ'ল পাঞ্চাল-নন্দন
কিন্তু হে বিদুর—
অভিমান সাগরের জলে
তীব্র হলাহল, উঠেছে তরঙ্গরূপে
অতিক্ষীণ স্মৃতির পরশে
বিক্ষুব্ধ হ'য়েছে একবার

সমুত্থিত সে ভীম তরঙ্গ
আর কি নিথর হবে ?
এ শৈল না চূর্ণ করি আর কি মিলাবে ?

নাটকের মধ্যে যে চরিত্র হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তেজ ও কল্পনা-শক্তি স্ফুরিত হইয়াছে, সে 'অম্বা'। অম্বা প্রেমে তেজস্বিনী হইতে না পারিলেও, প্রতিহিংসায় অতুলনীয় তেজস্বিতা দেখাইয়াছে। প্রতিহিংসা-পরায়ণা অম্বার প্রকাশ সত্যই মহিমান্বিত।

যতদিন মৃত ভীষ্ম না করি দর্শন
ততদিন নিদ্রা আমি ক'রেছি বর্জ্জন।
এ জগতে কোন প্রলোভন
আমারে সঙ্কল্পশূন্য করিতে নারিবে।
বিশ্বের বিধাতা যদি সাধে গো আমায়,
বিশ্ব-রত্ন চরণে লুটায়,
আপনি যদ্যপি নারায়ণ
এ কর গ্রহণে লোভ দেখায় আমায়,
তবু না নিবৃত্ত হব ভীষ্মের সংহারে।"

সূর্য্য যদি পথ-ভ্রষ্ট হয়,

তুঙ্গ গিরিরাজ যদি শির করে নত,
সিন্ধু যদি পরিণত বালুকা প্রান্তরে
তথাপি সঙ্কল্পচ্যুতি হবে না আমার।

মমতা মৃদুতা স্নেহ মায়া
নিক্ষেপ করেছি আমি
প্রতিহিংসা-অনল-শিখায়
ডুবায়ে দিয়েছি প্রেম লবণাম্বুতলে।
স্বর্গের কামনা
দেবতা উদ্দেশে আমি করেছি অর্পণ।
....
ত্রিভুবনে আঁধার আঁধার—
আচ্ছন্ন নয়ন দেবতার—
পরশু প্রসব করে মৃত্যুর যাতনা।
জাগো মৃত্যু চারিধার হ'তে
ঝরো মৃত্যু বরষার স্রোতে
সমাচ্ছন্ন করো মৃত্যু শান্তনু-নন্দনে।

চরিত্রটি এক কথায় প্রতিহিংসা কল্পনায় বাঁধা-বন্ধন-হারা, তাহার প্রতি পাদক্ষেপে কল্পনার উচ্ছ্বাস। মহাদেবের কাছে যখন কাতর আত্মনিবেদন করিয়াছে তখনও কল্পনার মহিমা শিখরচুম্বী—

হে ঈশ্বর—
দেখ—দেখ—দেখ হে অন্তর!
মুগ্ধা আমি—অবশ রসনা—
বিদীর্ণ করহ বক্ষঃ শূলে!
খুঁজে লও—তুলে লও আবদ্ধ কামনা।

বল বল ভীষ্মে আমি করিব সংহার।
মুক্তি এসে সাধিছে আমায়, জড়াইছে পায়—
হে বিভু, হে মুক্তির ভাণ্ডার!
তোমারে দেখেছি আমি—
মুক্তি আমি নাহি চাই, অখিলের স্বামী!
বর দাও ভীষ্মে আমি করিব সংহার।
তারপর— ওঠ জেগে চিতার অনল!
শিখায় শিখায় খর তীব্র হলাহল,
উল্লাসে সাঁতার দিব তাহে।
দেহ পোড়াইব, পরমাণু হব—
শুদ্ধমাত্র তীব্র বিষ, প্রাণ-সঙ্গে লয়ে যাব পারে···

—কবিত্বে যথার্থই মধুর। অম্বা চরিত্রটি ভাবাবেগে ও কল্পনায় খুবই চিত্তাকর্ষক।

শিখণ্ডীর মধ্যেও লক্ষণীয় কবিত্ব আছে। তাঁহার প্রবেশ আকস্মিক বা রোমাঞ্চকর হইলেও তাহার ভাব-বিশ্লেষণ ও প্রকাশ-ক্ষমতা মাঝে মাঝে বেশ চিত্তাকর্ষক। শিখণ্ডী যেখানে ভীষ্মের প্রশ্নের উত্তরে আত্মপরিচয় দিয়াছেন (৫ম অঙ্ক—৫ম দৃশ্য) সেখানে রূপায়নে কাব্যদীপ্তি মন্দ স্ফুরিত হয় নাই।

—কিন্তু জাগে ওই দূরে
মৃত্যুর প্রাকার পারে,
প্রজ্বলিত চিতানল পাশে!
ওই দূরে—বিমুগ্ধা তটিনী-তীরে
নিশ্চল-স্তিমিত-নেত্র!
অন্ধকার প্রাচীর বেষ্টনে
ঘনস্তব্ধ নভঃ আচ্ছাদনে

মাঝে মাঝে রহস্যকারিণী
ওই হাসে সৌদামিনী।
তারপর— রমণীর প্রতিহিংসা প্রচণ্ড বাসনা
পার হয়ে বৈতরণী এসেছে হেথায়।
ত্রিভুবনে একাকিনী
পরিত্যক্তা রাজার নন্দিনী,
যাতনার তীব্র শরে
সর্ব্ব অঙ্গে পাইয়াছে যে প্রচণ্ড জ্বালা,
হে কৌরব, সেই জ্বালা
সর্ব্ব অঙ্গে তোমারে করাব আমি পান।

উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলি নাটকখানির কাব্যিক প্রকাশের, সমগ্র না হইলেও প্রধান নিদর্শন, বলা যাইতে পারে 'সর্ব্বোত্তম' নিদর্শন। ইহা ছাড়া আর যাহা আছে তাহা কথার পর্য্যায়েই আছে—কল্পনায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া কথা মাত্রেই হেয় নহে। রসসৃষ্টিতে কথা ও কল্পনার আপেক্ষিক গুরুত্ব আছে বটে, কিন্তু কথা অনেকক্ষেত্রে কল্পনা অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় হয়। কথার পরে কথা গ্রথিত হইয়া যেখানে আবেগ ও [illegible]ব তথা জীবন রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে, সেখানে অংশের বিচার বড় কথা নহে, অংশীর স্বরূপই সেখানে প্রধান দর্শনীয় বা বিচার্য্য বিষয়। এইরূপ রসাত্মক স্থলও নাটকে কম নাই। ভাবা-শিল্প হিসাবে নাটকখানি অতুলনীয় বা অনবদ্য না হইলেও ভীষ্মের জীবন-কাহিনীর সরস নাট্যরূপে নিশ্চয়ই আদরণীয়।

নাটকের দোষ

তবে নাটকখানির প্রথম ও প্রধান দোষ মহাভারতীয়

কাহিনীকে নাটকীয় সন্ধি-বিভাগে সাজাইয়া লওয়ার মধ্যেই। —সন্ধি-বিভাগের ব্যাপারে নাট্যকার সুষমা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কাহিনী-প্রযোজনায় তিনি সংশ্লেষণ বা বিশ্লেষণের রীতি অবলম্বন না করিয়াছেন এমন নহে, কিন্তু ঐ রীতি-প্রয়োগে কোথাও চমৎকার ফল দেখাইতে পারেন নাই। অম্বা-কাহিনীকে অমিতব্যয়ীর মত স্থান করিয়া দেওয়ায় নাটকখানির ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফলে, ভীষ্মের জীবন সুষমভাবে রূপায়িত হইতে পারে নাই। অর্থাৎ জীবনের আদি-মধ্য-অন্ত সুসমঞ্জস ভাবে রূপিত হয় নাই। আদিপর্ব্ব যে পরিমাণ প্রাধান্য পাইয়াছে, মধ্য ও অন্ত তদনুপাতে প্রাধান্য পায় নাই। যদিও একথা স্বীকার্য্য যে মধ্যপর্ব্বে (সভাপর্ব্বে—বনপর্ব্বে) ভীষ্মের জীবনে ঘটনা খুব অল্প, তথাপি একথা বলিতেই হইবে যে, সভাপর্ব্বের এবং বিরাটপর্ব্বের ভীষ্মকে প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা না করিয়া নাট্যকার ভীষ্মকে বেশ খানিকটা উহ্য করিয়া ফেলিয়াছেন। অধিকন্তু কৃষ্ণভক্তিরস বিতরণের আগ্রহে দুই একটি অবান্তর দৃশ্যও যোজিত হইয়াছে। চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যটি ভীষ্ম নাটকে অপরিহার্য্য নহে এবং পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যটিও অপ্রয়োজনীয় এবং একঘেয়ে। দ্বিতীয়তঃ, চরিত্র সৃজনে স্থানে স্থানে গভীর অনুভবের নিদর্শন থাকিলেও, চরিত্রে একাধিক ব্যক্তিত্বের বা ভাবের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব (conflict) একরূপ নাই বলিলেই চলে। ফলে চরিত্রে প্রবল ভাব —সংঘর্ষ খুব কমই পাওয়া যায়। অন্য চরিত্রের সঙ্গতি-সুষমাও সর্ব্বত্র নাই। প্রধান-চরিত্র ভীষ্মের মানসিক আচরণের সঙ্গতি বহু ক্ষেত্রেই প্রশ্নাধীন। বিশেষতঃ শিখণ্ডীর সহিত যেখানে যেখানে সাক্ষাৎকার সেখানে উভয়েরই আচরণ সঙ্গতির মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। ভীষ্ম শিখণ্ডীকে সমূলে চিনিয়াও পরে না চিনিবার ভাণ করিয়াছেন। "তুমি নিজে বল কেবা তুমি যুবা" বলিয়া শিখণ্ডীকে

বাগ্‌জাল বিস্তারের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন এবং স্থিরভাবে তাঁহার কথা শুনিয়াছেন। দুই জনই অতিমাত্র জাতিস্মর হইয়াছেন, তবে প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে না জানার ভাণও করিয়াছেন। অবশ্য নাটকীয় আকস্মিকতা ও কৌতূহল সৃষ্টি করার জন্যই নাট্যকার ঐরূপ করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের জাতিস্মরতা সমস্ত ক্রিয়া দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে। মোট কথা, চরিত্র-সৃষ্টি খুব লক্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক হয় নাই। তারপর দ্রুপদ-চরিত্রকে হাস্যরসের আলম্বন করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত হয় নাই। দ্রুপদকে অত্যন্ত আপত্তিকর রূপে লঘু করা হইয়াছে। যে পরিস্থিতির মধ্যে দ্রুপদকে দাঁড় করানো হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে অত লঘু করা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াই অন্যায় কার্য্য করা। এই সকল ত্রুটির জন্যই নাটকখানিকে প্রথম শ্রেণীর নাটক বলা চলে না। ইহা আকৃতিতে যত বড়ই হউক তাহা প্রকৃতিতে ছোট এবং তাহা রসাত্মক বটে তবে রস খুব ঘন হইতে পারে নাই।

-সমাপ্ত-